মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস

অনিরুদ্ধ রায়

মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস

মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস

অনিরুদ্ধ রায়

কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

Mughal Bharater Arthanaitik Itihas
Aniruddha Roy

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৬

ISBN 81-7074-178-5

টাইপ সেটিং : প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ২৬৩ বি.বি.গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০১২
মুদ্রণ : দে'জ অফসেট, ৩/২ মঠেশ্বরতলা রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬

কনক বাগচী কর্তৃক কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, ২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২ থেকে প্রকাশিত

তীর্থঙ্কর ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়-কে

বিষয়সূচী

মুখবন্ধ	ix
কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা	১
ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য কর	৬
জায়গীরদার, জমিদার ও গ্রামীণ সম্প্রদায়	৯
অ-কৃষি উৎপাদন ও কারিগরি ব্যবস্থা	২৪
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	৫২
বৈদেশিক বাণিজ্য	৭০
ক. বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কাঠামো	৭০
খ. বাণিজ্যিক পণ্যের কাঠামো	৭৫
গ. ভারতীয় বণিক, রাষ্ট্র ও ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য	৮২
মুদ্রা ও মূল্য	১১৩
মুঘল শহর ও জনসংখ্যা	১১৯
জীবনযাত্রার মান	১৩৩
জায়গীর ব্যবস্থার সংকট	১৪৪
পরিশিষ্ট	১৪৮
সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী	১৫০

মুখবন্ধ

প্রায় ত্রিশ বছর অধ্যাপনা করে একথা মনে হয়েছে যে, বাংলায় মুঘল যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। এর ফলে ছাত্রছাত্রী ছাড়াও বাংলায় যারা পড়াশোনা করেন বা করতে চান– সেই সব সাধারণ পাঠক-পাঠিকা– তাদের হাতে বিশেষ কিছু থাকে না। ইংরেজিতেও আগে বিশেষ ভালো বই সমগ্র যুগের ইতিহাস সম্পর্কে ছিল না। সম্প্রতি *Cambridge Economic History of India,* প্রথম খণ্ড, এই কাজ অনেকখানি পূরণ করেছে। আমি এখানে উল্লেখিত ইংরেজি বইটির সাহায্য নিয়ে যে লিখেছি, একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু যতটা সম্ভব উদাহরণগুলি বাংলার ইতিহাস বা সমকালীন বাংলা সাহিত্য থেকে দিয়েছি যাতে বাঙালি পাঠক-পাঠিকা তাদের চেনা পরিসরকে পেতে পারেন। এছাড়াও উল্লেখ্য যে, বর্তমান বইয়ে কোনো কোনো জায়গায় উল্লিখিত ইংরেজি বইয়ের মতের বিরুদ্ধ কথা বলেছি এবং বহু জায়গায় এমন সব বিষয়ের আলোচনা করেছি যেগুলি ঐ বইয়ের মধ্যে নেই।

এই কাজে আমাকে বহুলোক উৎসাহ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আমার সহকর্মীবৃন্দ– মহম্মদ কামারুদ্দিন, রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, লক্ষী সুব্রহ্মণাম এবং আমার শিক্ষক অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী। এছাড়া ধন্যবাদার্হ অধ্যাপক চণ্ডীপ্রসাদ সরকার, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, গবেষিকা শমিতা সরকার ও আরো অনেকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ বহুসময় সাহায্য করেছেন। এঁদের আমি সবিনয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে শ্রী কনক বাগচী যিনি বাংলায় পাঠ্যপুস্তক লেখার জন্য বহুবার অনুরোধ করেছেন। সুতরাং শ্রী বাগচীর চাপ না থাকলে এই বই লেখা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। ওঁকে ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই। সুযোগ্য সম্পাদনা করেছেন শ্রী তরুণ বসু উনি আমার আন্তরিক ধন্যবার্দাহ।

বর্তমান গবেষণার আলোক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছানোর দায়িত্ব শিক্ষকদের। মফঃস্বলে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই ধরণের গবেষণা, দুখের বিষয়, নানাবিধ কারণে (যার মধ্যে বই ও পত্রিকার অভাবই

প্রধান) এখনো অজ্ঞাত। আমার এই সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টা সার্থক হবে যদি তারা ঐ গবেষণার আলো পায়। নানান ধরণের কাজের মধ্যে লেখার ফলে ভুল ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। সেজন্য আগেই ক্ষমা চাইছি।

অনিরুদ্ধ রায়

১
কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা

সমকালীন দলিল থেকে মনে হয় যে, মুঘল ভারত একটা বিরাট কৃষিক্ষেত্র যেখানে বিভিন্ন ধরণের কৃষক তাদের জমি চাষ করছে। ঐ সময়ের এক ইওরোপীয় ভ্রমণকারী মন্তব্য করেছেন যে, তাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে মুঘল কৃষি ব্যবস্থার বিশেষ তফাৎ নেই। মুঘল ভারতে কাঠের লাঙল ব্যবহার করা হতো এবং কোনো কোনো জায়গায় লাঙলের ফলায় লোহার টুকরো লাগানো হতো। ভারতের মাটি অত কঠিন নয় বলে লোহার ব্যবহার বেশি ছিল না।

উপকূল এলাকায় সার দেওয়া হতো মাছ দিয়ে। নানান ধরণের ফসলও ফলানো হতো। বর্ষার জল ছাড়া কৃত্রিম সেচপদ্ধতির কথা চাষিরা জানত। কুয়ো থেকে জল তোলার বিভিন্ন উপায় ছিল। যদি জল জমির কাছে থাকে তাহলে যে-পদ্ধতিতে জল তোলা হতো, তাকে বলা হতো *ঢেঙ্কলি* । অন্য যে-পদ্ধতিতে জল তোলা হতো, তাকে বলা হতো *চরস* । বলদ দড়ি ঘোরালে পুলির সাহায্যে চামড়ার বালতি করে জল তোলা হতো। উন্নত ধরণের জল তোলার কায়দাকে বলা হতো *সাকিয়া* বা *পারসিক চক্র*। এটিতে দেখা যায় যে, দড়ি ও মাটির পাত্রের সাহায্যে জল তোলা হতো যার মধ্যে থাকত *পিন ড্রাম শিয়ার* ও চামড়ার বকলস। বাবরের লেখায়, এবং ১৬৯৫ সালে সুজন রাই ভাণ্ডারী-র লেখাতেও এর উল্লেখ দেখতে পাই। সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল ছবিতেও আমরা এর চেহারা দেখি। এই ছবির সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ পর্যবেক্ষকদের রচনার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে। কেউ কেউ একে *অরঘট্ট* বা *ঘট্ট যন্ত্র*-র সঙ্গে তুলনা করেছেন যেটি প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই যন্ত্রে *পারসিক চক্র*র মতো শিকলে বা দড়ির সঙ্গে সারি সারি বালতির কথা নেই যেগুলি চাকার ঘূর্ণণের সঙ্গে জড়িত। পাঞ্জাবে এর বহুল প্রচলন হলেও এই ধরণের যন্ত্রের দাম এত বেশি ছিল যে, ঐ ধরণের চক্র সাধারণ কৃষকের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। ১৬৬০ সালে রাজস্থানের মেরতা পরগণার একটি হিসাবে পাওয়া যায় যে, ঐ-অঞ্চলে পারসিক চক্র মাত্র শতকরা দুভাগেরও কম ছিল। ঐ পরগণায় এই সময়ের মোট ছয় হাজার চক্রের কথা পাওয়া যায় যার মধ্যে মাত্র কুড়িটি কুয়োতে ইঁটের গাঁথনি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে জলের স্তর জমির কাছে থাকায়, জলের ব্যবহার চাষের ক্ষেত্রে বেশি ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

পুষ্করিনী অনেক বেশি ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। সমকালীন সাহিত্যেও পুষ্করিনীর কথা প্রচুর পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন থেকে সমকালীন বাঁধের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য এখন পাওয়া যাচ্ছে। রাজস্থানের ধীবর হ্রদ, উদয় সাগর হ্রদ বা রাজসাগর হ্রদে এই ধরণের বাঁধের কাজ দেখা যায়। মুঘল সরকারের উৎসাহের ফলে এগুলি তৈরি হয় ; ১৬৫০ সাল নাগাদ সরকার খান্দেশ ও মেবারের কৃষকদের প্রায় পঞ্চাশ

হাজার টাকা ঋণ দিয়েছিলেন বাঁধ তৈরি করার জন্য।

সারা মুঘল যুগ ধরেই কৃত্রিম উপায়ে সেচের ব্যবস্থা হতো। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষিকা আভা সিং একটি প্রবন্ধে এই ধরণের খাল কাটার কথা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শাহজাহানের *নহর-এ ফৈজ* প্রায় ১৫০ মাইল লম্বা ছিল। আরো একটি খাল ছিল প্রায় ১০০ মাইল লম্বা। মুঘল আমলের খালের গভীরতা কম ছিল বলে সময়ে সময়ে বিভিন্ন জায়গায় জল পাওয়া যেত না। আবুল ফজলের *আইন-এ আকবরী*তে লাহোর অঞ্চলে চাষের জন্য খালের কথা বেশি নেই।

মুঘল আমলের কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও অন্যান্য ফসলের ফলন করত। *আইন-এ আকবরী*তে আবুল ফজল রবি ফসলের ১৬টি ফলনের খাজনার হারের উল্লেখ করেছেন। তবে সবই আগ্রা প্রদেশের। এ-ছাড়া দিল্লী অঞ্চলে খারিফ মরসুমে ২৫টি ফসলের খাজনার হারও তিনি দিয়েছেন। সব ধরণের ফসল যে সব জায়গায় হতো এমন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে পূর্ব রাজস্থানের একটি গ্রামের দলিল থেকে জানা যাচ্ছে, কোনো এক মরসুমে আটত্রিশ জন চাষির মধ্যে ন-জন চাষি তাদের জমিতে পাঁচটা ফসল করেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষকরা যে নতুন ফসল করতে রাজি ছিল তা বোঝা যায়, যখন দেখা যায় যে, তারা তামাক এবং মকাই-এর চাষ শুরু করেছে, এবং এ-সবের আমদানি ঘটেছিল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। ঐ একই সময়ে বাংলায় তুঁত চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়– যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীতেই তুঁত চাষের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এর ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা হয়ে ওঠে রেশম উৎপাদকারীদের মধ্যে প্রধান।

অন্যান্য ফলনের মধ্যে পাটের উৎপাদন হতো বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। বাঙলার বর্তমান পাট বলতে যেটা বোঝায়, মুঘল যুগে সে-রকম কিছু ছিল না, যদিও সমকালীন মুঘল চিত্রকলায় ফকির দরবেশ ও গরীবদের মধ্যে যে-ধরণের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে– তা পাট বা ঐ ধরণের কাপড় কিনা তাও বিচার্য বিষয়। সে-সময়ের বাংলার বাণিজ্যের মধ্যেও পাটের কোনো উল্লেখ নেই। কফি উৎপাদন হতো মহারাষ্ট্রে, তবে সুরাটে সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বাড়ি বাড়ি সকাল-সন্ধ্যায় কফি বিক্রি হতো তা আসত মধ্যপ্রাচ্য থেকে। চা-এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। আলু আরো পরবর্তীকালের।

মুঘল শাসকশ্রেণী এবং সাধারণ লোকরাও ফল খুব পছন্দ করতেন। কাশ্মীরে মিষ্টি চেরী ফল অবশ্য বাইরে থেকে আমদানি হয়েছিল। পর্তুগিজরা আমের মিশ্রণ তৈরি করতে সক্ষম হয়, যাকে আলফানসো আম বলে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনারস, কাজু বাদাম ও পেঁপে মুঘল ভারতে আসে। পেয়ারা আসে তার পরে।

ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচুর পরিমাণ ফাঁকা জমি থাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করেছিল। কোনো কোনো জায়গায় কৃষকরা ব্যক্তিগত ভাবে নতুন জমিতে আবাদ শুরু করেছে, পত্তনি করেছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে বাংলার কবি

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনায় এই ধরণের পত্তনির কথা পাওয়া যায়। ঐ সময়ে পূর্ব বাংলায় জঙ্গল পরিষ্কার করে যে ধান ও আখের চাষ হয়, সমকালীন বিদেশী ধর্মযাজকদের লেখায় তার নমুনা পাওয়া যায়।

কী পরিমাণ ফসল হতো তা বলা খুব সহজ নয়। আবুল ফজল ভালো, মাঝারি ও খারাপ জমিতে উৎপাদনের তালিকা দিয়েছেন। এর গড়পড়তা উৎপাদন ধরে আগ্রা-দিল্লী অঞ্চলের ১৮৭০ সালের উৎপাদনের সঙ্গে মেলানো যেতে পারে। এতে দেখা যায় যে, গম ও বার্লি প্রায় একই আছে। কিন্তু জোয়ার বা বাজরার বেলায় মুঘল যুগের উৎপাদন অনেক বেশি ছিল। আখের বেলাতেও এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আখের গড়পড়তা উৎপাদন মুঘল যুগে বেশি ছিল। নীলের চাষের বেলাতেও এই একই দিক আমরা দেখতে পাই। এই সব থেকে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মুঘল যুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি।

কিন্তু মনে হয় এটা বলা যায় যে, মাথাপিছু উৎপাদন ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে কিছু বেশি ছিল। যেহেতু মুঘল যুগে জমি বেশি ছিল সেহেতু চাষের গবাদি পশুও বেশি ছিল, এ-কথা বলা যায়। দুধ ও দুধ জাতীয় দ্রব্যের দাম মুঘল যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীর চেয়ে অনেক কম থাকায় এবং উৎপাদনও মুঘল যুগে বেশি হওয়ায়– একথা বলা যায় যে, মুঘল যুগের চাষিদের নিজস্ব গবাদি পশু বেশি ছিল যার ফলে তারা বেশি জমি চাষ করতে সক্ষম হয়েছিল। খাজনার হার থেকেও দেখা যায় যে, মুঘল যুগে খাজনার ছাড়ের হার বিংশ শতাব্দীর তুলনায় বেশ বেশিই ছিল।

মুঘল যুগে গ্রামের মধ্যে আমরা উচ্চ ও নিম্নবর্ণের চাষির কথা পাই। একদিকে যেমন আমরা *মুকুন্দম* বা গ্রামের মোড়লের কথা পাচ্ছি, যাকে সম্পন্ন চাষি বলা চলে। *খুদকস্থ* নামেই এরা পরিচিত। এরা নিজেদের জমি অন্যদের দিয়ে চাষ করাত এবং উৎপাদনের প্রধান অংশ নিজেরাই নিয়ে নিত। উল্টোদিকে, গরীব চাষি–যাদেরকে *রেজারিয়া* বলা হচ্ছে তারা চাষবাস করেও কিন্তু নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য টাকা ধার করত। এছাড়া আছে *পাহিকাস্থ* যারা অন্যদের গ্রামে চাষ করত। এদের সংখ্যা খুব কম ছিল বলে ধরা যায়। কেন অন্যদের গ্রামে গিয়ে কাজ করত সেটা বলা শক্ত। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের কাজ করত বলে মনে হয়।

পূর্ব রাজস্থানের ১৭৯৬-এর খারিফ মরসুমের একটা দলিল থেকে দেখা যায় যে, ৩৮ জন চাষির মধ্যে একজন প্যাটেল আছে যার ষোল বিঘা জমিতে তুলো আর ছোলার চাষ হয়। আর বাকি জমিতে অন্য ধরণের চাষ হতো। আরো কয়েকজন প্যাটেল তিনটে ফসলের চাষ করত। অন্যদিকে দশ জন ছোটো চাষি প্রত্যেকে একটা করে ফসলের চাষ করত যার গড়পড়তা উৎপাদন বছরে ৮ মন ৭ সের। প্যাটেলের উৎপাদনের চাইতে আবার অন্যান্য সব চাষিদের সমবেত উৎপাদন কম।

বাজারের ফসল অর্থাৎ যেগুলি বেশি দামে বাজারে বিক্রি হয় (যেমন তুলো, আখ, নীল, পান, আফিম ইত্যাদি) এসব ফসলে জল ও বেশিবার চাষের প্রয়োজন।

ফলে চাষের পরও কুয়োর ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ-ছাড়াও আখ মাড়াই-এর যন্ত্র, নীলের চৌবাচ্চা ইত্যাদিও থাকা দরকার। ফলে লগ্নির পরিমাণও বেশি এবং বড় চাষিরাই এই লগ্নি করতে পারে। এর থেকে লাভের পরিমাণও বেশি এবং এর দামও খাদ্যশস্যের দামের চাইতে বেশি। এইসব ফসলের খাজনার হারও ছিল বেশি। পূর্ব রাজস্থানের গ্রামের খারিফ মরসুমের ১৬৯০ সালের একটি দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তুলো ও আখের চাষ মোট জমির শতকরা ৮ ভাগ দখল করে আছে। কিন্তু এই দুটো ফসলের খাজনা সমগ্র খাজনার শতকরা ৩২ ভাগের ওপরে। সুতরাং সহজেই বলা যায় যে, চাষিরা এইসব জমিতে বেশি লগ্নি করত ও আয় বেশি করত।

মুঘল ভারতে যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার দরুন, তুলো ও নীলের চাষ প্রায় সব জায়গাতেই হতো। আলোচ্য যুগে কয়েকটি জায়গায় এর জন্য শিল্পও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কৃত্রিম রঙ আবিষ্কারের পর নীল বা ঐ ধরণের রঙের চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় নীলের চাষ মুঘল যুগে কম হতো। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে নীলের উৎপাদন প্রায় আঠার লক্ষ পাউণ্ড হতো বলে বলা যায়। অন্যান্য জায়গার চাষ ধরলে নীলের চাষ বছরে চল্লিশ বা পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডের মতো ধরতে পারি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের উৎপাদনের থেকে এটা অনেক বেশি।

তুঁতের রেশমের একটা উৎপাদনের হিসাব আমরা ধরতে পারি। ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাশিমবাজারের বার্ষিক উৎপাদন ধরেছেন বিশ থেকে ত্রিশ লক্ষ-র মধ্যে। এটা বোধ হয় বাংলার মোট উৎপাদনের চিত্র এবং বলা যায় যে, সমগ্র উত্তর ভারতের উৎপাদন ত্রিশ লক্ষ থেকে চল্লিশ লক্ষ-র মধ্যে। ১৬৯৭ সালে রেশমের মোট উৎপাদন ছিল ত্রিশ লক্ষের নিচে।

এ-সবের থেকে বলা যায় যে, মুঘল ভারতে সপ্তদশ শতাব্দীতে শুধু যে খাদ্যশস্যের উৎপানদই যথেষ্ট ছিল তা নয়, শিল্পদ্রব্যেরও যথেষ্ট উৎপাদন ছিল। এই সব বাজারীদ্রব্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব নিলে এই অনুমান খুবই সঙ্গত। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও বলা যায় যে, দুটো কারণে অনেক সময়ে ঐ উৎপাদন ব্যাহত হতো।

ঠিক সময়ে ঠিকমতো বৃষ্টিপাত না হলে ভারতীয় কৃষির উৎপাদন যে ব্যাহত হবে সেটা বলাই বাহুল্য। যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম নয় সেখানে অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে বা মড়ক শুরু হবে এও স্বাভাবিক। ১৬৩০-৩২ সালে গুজরাটের দুর্ভিক্ষে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক মারা যায়। দাক্ষিণাত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দুর্ভিক্ষে আরো বেশি লোক মারা যায়। গুজরাটে দুর্ভিক্ষের পর চাষিরা তুলোর চাষ ছেড়ে খাদ্য উৎপাদনে মন দেয়।১৬৪৭ সালেও গুজরাটের কৃষি তার পুরানো অবস্থায় ফিরে আসে নি।

দ্বিতীয় কারণটি ছিল সরকারি খাজনা। যেখানে জায়গীরদাররা গড়ে তিন বছর পরে বদলি হচ্ছে সেখানে চাষিদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত তারা। এর ফলে চাষিরা জমি ছেড়ে পালাচ্ছে, এ-কথা যেমন মুঘল দলিলে

পাই তেমনি সমকালীন পর্যটক বার্নিয়ার-এর লেখাতেও পাওয়া যায়। এ-সবের ফলে কোনো কোনো জায়গায় যেমন পত্তনি বেড়েছে, তেমনি অন্য জায়গা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। আওরংজেবের সময়ে দেখা যায়, জরিপ করা জমির পরিমাণ বেড়েছে। এর কারণ বোধহয় এই যে, এ-সময়ে জমির জরিপ বেশি হয়েছিল। কিন্তু ১৫৯৫-১৭০৭ সালের মধ্যে জমির দাম টাকার অঙ্কে যে বেড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। যদি জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কথা এর সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে মনে হয়, খুব অল্পই চাষযোগ্য জমির দাম বেড়েছিল। বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এত কম ছিল যে, ঐ মত মেনে নিতেও দ্বিধা হয় না।

২

ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য কর

ষষ্টদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে আগমনকারী ইওরোপীয় পর্যটকরা রাজাকে বলেছেন ভূমির মালিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় আইনজ্ঞরা মনে করতেন যে, মুঘল ভারতের খাজনা ইসলামীয় আইনের *খারাজ* নয় কারণ অনেক সময়ে উৎপাদনের অর্ধেকই নিয়ে নেওয়া হতো। মুঘল রাজস্ব-ব্যবস্থাকে *মাল* প্রধান কর বলে মনে করা হতো। কিন্তু এটা ভূমি-রাজস্ব নয় বা *রেন্ট* নয়, যেটা সামন্ততান্ত্রিক ইওরোপে প্রচলিত ছিল। ইংরাজ যুগের ভূমি-রাজস্ব থেকেও এটা আলাদা ছিল কারণ ইংরাজ যুগে জমির মাপের ওপর কর নেওয়া হতো, ফসলের ওপর নয়।

রাজ্যের তরফে ফসলের একটা অংশের ওপর দাবি করাকে বলা হয় *মাল* । হিন্দিতে *বাটাই* বা ফার্সিতে *গালাবক্সী* এর কাছাকাছি শব্দ। *বাটাই* বা *গালাবক্সীতে* ফসলের সাধারণ ভাগ করা হয়– একটা অংশ খাজনা আদায়কারী নেয় আর অন্যটি খাজনা যে দেয় সে নেয়।

প্রথমে *কানকুট* ধরা যেতে পারে। এখানে শস্যকে (*কান*) ভাগ করার জন্য এক জায়গার একটি ফসলের উৎপাদন হিস্যাব করে সেই উৎপাদনের হার ঐ ফসলের অন্যান্য জায়গায় আরোপ করা হয়। এর ফলে ঐ ফসলের মোট উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। তার ওপর খাজনার ভাগ ঠিক করা হয়। অবশ্য এর মধ্যে তিন ধরণের ক্ষেতের ফসল আছে যার কথা আগেই বলা হয়েছে– ভালো, মাঝারি ও খারাপ। মনে করা হয় যে, চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই কানকুট প্রথা চলে আসছিল।

ঐ প্রথায় খাজনা সংগ্রহের খরচ কমে গেলেও চাষির পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে না যে, কত খাজনা তাকে দিতে হবে। এ ছাড়াও সবটাই নির্ভর করছে ঐ সময়কার আমলাদের মতামতের ওপর, যারা সরকারকে ফাঁকি দিতে পারে। এসব দূর করার জন্য শেরশাহ কতগুলি পরিবর্তন আনেন। আগের মতো প্রতি ফসলের সময় খাজনা নির্ধারণ করার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে তিনি একটি সাধারণ তালিকা তৈরি করেন যেটি প্রতি ফসলেই ব্যবহার করা হবে– ফসলের অবস্থা যাই থাকুক না কেন। বিভিন্ন ধরণের উৎপাদনের ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য কর এবং প্রতিটি শস্যর জন্যে তালিকা করে তার গড়পড়তা উৎপাদন বের করা হতো এবং একতৃতীয়াংশ খাজনা হিসাবে নেওয়া হতো।

এর ফলে কানকুট প্রথা *জাবতি* প্রথায় পরিবর্তন হয়ে যায়। সরকারের কাজ হলো শুধু জমি মাপা। চাষিরা তার ফলে জানতে পারত কতটা খাজনা তাকে দিতে হবে। ফসল না হলে অবশ্য খাজনা দিতে হবে না।

শেরশাহ-র প্রথায় কতটা অংশ সরকার নিত বলা শক্ত, যদিও আবুল ফজল

শেরশাহ-র তালিকাও দিয়েছেন। খাজনা শস্যে হিসাব করলেও নেওয়া হতো নগদ টাকায়, যে কারণে একে *দস্তর-উল অমল* বলা হতো। আকবরের সময়ের প্রথমদিকে আমরা দেখতে পাই, তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে একই দস্তুর চলছে। কিন্তু আকবর ঐ দস্তুরকে আরো বেশি বাস্তবানুগ করতে চাইলেন। ১৫৬৫ সাল থেকে দস্তুরের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৫৭৪-৭৫ সাল থেকে আকবর কয়েকটি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার ফলে আমূল পরিবর্তন আসে।

দশ বছর ধরে ফসলের উৎপাদন, এলাকা, দাম ইত্যাদির ওপর বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। এসব থেকে প্রতিটি শস্যের খাজনার হার নতুন করে নগদ টাকায় ধার্য করা হয়। লাহোর, মুলতান, আজমীর, দিল্লী, আগ্রা, মালব, এলাহাবাদ ও অযোধ্যাকে খাজনার এলাকায় ভাগ করা হয়। বিভিন্ন শস্যের জন্য প্রতিটি এলাকায় *দস্তর-উল অমল* বা খাজনার হার ঠিক করা হতো। প্রতি বছর নগদ টাকায় খাজনা নির্ধারণ করা হতো যদিও সরকার মাঝে মাঝে ঐ খাজনার হারের কিছু অদল বদল করত। এটাই *জাবতি* প্রথার পরিণত অবস্থা। এর ফলে খাজনা নির্ধারণ করার ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন হার থেকে বোঝা যায় যে, অনেক অনুসন্ধানের পর ঐ হার নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই প্রথায় প্রতি বছর জমি জরিপ করার প্রয়োজন হতো না এবং এই প্রথাকে *নামক* বলা চলে।

আকবরের সময়ে এই প্রথা সিন্ধু থেকে ঘাঘরা নদী অবধি চালু ছিল। শাহজাহানের রাজত্বের শেষদিকে এই প্রথা দাক্ষিণাত্যেও চালু হয়। যেখানে এ-ব্যবস্থা চালু হয় নি, সেখানে *কানকুট* প্রথা চলতে থাকে। আবুল ফজল লিখেছেন যে, আজমীর প্রদেশে *গালাবক্সী* চালু ছিল। পূর্ব রাজস্থানেও এই ধরণের প্রথা ছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর দলিলে তা পাওয়া যায়। কাশ্মীর ও দক্ষিণ সিন্ধুতে শস্য ভাগ করার প্রথা ছিল। বাংলার ব্যাপার অবশ্য আলাদা। এখানে খাজনা নির্ধারিত ছিল— যাকে *মুক্তাই* বলা হতো। জমির ওপর নির্ধারিত খাজনা বছরের পর বছর একই হারে নেওয়া হতো। অথবা সমগ্র গ্রামের ওপর একটা মোট খাজনা ধরে নেওয়া হতো। সমকালীন কবি মুকুন্দরামের লেখা থেকে মনে হয় যে, হাল পিছু একতঙ্কা বছরে খাজনা দিতে হতো। কেউ কেউ মনে করেন যে, মানসিংহ-র সুবাদারীর সময়ে মুঘল *জাবতি* প্রথা অর্থাৎ জমি জরিপ ব্যবস্থা চালানোর চেষ্টা চলে। রাজনৈতিক গোলমালের পর সেই ব্যবস্থা তখনকার মতো পরিত্যক্ত হলেও, জাহাঙ্গীরের সময় থেকে কোনো কোনো এলাকায় জমি জরিপ করা শুরু হয়।

খাজনা ছাড়াও আরো কয়েক ধরণের গ্রামীণ কর ছিল। সবগুলিকে মিলিয়ে সাধারণত *জিহাত* বা *আবওয়ার* বলা হতো। এগুলি বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকম ছিল এবং সব মিলিয়ে ভূমি-রাজস্বর প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগই কর ছিল। *জিজিয়া*, যা ১৬৭৯ সালে আবার চালু হয় তা অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। খাজনার জমার প্রায় শতকরা চার ভাগ ছিল এর সংগ্রহ। এই কর ছিল একজন

অদক্ষ শহুরে শ্রমিকের প্রায় এক মাসের মাইনের মতো। নিঃসন্দেহে এটা একটা ভারী বোঝা।

চাষীদের উৎসাহিত করার মতো কিছু ব্যবস্থাও ছিল। চাষ করার জন্য সরকার থেকে বীজ ও নগদ টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। যেখানে ফসল হয় নি সেখানে খাজনা নেওয়া হতো না। অনাবাদী জমি চাষ করার জন্য সেখানে খাজনার হার কম করে দেওয়া হতো এবং প্রতি বছর কিছু কিছু খাজনা বাড়িয়ে পাঁচবছর সম্পূর্ণ হলে খাজনা নেওয়া হতো। বাংলার কবি মুকুন্দরামের লেখায় এই ধরণের পত্তনির জন্য চাষীদের ঋণ দানের কথা এবং প্রথম তিন বছরে কোনো খাজনা না নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মুকুন্দরামের লেখায় আমরা দেখছি, খাজনা তঙ্কায় নেওয়া হচ্ছে। *জাবতি* প্রথায়ও খাজনা নির্ধারণ করা হচ্ছে নগদ টাকায়। *কানকুটে* খাজনা শস্যে নির্ধারণ করা হলেও তা আবার নগদ টাকায় রূপান্তিত করা হচ্ছে। কতকগুলি জায়গায় যেমন উড়িষ্যা বা কাশ্মীরে শস্যে খাজনা সংগ্রহ করা হতো।

মুঘল সরকারের সবসময়ই আদর্শ ছিল চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি খাজনা নেওয়া। কিন্তু বাস্তবে সরকারের পক্ষে মধ্যবর্তী কারুর কাছ থেকে খাজনা আদায় করা অনেক সহজ ছিল। এর ফলে আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে একটা বৈপরীত্যও সবসময়েই রয়ে যেত। ব্যক্তিগতভাবে খাজনা নিলে সরকার সঠিক খাজনার হিসাব পাচ্ছেন এবং চাষীদের ওপর মধ্যবর্তী শ্রেণীর চাপও থাকছে না। কিন্তু মুঘল দলিলে বারবার দেখা যায় যে, গ্রামই হচ্ছে খাজনার মূল কেন্দ্র এবং মধ্যবর্তী শ্রেণীকে এই খাজনার পরিমাপ ঠিক করতে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে এই শ্রেণী খাজনার একটা বিরাট অংশ ছাড় পেয়ে যাচ্ছে এই কাজের জন্য। উত্তর ভারতে এটা ছিল শতকরা দশ এবং গুজরাটে এটা প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগ। এ-ছাড়াও গ্রামের মোড়লকে শতকরা আড়াই ভাগ ছাড় দেওয়া হয়। এ সত্ত্বেও মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর খাজনার হার কমই ছিল।

এটা পরিষ্কার করা দরকার যে, মুঘল খাজনা ছিল ফসলের ওপর যার ফলে খাজনার তারতম্য ঘটতে থাকে। খাজনার হার জমির ওপর নয়, অর্থাৎ জমির মাপের ওপর খাজনা নির্ধারণ করা হতো না। এ-ছাড়াও প্রতি এককে বড় মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী, যাদেরকে সাধারণত জমিদার বলা হচ্ছে, কম হারে খাজনা দিচ্ছে। সুতরাং খাজনার বোঝা প্রধানত ছোটো চাষীর ওপর পড়ত এবং এই ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলের লোকদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছিল। যারা বেশি লগ্নি করে বাজারীপণ্য উৎপাদন করছে, তাদের পক্ষে খাজনা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হতো। কারণ, তারা সহজেই তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারত। মুঘল যুগে নানান কারণে খাজনার হার বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার ফলে বোঝাটা শুধু ছোটো চাষীদের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ থাকে না, ক্রমশ জমিদারদের ওপরও পড়তে থাকে। একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীবৈষম্য বাড়ছে অন্যদিকে খাজনার বোঝা সব শ্রেণীকেই স্পর্শ করছে– এই দুই দ্বন্দ্ব মুঘল সমাজে পাশাপাশি চলতে থাকে।

৩

জায়গীরদার, জমিদার ও গ্রামীণ সম্প্রদায়

কাগজে কলমে সম্রাটের সমস্ত খাজনা সংগ্রহ করার অধিকার আছে। কিন্তু বাস্তবে কয়েকটি এলাকার খাজনার অধিকার সম্রাট তাঁর শাসক শ্রেণীর কিছু লোকের হাতে দিয়েছেন। এরা সকলেই মনসব্দার অর্থাৎ এঁদেরকে পদমর্যাদা দিয়েছেন সম্রাট স্বয়ং। এই প্রতিটি পদাধিকারী বেতন পাওয়ার অধিকারী যেটি কোষাগার থেকে নগদ টাকায় দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এর পরিবর্তে এই সব মনসব্দারদের একটা এলাকায় *জায়গীর* দেওয়া হতো যার খাজনা ঐ মাহিনার সমান। এর জন্যে কোনো এলাকার, এমন কি গ্রাম পর্যন্ত, কত খাজনা হবে (*জমা*) সেটা ঠিক করা থাকত। সরকারের নিজস্ব জমিও ছিল যেগুলিকে বলা হতো *খালিসা* । সরকারি কর্মচারীরা এই সব এলাকা থেকে খাজনা সংগ্রহ করে কোষাগারে জমা দিতেন। আকবারের রাজত্বের শেষদিকে তিনটি প্রদেশে অন্তত খালিসার খাজনা ছিল মোট জমার এক-চতুর্থাংশ। জাহাঙ্গীরের সময়ে খালিসার পরিমাণ কমে গেলেও শাহজাহান আবার খালিসা বাড়াতে সক্ষম হন। তখন এটা দাঁড়ায় এক-সপ্তমাংশে। সুতরাং অধিকাংশ জমিই জায়গীরের মধ্যে ছিল বলা যায়।

এদিক থেকে দেখলে দেখা যায়, মুঘল শাসকশ্রেণীর হাতে রাজত্বের বিরাট একটা অংশ রয়েছে। ১৬৪৬ সালে মনসবদারদের মোট সংখ্যা হলো প্রায় আট হাজারের কাছে। এদের মধ্যে একটা ছোটো অংশ, যেমন রাজপুত, বালুচ ও গক্করা ছিল জমিদার। অধিকাংশই ছিল বহিরাগত— এসেছিল প্রধানত ইরান, তুরান্ ও আফাগানিস্থান থেকে। আর স্থানীয় আমলাদের থেকেও কিছু মনসব্দার নেওয়া হতো। মনসব, যদিও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, তাদের উত্তরাধিকারীদেরকেই মনসব্ দেওয়া হচ্ছে। আর এর ফলে তৈরি হতো 'খানজাদা' পরিবার যারা যুগ যুগ ধরে মনসব্দারী ভোগ করত।

মনসব্দাররা সম্রাটের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। সম্রাট চাইলে তাদের সাময়িক জায়গীর দিতে পারেন। জায়গীরদার একই জায়গায় প্রতি বছর জায়গীর পাবে এরকম কোনো কথা নেই। এ-ব্যবস্থা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হলেও, মনসব্ প্রথায় এ-ব্যবস্থা আসতে বাধ্যও। মনসব্দারদের উঁচু বা নিচুপদে দিলে, তাদের বেতন বদলাবে এবং স্বভাবতই জায়গীরও বদলানো হবে। কোনো কোনো সময়ে জায়গীর এলাকা ছোটো বা বড় করে এই সমস্যার সমাধান করা হতো। কিন্তু এর ফলে জায়গীরদার বদলও অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সুতরাং জায়গীর এলাকায় জায়গীরদারদের কোনো স্থায়ী স্বত্ব ছিল না। তারা কেবল অনুমোদিত ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য কর আদায় করতে

পারত। এই সব কাগজ তৈরি করে দিত কানুনগো, যার ওপর ভিত্তি করে জমা নির্ধারণ করা হতো। জায়গীরদারদের কোনো বিচারের ক্ষমতা ছিল না– এই ভার ছিল কাজীর ওপর। আর ছোটো জায়গীরদারদের পুলিশের ক্ষমতা ছিল না। সাধারণত এই ধরণের কাজ দেখত ফৌজদাররা। অবশ্য বাস্তবে জায়গীরদারদের ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্তত বড় জায়গীরদারদের বেলায় তো নয়ই।

১৬৪৬ সালের একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, ৬৮ জন মনসব্দার সাম্রাজ্যের মোট জমার শতকরা ৩৬.৬ ভাগ ভোগ করছে। পরবর্তী ৫৮৭ জন শতকরা ২৫ ভাগ পাচ্ছে। শেষ প্রায় ৭,৫০০ মতো মনসব্দার খাজনার প্রায় এক-চতুর্থাংশ পাচ্ছে। এর থেকে এটা পরিষ্কার যে, মাত্র কিছু সংখ্যক লোকের হাতে জায়গীরের প্রধান অংশ রয়েছে। বড় জায়গীরদারদের প্রভূত ক্ষমতা ছিল বলে সমকালীন পর্যটক বার্নিয়ার লিখেছেন। যেহেতু জায়গীরদাররা বদলি হয়ে যাবে সেহেতু চাষীর কাছ থেকে যতটা খাজনা নেওয়া সম্ভব ততটাই এরা আদায় করত। এর ফলে বিপন্ন চাষীরা অনেক সময়ই ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হতো। মুঘল শাসনতন্ত্র অবশ্য চাষীদের রক্ষা করবার চেষ্টা কিছুটা করেছে। কিন্তু সে চেষ্টা কতটা কার্যকর হয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

সম্রাট কিছু লোককে নিষ্কর জমির খাজনা ভোগ করার অধিকার দিতেন যেগুলিকে *মাদাদ-ই মাস* বা *সয়রঘুল* বলা হতো। সাধারণত এই অধিকার ছিল ঐ লোকদের সারাজীবনের জন্য। কতকগুলি শর্তসাপেক্ষ এগুলি ওদের উত্তরাধিকারীদেরও দেওয়া চলত। এগুলি সাধারণত ধর্মীয় মুসলমানদের, বৃদ্ধ আমলা বা উচ্চশ্রেণীর বিধবাদের দেওয়া হতো। ১৫৯৫ সালে আগ্রা সুবার জমার শতকরা চারভাগ এবং এলাহাবাদ সুবার প্রায় শতকরা পাঁচভাগ ছিল এই ধরণের জমি। এরা অবশ্য সবসময়েই চেষ্টা করত ঐ এলাকায় জমিদারী অধিকার পাবার জন্য, যেটাতে কেউ কেউ সাফল্য লাভও করেছিল। কৃষি অর্থনীতির ওপর এদের প্রভাব সামান্য ছিল বলে ধরা যায়।

জমিদার শব্দটি ফারসি। এর অর্থ, 'জমি অধিকার করে আছে যে'। কিন্তু সে-ই যে জমির মালিক এমনটা নয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে জমিদার অর্থে কোনো একটি এলাকার প্রধান বলে বলা হয়েছে, যেখানে *জমিন* শব্দটিতে বিস্তৃতভাবে দেশ বোঝাচ্ছে। আকবরের সময় থেকে *জমিদার* শব্দটি বারবার ব্যবহার করা হতো এমন এক ধরণের লোক সম্বন্ধে যারা উত্তরাধিকার সূত্রে চাষীদের খাজনা সংগ্রহ করত। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এই কাজটি জমিদারদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন এলাকায় এই ধরণের লোকেদের জন্য বিভিন্ন শব্দ ছিল। দোয়াব অঞ্চলে এদের বলা হতো *খোটি* বা *মুকদ্দম* । রাজস্থানে *ভোমি* , অযোধ্যাতে *বিশয়াই* গুজরাটে *বন্থ* । *জমিন্দারি* বলতে অবশ্য বিভিন্ন ধরণের অধিকারের কথা বোঝায়। মুঘল শাসনতন্ত্রের দলিলেও এই ধরণের অধিকারের কথাই বলা হয়েছে। মুঘলরা সব সময়ই চেষ্টা করেছে একই ধরণের অধিকার ও শাসনতন্ত্র কায়েম করতে কিন্তু বাস্তবে ঐ আদর্শের সঙ্গে সব সময়েই তাদের সমঝোতা করে চলতে হয়েছিল।

খাজনা ছাড়াও জমিদারদের আরো কয়েকটি কর আদায় করার অধিকার সুলতান যুগের আগে থেকেই ছিল। এগুলি ছিল প্রধানত চাষীদের ওপর কয়েকটি কর। অযোধ্যাতে বিঘা প্রতি দশ সের উৎপন্ন শস্য ছাড়াও একটি তামার মুদ্রা দিতে হতো। রাজস্থানে এ-ধরণের করের নাম ছিল *ভোম* । এ-ছাড়াও গবাদিপশু, বাড়ি ইত্যাদির জন্য চাষীদের আলাদাভাবে কর দিতে হতো। কর দিতে হতো জল ও জঙ্গলের ব্যবহারের জন্যও।

জমিদারি কর খাজনা থেকে মূলত পৃথক। কিন্তু মুঘল যুগে এই পার্থক্য অনেকখানি কমে যায়। কোনো কোনো জায়গায়, যেমন বাংলায়, জমিদারির আয় হচ্ছে খাজনা সংগ্রহ করে তার একটি অংশ নিজের কাছে রাখা। অন্য জায়গায়, জমিদার যে খাজনা সংগ্রহ করবে তার এক-দশমাংশ নিজের কাছে রাখবে। এই এক-দশমাংশের বদলে হয়ত তাকে নিষ্কর জমি ভোগ করার অধিকার দেওয়া যেতে পারে। যদি সরকার তাকে বাদ দিয়ে সরাসরি খাজনা সংগ্রহ করে বা সে খাজনা সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে তাকে শতকরা দশভাগ মালিকানা হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। গুজরাটে এ-অবস্থায় শতকরা পঁচিশভাগ মালিকানা হিসাবে দেওয়া হতো।

১৬৭০ ও ১৬৮০-র দশকের অযোধ্যার কয়েকটি দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জমিদারির আয় বার্ষিক খাজনার প্রায় ২.৩-এর মতো। অর্থাৎ যে কিনছে তার আয় বার্ষিক খাজনার এক-চতুর্থাংশের কাছাকাছি হবে। তার খরচের হিসাব ধরলে তার মোট আয় খাজনার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হবে। বাংলায় অবশ্য অনেক কম–বিক্রির দাম বার্ষিক খাজনার একটু ওপরে।

জমিদারির দাবি এসেছে মূলত অনাবাদী জমিতে পত্তনি বসিয়ে অর্থাৎ চাষ-আবাদ করে। ফলে প্রজাকে জমি থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও তারা করতে পারত। সপ্তদশ শতাব্দীর একটি দলিলে বলা হচ্ছে যে, প্রজারা জমিদারদের এই অধিকার মেনে নিয়েছে। যদিও এটাও বলা হয়েছে যে, এই অধিকার জমিদাররা জোর করে আদায় করেছে।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, জমিদারি অধিকার মূলত জাত বা কৌমের সঙ্গে জড়িত। অনেক সময়ই জমিদার ও প্রজারা একই জাতের লোক। নিজেদের সৈন্য রাখার জন্য এই ধরণের লোকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আবুল ফজল *আইন-এ-আকবরী*-তে জমিদারদের বিভিন্ন জাতের কথা বলেছেন। মুঘল শাসনতন্ত্রের কাছে এটা পরিষ্কার যে, জমিদাররা একটি সামরিক শক্তি এবং রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলাও করা দরকার।

এ-সব সত্ত্বেও বলা যায় যে, অন্যান্য সম্পত্তির মতো জমিদারিও একটি সম্পত্তি যা উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে। জমিদারি বিভিন্ন উত্তরাধিকারীর মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এরকম দৃষ্টান্তও আছে। আবার জমিদারি অধিকার বিক্রি হচ্ছে এরকম বহু প্রমাণও আছে। এর ফলে ছোটো আমলারা সম্পদ সংগ্রহ করে জমিদারি অধিকার কিনছে। মুঘলযুগে বণিকরা জমিদারি কিনছে এ-রকম দৃষ্টান্ত কিন্তু বিরল।

একই জমিদারির মধ্যে আমরা পাই যে, কয়েকটি গ্রাম মাত্র কয়েকজনের হাতে। আবার অন্য কয়েকটি গ্রাম কৃষকদের হাতে রয়েছে (রায়তওয়ারী), সেখানে জমিদার বলে কেউ নেই। এদের মধ্যেকার তফাৎটাও খুব স্পষ্ট নয়। তবে অনেক সময় চাষীরা এসব এলাকা জমিদারের কাছে বিক্রি করতে পারত বা জমিদার জোর করে এগুলো কেড়েও নিতে পারত। মুঘল সরকার পুরোনো জমিদারের বদলে নতুন জমিদার তৈরি করতে পারত। জমিদার ছাড়াও নতুন পত্তনি হচ্ছে এরকম নিদর্শনও রয়েছে।

আঠের শতকের শেষদিকে জমিদারি প্রসঙ্গে নানারকম বিতর্ক শুরু হয় ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলাদের মধ্যে। ভারতীয় আমলারাও নানারকম মত দেন। বিহারের নায়েব দেওয়ান, সীতাব রায় বলেন যে, খাজনা রাজার কিন্তু জমি জমিদারের। রাজা রাজবল্লভ বলেন যে, রাজা জমির মালিক এবং জমিদাররা তার আমলামাত্র। হাল আমলে অধ্যাপক রণজিৎ গুহ তাঁর লেখায় এই বিতর্কের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সারা মুঘল যুগ ধরে সম্রাট, অভিজাত ও জমিদারদের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশ নিয়ে টানাপোড়েন চলেছিল। জমিদার ও কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যে এটাই ছিল মূল দ্বন্দ্ব। কিন্তু একই সময়ে ওরা ছিল অর্থনৈতিক শোষণের অংশীদার। সুতরাং ওদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ট।

ফারসি ভাষায় জমিনদার বলতে বোঝায় যার জমি আছে। জিয়াউদ্দীন বারানি প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন চোদ্দ শতকে। এ ছাড়াও, উনি *খট* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবুল ফজল *ভূমিয়া* শব্দটি জমিদারের মতোই ব্যবহার করেছেন। সতের শতকের শেষে জমিদার শব্দটির বদলে *তালুকদার* শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু হয়। সতের শতকের দলিলে জমিদারকে *মালিক* বলা হয়েছে এবং তার অধিকারকে *মিল্কিয়াৎ* বলা হতো। সুতরাং জমিদারি অধিকার বলতে *মিল্কিয়াৎ* বোঝাত।

মালিক শব্দটি আরবি। ইংরিজিতে এর মানে করা যেতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সতের শতকের জমিদার বলতে গ্রামের মালিককে বোঝাত এবং তার অধিকার অন্য গ্রামের ওপরেও ছিল। এই কারণে সাধারণ কৃষকের থেকে বেশ ওপরে ছিল এই জমিদার শ্রেণী।

মুঘল যুগে জমিদার শব্দটি অতিমাত্রায় প্রচলিত হয়। এর থেকে এই অর্থ করা যায় যে, বিভিন্ন ধরণের অধিকার যেগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে আসত। এদের মধ্যে অর্থগত ও মর্যাদাগত তারতম্য ছিল– বড় রাজা থেকে শুরু করে গ্রামের ছোটো জমিদার সবাই একই নামে পরিচিত হতো। প্রাক-মুঘল যুগে যে বিভিন্ন নাম পাওয়া যায় যেমন রাজা, রাই, ঠাকুর, খট, মুকদ্দম, চৌধুরী ইত্যাদি– সেগুলি মুঘল যুগে এক হয়ে জমিদার বলে পরিগণিত হয়। শতাব্দী ধরে যে বিভিন্ন অধিকার গড়ে উঠেছে মুঘলরা সেগুলি একটি পর্যায়ে নামিয়ে আনে।

কর্ণেল টড রাজস্থানের ইতিহাসে জমিদার ও জায়গীরদারদের সমার্থক করেছেন।

এদের দুজনের মধ্যে একই ধরণের চেহারা বাইরে থেকে দেখা গেলেও, দুটি প্রথাই আলাদা। অধ্যাপক নুরুল হাসান জমিদারদের অধিকার ভেদে তিনটি ভাগ করেছেন, যে-ধরণের বিভাজন জায়গীরদারদের বেলায় খাটে না। এই বিভাজন আমরা এই ভাবে দেখি :

এক, আধা-স্বাধীন জমিদার, যাদেরকে রাজা বলা হতো ;

দুই, মধ্যবর্তী জমিদার ;

তিন, জমিদার।

এই বিভাজনের প্রধান সমস্যা হলো এই যে, এরা একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা নয়। অর্থাৎ যেমন প্রথমটির মধ্যে অন্য দুটি রয়েছে। আর একটা সমস্যা হলো, জমিদারির মধ্যে খালসা এবং জায়গীর জমি রয়েছে। আরো বড় তফাৎ হলো, এদের মধ্যে উদ্বৃত্তের কতটা অংশ কে পাবে– তার মধ্যে। বলা নিস্প্রয়োজন যে, মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে এমন কোনো পরগণা নেই যেখানে জমিদার ছিল না।

আধা-স্বাধীন জমিদার

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে অনেকগুলি বড় জায়গা বিভিন্ন ধরণের জমিদারদের অধীনে ছিল। এদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম ছিল এবং তাদের উত্তরাধিকারও ছিল। এদের মধ্যে যেমন কচ্ছ বা জুনাগড়ের জমিদারের মতো বড়ো জমিদার ছিল, তেমনি ভাদুরিয়ার জমিদারের মতো ছোটো জমিদারও ছিল। এদের এলাকার মধ্যে সম্পূর্ণ শাসন ব্যবস্থা ছিল।

সুলতানী আমলে সামরিক সাহায্য ও উপঢৌকনের বদলে এরা এই অধিকার ভোগ করত। কতটা উপঢৌকন ছিল বা কতটা নিয়মিত সাহায্য ছিল, সেটা জানার উপায় এখন নেই। আবার কখনও বিদ্রোহ করলেও তাদের মধ্যবর্তী জমিদারি অধিকার বা মুখ্য জমিদারি অধিকার কেড়ে নেওয়া হতো না।

আকবরের সময়কার, আবুল ফজলের লেখা থেকে দেখা যায় যে, কখনো তিনি জায়গার জমিদার (যেমন জম্মুর রাজা) এবং কখনো উপজাতি এলাকার জমিদার যেমন বালোচ জাতির নায়ক হিসাবে দেখছেন। বলা যায় যে, কেউ কেউ এলাকাভিত্তিক জমিদার হিসাবে এবং কেউ কেউ জাতিগত জমিদার হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু জাতিগত হিসাবে হলেও এর সুনির্দিষ্ট এলাকা রয়েছে। আবুল ফজল এদের সম্বন্ধে *উলুস* বা *আলুস* শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার থেকে বোঝা যায় যে, এটা শুধু জাতি বা উপজাতিগত এলাকা নয়। এদের সামরিক শক্তি নির্ভর করত অনেকাংশে নিবিড় সংগঠনের ওপর। জমিদারের উদ্বৃত্ত অংশও নির্ভর করত এর ওপর। এলাকাভিত্তিক জমিদারির মধ্যে বিভিন্ন উপজাতি রয়েছে। জমিদার প্রধানত শক্তিমান জাতির নেতা। যেমন মেবারের জমিদার প্রধানত শিশোদিয়া উপজাতির নেতা, যদিও ওখানে প্রচুর ভীল গোষ্ঠী ছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক শক্তির ধারক ছিলেন মূলত এই জমিদাররা এবং

এদের সামরিক শক্তিও ছিল বিশাল। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, সাম্রাজ্যের সমগ্র জমা ছিল ৫২ কোটি *দাম*-এর মতো। (তামার মুদ্রা), যার মধ্যে রাই ও রাণাদের জমা ছিল প্রায় ৯ কোটি *দাম*-এর মতো। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ ছিল এদের হাতে। আবুল ফজল ১৫৯৫-৯৬ সালে লিখছেন যে, জমিদারি সৈন্য-র সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৪ লক্ষ। এদের মধ্যে একতার অভাব থাকায় এদেরকে পরাজিত করা সহজ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শাসন এদের সঙ্গে নানাধরণের সমঝোতায় এসেছিল। এক ধরণের জমিদারদের মনসব্দার করে মুঘলরা শাসক শ্রেণীর মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। আকবরের সময়ে ২০০ জন মনসব্দারীর মধ্যে ৬১ জনের কথা উল্লেখ করেছেন আবুল ফজল। এদের মধ্যে ৪০ জনই ছিল আজমীর সুবার অন্তর্গত এবং এই ৪০-এর মধ্যে ২৭ জন ছিল কাছোয়া গোষ্ঠীর। বাকি ১৩ জনের মধ্যে ছিল যোধপুর, বিকানীর, মেবার ও আফগান জমিদাররা। ৭ জনের মধ্যে লাহোর সুবার মধ্যে গক্কর গোষ্ঠীর ছিল ৬ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ৬১ জনের মধ্যে কাছোয়া ও গক্কররা ৩৩টি মনসব্ পেয়েছিলেন।

মনসব্দার হিসাবে এই জমিদাররা ভালো জায়গীর পেতেন এবং তাদের জমিদারির বাইরে কাজ করতেন। মানসিংহ দুবার বাংলায় এসেছিলেন। তিনি কাবুলেও যান।

দ্বিতীয় ধরণের জমিদার ছিলেন যাঁরা শুধু সামরিক সাহায্য দিতেন প্রয়োজন অনুযায়ী। এঁর মনসব্দার নন। জম্মুর রাজা বা কাংড়ার রাজা এই ধরণের জমিদার ছিলেন। সামরিক সাহায্য না দিলে এদেরকে বিদ্রোহী বলে ধরা হতো। সামরিক সাহায্য ছাড়া এরা উপঢৌকন পাঠাতেন বশ্যতার নিদর্শন হিসাবে। এই উপঢৌকনকে বলা হতো *পেশকাস* এবং এদের বলা হতো পেশকাসী জমিদার। তৃতীয় ধরণের জমিদারও ছিলেন যারা শুধু পেশকাসই পাঠাতেন। এদের সামরিক সাহায্য দিতে হতো না। এদেরকেও ঐ একই নামে অর্থাৎ পেশকাসী জমিদার আখ্যা দেওয়া হতো।

পেশকাস যে ঠিক কী তার সম্পূর্ণ বিবরণ কোথাও নেই। ঐতিহাসিক নিজামুদ্দীন তাঁর *তবাকৎ-আকবরী* তে এই পেশকাসের উল্লেখ করেছেন যদিও বিশদ বর্ণনা দেন নি। সাধারণত পশুপাখি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের গহনা ও অলঙ্কার পাঠানো হতো। কোনো কোনো সময় নগদ টাকাও পাঠানো হতো। জমিদারদের জমা কত ছিল তা কেন্দ্রীয় শাসন জানত কারণ আবুল ফজল ঐ জমার একটি তালিকা দিয়েছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কেন্দ্রীয় শাসনও ওই জমা অনুযায়ী পেশকাসের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতেন। কিন্তু তার পরিমাণ কত ছিল অর্থাৎ কি হারে পেশকাস নির্ধারণ করা হতো, সেটা বলা যায় না। মনে হয়, খাজনা যারা দিচ্ছে তাদের তুলনায় এই হার ছিল কম। কারণ কেন্দ্রীয় শাসন সব সময়ই চেষ্টা করছিল পেশকাসী জমিদারকে মাল-গুজারী (অর্থাৎ খাজনা যারা দেয়) জমিদারে পরিণত করতে। এরকম দু-একটি উদাহরণও খুব বিরল নয়।

আবুল ফজল বলেছেন যে, পেশকাস নিয়মিত দেওয়া হতো। কত নিয়মিত—

অর্থাৎ বাৎসরিক না ষান্মাসিক, না অন্য কিছু সেটা তিনি বলেন নি। সাধারণত দেখা যায় যে, জমিদার বা তার দূত সভায় এলে এটি দিচ্ছেন। মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি জমিদারিতে গেলেও এটা দেওয়া হতো। এর থেকে মনে করা যায় যে, নিয়মিত পেশকাসী ও অনিয়মিত পেশকাসী জমিদার ছিল।

মুঘল সম্রাট চাইতেন জমিদারদের ব্যক্তিগত হাজিরা। মেবারের রানা প্রতাপ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করলেও ব্যক্তিগত হাজিরা দিতে সম্মত হন নি। ফলে যুদ্ধ হয়। জাহাঙ্গীর অবশ্য পরে মেবারের ব্যক্তিগত হাজিরা দেওয়া মাপ করে দিয়েছিলেন। যশোরের প্রতাপাদিত্যের সঙ্গেও ঐ একই কারণে গোলমাল হয়। প্রতাপাদিত্য মুঘল সেনানায়কের সঙ্গে দেখা করে বশ্যতা স্বীকার করেন। ওঁর দুই ছেলে মুঘল মনসব্দার হয়। প্রতাপাদিত্য দ্বিতীয়বার নিজে না আসায়, ওকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধের পরে প্রতাপাদিত্যর দুই ছেলেকে মূল জমিদারির অংশ দেওয়া হয়।

বিভিন্নভাবে মুঘলরা জমিদারদের স্বাধীনতা খর্ব করেছে। উত্তরাধিকারীতে হস্তক্ষেপ করেছে। জমিদারীর অংশ কিছু সময়ের জন্য নিয়ে নিয়েছে। পুরোনো জমিদারকে সরিয়ে নতুন জমিদার বসিয়েছে ও নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, জমিদাররা মুঘল সম্রাটের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। এটা অবশ্য অনেকখানি নির্ভর করছে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক নীতির ওপর।

আকবর রাজপুত নীতি শুরু করলেও সেটা কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। জাহাঙ্গীর এটিকে আরো প্রসার করেন। নিচের তালিকা থেকে এ ধারণা আরো স্পষ্ট হবে :

	১৬০৫ সাল	১৬২৭ সাল
কাছোয়া	৬৮.৮%	১০.৫%
রাঠোর	১০.৪%	১২.৬%
শিশোদিয়া	৩.৫%	৭.০%
বুন্দেলা	১.২%	১০.৪%
হাড়া	২.৩%	৬.১%
দাক্ষিণাত্য	০%	৩৪.১%

জাহাঙ্গীর রাজপুত গোষ্ঠীর মধ্যে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করেছিলেন শুধু তাই নয়। দাক্ষিণাত্যেও বিপুলভাবে অনুপ্রবেশ করেন। দাক্ষিণাত্যে এই অনুপ্রবেশ আওরংজেবের সময়ও অব্যাহত ছিল। আকবর অবশ্য কাছোয়াদের মধ্যে দুই গোষ্ঠী রাজাওয়াৎ ও শেখওয়াতের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেন। ওঁর সময়ে রাজাওয়াৎ গোষ্ঠীর বিহারীমল ও তার পরিবার প্রাধান্য লাভ করে। ১৯৭৪ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে পঠিত খালিদ সইফুল্লার একটি প্রবন্ধ থেকে দেখা যায় যে, রাজাওয়াৎ

গোষ্ঠী প্রাধান্য পেলেও সারা সাম্রাজ্যে তাঁরা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে জাহাঙ্গীরের সময়ে তাদের পতন তরান্বিত হয়ে যায়।

মধ্যবর্তী জমিদাররা প্রধানত মুখ্য জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা সংগ্রহ করে জমা দিতেন। এরাই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ— একদিকে খাজনা আদায় করা ও অন্যদিকে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা ছিল এদের প্রধান কাজ। সরকারি দলিলে এদেরকে বলা হতো *খিদমৎগুজারী জমিদার*। এদের মধ্যে ছিলেন মুখিয়া মুকদ্দম, চৌধুরী, তালুকদার, কানুনগো, খট, ইজারাদার ইত্যাদি। সাধারণত তাদের কাছ থেকে কম হারে খাজনা নেওয়া হতো বা ছাড় দেওয়া হতো, পারিশ্রমিক হিসারে। এই কম হার বা ছাড়কে *রসুমৎ-ই মুকদ্দমী* বলা হতো। কখনো কখানো *রসুমৎ-ই জমিদারি* বা *হক্কিৎ-ই জমিদারি* বলা হতো। এই ধরণের জমিদাররা উৎপাদনের একটা অংশের দাবি করত। যাকে *নানকর* বলা হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুখ্য জমিদাররাই এই ধরণের কাজ করে। চৌধুরী এই ধরণের জমিদার।

ইজারা প্রধানত খাজনা আদায় করার চুক্তি। সতের শতকে ইজারা খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। এগুলি প্রধানত হয় কোনো ফসলের জন্য বা কোনো সময়ের উৎপাদনের জন্য। কিন্তু এরা কেন্দ্রীয় নিয়মানুযায়ী খাজনা সংগ্রহ করবে এবং পরে হিসাব দাখিল করবে। আকবরের আগে যে ইজারাদার ছিল তার প্রমাণ আছে। বৈষ্ণব কবিতায় দেখা যায় যে, হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্ধন দাস বারো লাখ টাকায় সপ্তগ্রামের ইজারা নিয়েছিলেন।

আকবরের সময়ে বিশেষ একটা টাকার জন্য ইজারা দেওয়া বিরল। বাংলায় সাধারণত একটা বিশেষ টাকার অঙ্ক দেবার ইজারা করা হয়, উৎপাদনের ওপর নয়। কতটা খাজনা ইজারাদার নেবে এটা প্রধানত পরম্পরার ওপর নির্ভর করত। আকবরের সময়ে জমি জরিপের উল্লেখ নেই— একটি দুটি অংশ ছাড়া। ১৫৯৪ সালে মুকুন্দরামের রচনা থেকে মনে হয় যে মুঘলরা এসে জমি জরিপ করা শুরু করলে মহাগোলমাল শুরু হয়। টাকার মূল্য পড়তে থাকে এবং গ্রাম পরিত্যক্ত হতে থাকে। খাজনা দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবার ফলে ডিহিদার জোরজুলুম চালাতে থাকে।

আঠের শতকের বাংলা ও দিল্লী অঞ্চলে *মালিকানা* ও *হক* শব্দগুলি জমিদারদের সম্পর্কে পাওয়া যায়। জমিদার খাজনা তোলার জন্য খাজনা বা উৎপাদনের যে অংশ পায়, সেটাই *মালিকানা*। কিন্তু এ-ছাড়াও জমিদার তার কাজের জন্য *নানকর* পাচ্ছে। কিন্তু যদি জমিদারের বদলে সরকারি আমলা খাজনা সংগ্রহ করে, যাকে *সির* বলে, তাহলে জমিদার তার *হক* (অধিকার) হিসাবে মালিকানা পায়। সুতরাং মালিকানা দেওয়া হয় তখনই যখন জমিদারকে সরিয়ে দিয়ে সরকারি আমলা খাজনা সংগ্রহ করে।

মধ্যবর্তী জমিদার সবসময়ই চেষ্টা করে তার উত্তরাধিকার সূত্রের জমি বাড়াতে যাতে সে বড় জমিদার বা *জমিদারন-ই উমদা* হতে পারে। সম্রাটও ঐ উত্তরাধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। আকবর এলাহাবাদের চৌধুরীকে বরখাস্ত করেন এই কারণে

যে, সে তীর্থযাত্রীদের হেনস্তা করছে। তবে এদেরকে খুশি করার জন্য অনেক সময় *ওয়াটন* এবং *অল-তুমঘা* জায়গীর দেওয়া হতো যার থেকে তারা পরবর্তী কালে বড় জমিদারে পরিণত হতো। কেয়ামুদ্দিন আহমদ একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, এইভাবে দ্বারভাঙার মহারাজা বড় জমিদার হয়েছিলেন। এছাড়াও অনুপশহর এবং বুলন্দশহরের দৃষ্টান্ত আছে।

মুখ্য জমিদার

এদেরকেই জমির অধিকারী বলা যেতে পারে। কিন্তু মধ্যবর্তী জমিদার এদের অধিকার কেড়ে নিতে পারে যার ফলে জমির ওপর অধিকার এরা হারাতে পারে। মুখ্য জমিদার ছোটো বা বড় জমিদার হতে পারে এবং আগেই বলা হয়েছে যে, অন্য দু-ধরণের জমিদারদের মধ্যে এরা থাকতে পারে। এর থেকে বোঝা যায় যে, এরা জমির ওপর যে অধিকার রাখছে সেটা প্রধানত কৃষকদের জমির ওপর অধিকারী হিসাবে, যাকে *পাইকস্থ* বলা হয়। প্রায় সমস্ত কৃষিযোগ্য জমি এই ধরণের জমিদারদের দখলে ছিল এবং মুঘল নীতি ছিল এদের অধিকার রক্ষা করা।

ষোলো শতক থেকেই বহু বিক্রির দলিল পাওয়া যায়। বিক্রির পর কাজীর কাছে নথিভুক্ত করার নিয়ম ছিল। বরাবরই এরা নিচের কৃষক ও ওপরের শাসনকর্তা ও জমিদারদের মধ্যে ছিল। একদিক থেকেই এরাও শোষণের অংশীদার-- কারণ যে কোনো রকম বোঝা এরা কৃষকদের ওপরে চাপিয়ে দিত। সেদিক থেকে এদের ভূমিকা ছিল পশ্চাৎমুখী। অন্যদিকে এরা জাতিগত বা গোষ্ঠীগত দিক থেকে কৃষকদের কাছাকাছি হওয়ায়, বারবার তাদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছে।

অনেক সময়ে এরা কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা নিয়ে পাট্টা দিয়েছে। কবি মুকুন্দরামের রচনায় আমরা জনৈক বুরান মণ্ডলের দেখা পাই, যে-ব্যক্তি কৃষকদের পাট্টা দিচ্ছে। আবুল ফজল লিখছেন যে, গ্রামের মোড়লরা খাজনা সম্পূর্ণ সংগ্রহ করার পর এক-চল্লিশাংশ খাজনা নিজেরা পেত। নুরুল হাসান ও ইরফান হবিব শতকরা আড়াই ভাগ ও অন্যান্য ছাড় এদের বলে ধরেছেন। সব মিলিয়ে মোট আয় খাজনার দশভাগ গিয়ে দাঁড়ায়। সিরিন মুস্‌ভি অবশ্য এর বিরোধিতা করেছেন। তিনি উত্তর ভারতের খামার থেকে এদের আয় শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ এবং গুজরাটে ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ ধরেছেন। মুঘল নীতি অবশ্য ছিল এই যে, কৃষকদের কাছ থেকে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি খাজনা আদায় করা চলবে না। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে জমিদারী আয় বেড়ে যায়। ফরাসি পর্যটক মোদভি ১৭৭০ এর দশকে দিল্লী-আগ্রার কাছে কৃষকদের শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত দিতে দেখেছেন। সুতরাং একদিকে সহযোগিতা থাকলেও অন্যদিকে দ্বন্দ্ব ছিল ; যদিও মুঘল খাজনা প্রথা ইংরাজদের থেকে মূলত ছিল পৃথক। মুঘল খাজনা ছিল ফসলের ওপর যেখানে ইংরাজ খাজনা ছিল জমির ওপর।

মুঘল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক এক জায়গায় এক এক ধরণের জমিদারী ব্যবস্থা

গড়ে উঠতে থাকে। কেন্দ্রীয় শাসন অবশ্য সব সময় একটা নীতির মধ্যে বা এক ধরণের কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। বাংলাতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না যদিও একই কাঠামোর মধ্যে আসতে অনেক সময়ে লাগে।

তপন রায়চৌধুরী ও বি. আর. গ্রোভার মনে করছেন যে, বাংলাতেও ঐ একই কাঠামো ছিল। কিন্তু তপন রায়চৌধুরীর এ-সম্পর্কে দ্বিধা আছে কারণ ১৫৭৫ থেকে ১৬২৭-এর মধ্যে কতবার ঐ কাঠামোর থেকে বাংলার প্রথা দূরে সরে যাচ্ছে তার বিস্তৃত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। তিনি *আইন-এ আকবরী*-র বর্ণাকে আদর্শ বলে ধরেছেন যেটা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। তাঁর মতে, রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলেই ঐ কাঠামো থেকে এই ব্যবস্থা দূরে সরে এসেছে।

মুঘল পাঠান যুদ্ধের ফলে রাঢ় ও বারেন্দ্রভূমি থেকে লোকেরা পশ্চিমে বীরভূম ও পূর্ব বাংলায় চলে যেতে থাকে। ফলে পূর্ব বাংলায় নতুন পত্তনি শুরু হয় যার ফলে স্থানীয় জমিদাররা পরাক্রান্ত হয়ে উঠে। ষোলো শতকের শেষে ও সতের শতকের প্রারম্ভে এরাই বার-ভূঁইয়ার প্রবাদ পুরুষে পরিণত হয়। ইসলাম খান এদেরকে সতের শতকের গোড়াতে পরাজিত করতে সমর্থ হন যার বর্ণনা আমরা সমকালীন *বাহারিস্তান-ই খায়েবী* থেকে পাই।

মুঘলরা যে *জাবতি* প্রথা শুরু করেছিল তার প্রমাণ আমরা কবি মুকুন্দরামের লেখা থেকে পাই। বলা যেতে পারে যে, ১৪৮৬ সাল থেকে এই প্রথার প্রতিষ্ঠা শুরু হয়, যার মূলে রয়েছিল জমি জরিপ করা। এটা একটা নতুন চেষ্টা, কারণ এর আগে ছিল হাল পিছু খাজনা। মুকুন্দরামের কল্পিত শহরে তিনি 'হাল পিছু এক তঙ্কা' খাজনা নেবেন বলেছেন। এটাই প্রাক-মুঘল যুগে যাওয়ার স্বপ্ন। ঐ সময়ে যে জরিপ ছিল না, আবুল ফজলের লেখায় তার সমর্থন মেলে। তিনি বাংলার ২৪ পরগণার ৪৮৭ মহলের কোনো জমির মাপ দেন নি। সুতরাং জমি জরিপ করাটা বাংলায় নতুন এবং স্বাভাবিক নয়, যদিও মুঘল কাঠামোয় এটা একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

গ্রোভার এই ধরণের জমিদারদের *ঘাইর-আমলি* জমিদার বলছেন, যার ফলে তিনি ওদের মুঘল কাঠামোর মধ্যে ধরেছেন, *ঘাইর-আমলি* জমিদাররা প্রধানত পেশকাসী জমিদার। কিন্তু ঐ সময়ে এটিও সঠিক নয়। এই সব জমিদাররা আধিকাংশ সময়ই স্বাধীন ছিলেন। শুধু কোনো রাজপ্রতিনিধি এলে পেশকাস দিতেন। জমিদারী প্রথা বাংলায় নিত্য নতুন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল যার ফলে মুঘল কাঠামোর মধ্যে এদের ফেলা শক্ত। গ্রোভার অবশ্য এই অবস্থার কথা স্বীকার করেছেন এবং তাঁর নিজের মতামতের বিরুদ্ধে গিয়েছেন।

১৬০৮ সালের পর বাংলার জমিদারির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় যার বর্ণাা আমরা *বাহারিস্তানে* পাই। প্রথমত, যে-সব জমিদাররা যুদ্ধ করে নি তাদের জমি ও অন্যান্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হলো। সাধারণভাবে বলা যায় যে, তাদেরকে মনসব্দার করে নেওয়া হলো। দ্বিতীয়ত, যারা যুদ্ধ করেছিল এবং পরাজিত হয়েছে তাদের

জমিদারির এক অংশ বেঁচে থাকার জন্য দেওয়া হলো ও বাকি অংশ নিয়ে অন্য মনসব্দারদের *তন্‌খোয়া জায়গীর* হিসাবে দেওয়া হলো। পুরোনো জমিদার তার মূল জমিদারি পেলেন কিন্তু এখন দরবারে জামিন পাঠাতে হলো। তৃতীয়ত, যে-সব জমিদাররা মুঘলদের সাহায্য করেছিল তাদের নেওয়া হলো মুঘল শাসনযন্ত্রের মধ্যে। তারা নগদ টাকায় বা খাজনায় পেশকাস দিতে থাকল। অবশ্য সেটা তাদের ওয়াতন জায়গীরের ওপর নয়।

তপন রায়চৌধুরী সিলেট ও যশোহরকে একই ধরণের বলেছেন। কিন্তু সিলেটের ব্যাপার আলাদা। বায়াজিদ কারবাণী বশ্যতা স্বীকার করলে সিলেটকে সম্পূর্ণভাবে অধিগ্রহণ করা হয় এবং মোবারক খান নামে একজন মুঘল আমলার অধীনে রাখা হয়। এর সঙ্গে কাছাড়, ত্রিপুরা বা খুলনার কোনো মিল নেই। ওখানে মুঘল থানা বসানো হয় এবং জমিদারদের পুরোনো *ওয়াতন জায়গীর* ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সুতরাং বাংলায় আমরা দু-ধরণের জমিদারি দেখি ; এক, যারা কেবল তাদের ওয়াতন জায়গীর ফেরৎ পেল। এদেরকে বলা হতো *আমলি* জমিদার। এরা মুঘল শাসনের খাজনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকত। বাকলা ও যশোহরের জমিদারি এই ধরণের। যশোহরের খাজনার জমা তৈরি করেন খাজা মহম্মদ তাহির, যেখানে চৌধুরী ও কানুনগো সই করে। দুই, যারা তাদের জমিদারির সবটাই ফেরৎ পেল। এদেরকে *ঘাইর-আমলি* জমিদার বলে।

আমলি জমিদারদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ছিল। বিনা আদেশে, এরা ধর্মীয় দানও করতে পারত না। কেবল মাত্র 'জমিদারণ-ই উমদারে'র এই ক্ষমতা ছিল, এছাড়া আমলি জমিদারদের জমির জমা ঠিক করত মুঘল আমলারা। সুতরাং কেন্দ্রীয় শাসন চেষ্টা করত *ঘাইর আমলি*কে *আমলি*তে পরিণত করার।

আওরংজেবের সময় থেকেই মুঘল বাংলার খাজনা সংগ্রহের ওপর জোর দেওয়া শুরু হয়েছিল। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সবা সামিউদ্দিন দেখিয়েছেন যে, ১৫৯৫ সাল থেকে ১৬৪৮ সালের মধ্যে বাংলার খাজনার ২৫ কোটি *দাম* থেকে বেড়ে ৫০ কোটি *দাম* হয়ে যায়। ঐ একই সময়ে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের খাজনার জমা বাড়ে শতকরা পঞ্চাশভাগ। কিন্তু ইরফান হবিব বলছেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যের খাজনা বাড়লেও উত্তর ভারতে দাম বেড়ে যাবার ফলে ঐ অনুপাতে লাভ হয় নি। বাংলায় অবশ্য খাজনা বাড়লেও উত্তর ভারতের তুলনায় দাম বাড়ে নি ; ফলে এখানে খাজনা বাড়ায় শাসনযন্ত্রের লাভ হয়েছিল। বলা দরকার যে, সমগ্র সাম্রাজ্যের খাজনার মাত্র শতকরা পাঁচভাগ ছিল বাংলার। সুতরাং যদুনাথ সরকারের বক্তব্য, বাংলার পাঠানো খাজনা মুঘল শাসনযন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছিল একথা মান্না যায় না। অবশ্য, কোনো বিশেষ সঙ্কটের সময়ে যেমন ১৬০৪ সালে, বাংলার নগদ খাজনা বিশেষ কাজে এসেছিল।

আওরংজেবের সময়ে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথার মধ্যে অনেকখানি চলে এসেছিল। শিহাবুদ্দিন তালিশের লেখা থেকে দেখা যায় যে, জায়গীর জমিতে জরিপ

হচ্ছে যেটা খালসা ও *আইমা* (নিষ্কর) জমিতেও চালু হয়েছে। ক্রমশ জায়গীর জমি কমিয়ে খালসা জমি বাড়ানো হচ্ছে। সতের শতকের লেখা ফরাসিদের চিঠি থেকে জানা যায় যে, মনসব্দারদের উড়িষ্যায় বদলি করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলি খাঁন এই নীতিই সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করেন। মুর্শিদকুলি জরিপ জোরদার করেন এবং খাজনা বিভাগে আমলা নিযুক্ত করেন যারা জমা ও *মাল-ওয়া-সইর* (বিভিন্ন কর) তালিকা তৈরি করেন। এ-ছাড়া জমিদারদের নানা ধরণের কর নেওয়ার অধিকার খর্ব করেন এবং তাদের *নানকর* ঠিক করে দেন। কৃষকদের *তাকাভি* ঋণও দেন। শাসনের সুবিধার জন্য *চাকলা* ও *সরকারে* সুবন্দোবস্ত করেন। এছাড়া ছয়টি বড় জমিদারি তৈরি করেন ছোটো ছোটো জমিদারির বিনিময়ে। বাংলার খাজনার শতকরা পঞ্চাশভাগই এই ছয়টা জমিদারি থেকে আসত। জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব হয়ে যায় এবং সময়মতো খাজনা দিতে না পারলে তাদের অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। *মাল জমিনি* বা ইজারার উল্লেখ সতের শতকের শেষদিকে পাওয়া যায়। মুর্শিদকুলি খানের সময়ে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মুর্শিদকুলি মুঘল সাম্রাজ্যের নীতি আরো জোরদারভাবে বাংলায় এনেছিলেন। যেখানে জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে ছোটো ছোটো জমিদারি বিলুপ্ত করে, বড় জমিদারি কেন্দ্রীভূত করেছিলেন যেটা গোঁড়া মুঘল নীতির বিরোধী। খাজনার নিয়মাবলী কঠোর হাতে মেনে চলবার ফলে চাপটা শেষ পর্যন্ত চাষিদের ও ছোটো জমিদারদের ওপর পড়ে। এই চাপের জন্য শিহাবুদ্দিন তালিশ দুঃখ করে লিখেছেন যে, এমন একজায়গায় যেতে চান যেখানে সময় তাঁকে ধরতে পারবে না। ইওরোপীয় বণিকদের চিঠিপত্রে দেখা যায় যে, ১৭০৫-এর আগে মুর্শিদকুলি প্রধানত দেশী ও বিদেশী বণিকদের ওপর চাপ দিচ্ছেন টাকার জন্য। পরবর্তীকালে এই চাপ পড়ে ভূমি-রাজস্বের মাধ্যমে জমিদারদের ওপর। সুতরাং বাংলার কাঠামো মুঘল সাম্রাজ্যের কাঠামোর মতো হলেও ঠিক একরকম নয়— ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন কাঠামো তৈরি হয়েছে।

তালুকদার

তালুক অর্থে বোঝায় সংযোগ কিন্তু এখানে বোঝা যাচ্ছে জমিদারের মতো জমি। আঠের শতকের ফারসি পুঁথিতে দেখা যায় তালুকদাররা বাংলায় মধ্যবর্তী জমিদারের মতো। আবুল ফজল কয়েকটি মহলকে তালুক বলেছেন কিন্তু সেগুলি মানুষের সঙ্গে যুক্ত এলাকার সঙ্গে এক নয়। বাংলা ও উড়িষ্যা ছাড়া *আইন-ই আকবরীতে* তালুকদারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এটা খুব পরিষ্কার নয় যে, আবুল ফজল জমিদার ও ভূঁইয়ার সঙ্গে তালুকদারকে সমার্থক করেছেন কিনা। কিন্তু উড়িষ্যার কয়েকটি তালুকদারকে স্বাধীন বলেছেন।

মুঘলরা তালুকদার ও জমিদারের মধ্যে একটা তফাৎ রেখেছে। মুঘলদের কাছে তালুকদারের মর্যাদা ও জমির পরিমাণ জমিদারের থেকে কম। শিহাবুদ্দিন তালিশ

আরাকান ও বাংলায় প্রথমে রাজা ও পরে জমিদার ও তালুকদারের কথা বলেছেন। বি. আর. গ্রোভারের মতে, জমিদারের থেকে তালুকদাররা সংখ্যায় বেশি ছিল। যদিও তার স্বপক্ষে বিশেষ প্রমাণ তিনি দাখিল করেন নি।

মালগুজারী জমিদারের অধিকার রাজকীয় সনদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তালুকদার ঐ জমিদারের সমগোত্রীয় হতে পারে যখন সে সরাসরি মুঘল রাষ্ট্রকে খাজনা দেয়, তখন তাকে বলা হয় *হুজুরি*। সাধারণত তালুকদাররা জমিদার / চৌধুরীর মাধ্যমে খাজনা দেয়। সে-অবস্থায় তাকে বলে *মুস্কুরী*। যে জমিদারের মাধ্যমে ঐ খাজনা দেওয়া হয়, ঐ জমিদার তার নিজের জমিদারির খাজনা ও তালুকদারের খাজনা এক সঙ্গে দেয়। বাংলায় ঐ ধরণের জমিদার তার তালুকদারের কাছ থেকে খাজনা সংগ্রহ করার অধিকার বিক্রি করতে পারে। ঐ অধিকারকে বলা হয় *পত্থ তালুক* বা চৌধুরী অধিকার। ঐ বিক্রিতে দেবোত্তর সম্পত্তির কোনো পরিবর্তন হয় না।

সাধারণত তালুকদার তার অধিকার বিক্রি করতে পারে। এর কিছু ব্যতিক্রম থাকলে সেটা তালুকদারী পাট্টায় লেখা থাকে। তালুকদার তার কৃষকদের চাষযোগ্য জমির মালিক নয়। কিন্তু যে সমস্ত গ্রামে ঐ তালুকদার পত্তনি বসিয়েছে এবং তার চেষ্টায় ঐ গ্রামকে কৃষিযোগ্য করে তুলেছে, সেখানকার কৃষি জমির ওপর তার অধিকার আছে। ওখানে তার মালিকানার অধিকার অন্য যে কোনো জমিদারের মতো— জমিদারির ওপর জমিদারের যে ধরণের অধিকার আছে সেই রকম। কিন্তু একই রকম অধিকার থাকলেও, ঐ তালুকদার জমিদারের মতো *নানকর* বা অন্যান্য *মাফি জায়গীর* এর সুবিধা ভোগ করত না যদিও তার অধিকার আছে *মালিকানা* ও *রসুম*-এর ওপর। সে মালিকানা দাবি করতে পারে তখনই যখন ঐ জমি *সির-ই হাসিল* হচ্ছে অর্থাৎ রাষ্ট্র তালুকদারকে সরিয়ে খাজনা সংগ্রহ করছে রাষ্ট্রীয় আমলাকে দিয়ে।

অধিকাংশ তালুকদারীই শুরু হয়েছিল কোনো জমিদার বা তালুকদারের কাছ থেকে স্বত্ব কেনার পর। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। কোম্পানি সুবা বাংলা, হুগলি চাকলা, আমিনাবাদ পরগণার তিনটি গ্রাম কলিকাতা, সূতানটি ও গোবিন্দপুর— কিনে নেয়। পরোয়ানা-য় মনোহর দত্ত ইত্যাদিদের বিক্রেতা ও কোম্পানিকে ক্রেতা হিসাবে বলা হচ্ছে। ক্রেতা এখানে তালুকদার। পরবর্তীকালে ১৮ জানুয়ারি ১৭১৭ সালে সম্রাট ফারুক শিয়ার কোম্পানিকে আরো ৩৮টি নতুন গ্রাম কেনার অনুমতি দেন দেওয়ান-ই সুবার অনুমোদন সাপেক্ষে। স্পষ্টভাবে বিক্রির ফরমানে কোম্পানিকে তালুকদার বলা হয়েছে এবং তালুকদারী অধিকারও দেওয়া হয়েছে। যেহেতু কোম্পানি সরাসরি খাজনা দিচ্ছে রাষ্ট্রকে সেহেতু কোম্পানি *হুজুরী* তালুকদারের অধিকার পাচ্ছে যা জমিদারি অধিকারের সমান। ১৭৫৭ সালে ২৪ পরগণা পাবার পর কোম্পানি জমিদারের অধিকার সরকারিভাবে পায়। ১৭৬০ সালে মীর কাশিম কোম্পানিকে চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর দিলে কোম্পানি বড় জমিদারে বা *জমিদারণ-ই উমদায়* পরিণত হয়। এই ধরণের উত্থান অন্য জায়গায় অন্য জমিদারের ক্ষেত্রে আঠের শতকে দেখা যায়।

এই ধরণের কেনাবেচা আঠের শতকে নিয়মিত হতো। মুঘল পরিভাষায়, যদি কোনো লোক রাষ্ট্র থেকে জমিদার বলে অধিকার পাচ্ছে না কিন্তু অন্য কোনো জমিদারের কাছ থেকে সেই একই অধিকার পায়, তাকেই তালুকদার বলা চলে। বড় ধরণের কেনা-বেচা হলে সরকারি অনুমোদন চাওয়া হতো এবং সেই অনুমোদন দেওয়াও হতো। ঐ ধরণের তালুকদার জমিদার বলে পরিগণিত হবে তখনই যখন সে রাষ্ট্রকে সরাসরি খাজনা দিচ্ছে এবং রাষ্ট্র জমিদারি সনদ দিচ্ছে। কয়েকটি গ্রামের একজন তালুকদারকে ঐ ধরণের সনদ ছাড়া জমিদার বলা যাবে না, সুকুমার ভট্টাচার্য কোম্পানিকে প্রথম থেকেই জমিদার বলছেন, এ মত গ্রাহ্য করা যায় না। এমন কি ইরফান হবিবও জমিদার ও তালুকদারকে এক করে দেখিয়েছেন– এটাও গ্রহণ করা যায় না।

বাংলায় তালুকদারের থেকে জমিদারের অবস্থা অনেক উচুঁতে। কিন্তু উত্তর ভারতে জমিদার তালুকদারের নিচে। নিজেদের জমি ছাড়া তাদের অন্য কোনো জমির ওপর অধিকার নেই। আঠের শতকের শেষ দিকে মূল ঝোঁক এসে যায় জমির অধিকারীদের স্তর ভেদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে। ঐ অবস্থায় বাংলার কাঠামো অন্যান্য জায়গার তুলনায় যে অন্যরকম হয়েছিল, তার তারতম্য অনেকটা চলে যায়। সুতরাং আমরা ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ডের মতামত কিছুটা বদলাতে পারি এবং চার্লস গ্রান্টের মতামতের কাছাকাছি আসতে পারি।

গ্রামীণ সম্প্রদায়

সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার লিখেছেন যে, ভারতীয় কৃষক ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমিক নানান নির্যাতনের মধ্যে দিন কাটাতেন যার ফলে তাদের মধ্যেকার শ্রেণীবিন্যাস অনেকখানি লুপ্ত হয়ে গেছে। ইরফান হবিবও এই সত্যতা অস্বীকার করেন নি কিন্তু দেখাচ্ছেন যে, ছবিটা আরো অনেক জটিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, চাষিদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল যথেষ্ট। যেমন, যারা বড় কৃষক ছিল তারা কাজের লোক নিযুক্ত করত এবং প্রধানত বাজারীপণ্য উৎপাদন করে প্রচুর লাভ করত। যারা ছোটো কৃষক ছিল তারা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করত এবং কোনো রকমে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করত। এছাড়াও গ্রামে জাতপাতের বিভেদ ছিল এবং কিছু ছোটো জাত ছিল যারা কোনো রকমে পরের জমিতে কাজ করে দিন গুজরান করত। প্রথমযুগের বৈষ্ণব কবিতায় এই ধরণের ছোটো জাতের কথা পাওয়া যায় যারা গ্রামের একধারে ছোটো ঘর বেঁধে আছে এবং খড় বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছে। মুকুন্দরামের রচনায় এ-ধরণের লোক ছাড়াও অস্পৃশ্যদের কথাও আছে যারা শহরের বাইরে থাকে এবং এদের মধ্যে ডোম উল্লেখযোগ্য। শহরের ব্রাহ্মণরা এদের কি নজরে দেখছে তার বর্ণনা বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে আছে যেগুলিকে অতিশয়োক্তি বলে ধরা ঠিক হবে না।

বেশি জমি সাধারণত গ্রামের মোড়ল (*মুকদ্দম* বা *পটেল*) রাখতেন। ঐ শ্রেণীর

মধ্যে গ্রামের কর্তাদের জমিও ছিল। সাধারণ কৃষক— যাদের *রেজারিয়া* বলা হচ্ছে তাদের ছোটো ছোটো জমি ছিল। গ্রামের মোড়ল তার কাজের জন্য নিষ্কর জমি পেত প্রায় শতকরা আড়াই ভাগ মতো। কর্তারা সাধারণ-কৃষকদের তুলনায় কম হারে খাজনা দিত। এর থেকেই বোঝা যায় যে, ভূমি-রাজস্বের হার প্রধানত পশ্চাৎমুখী, যার বোঝা বেশি হারে ছোটো কৃষকদের ওপর পড়ত।

কেউ কেউ গ্রামীণ পঞ্চায়েত বা গ্রামীণ সংস্থাকে প্রাচীন গণতান্ত্রিক সংস্থা বলে মনে করেছেন, যেটা টাকার অর্থনীতির আগমনের ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইরফান হবিব বিভিন্ন লেখায় এই মতের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ ঐতিহাসিকরা গ্রামীণ সংস্থাকে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিল বলেছেন। সরকার সবসময়ই পুরো গ্রামকে একটি একক বলে ধরতে চাইত যাতে সহজে খাজনা সংগ্রহ করা যায়। এর ফলে তারা মোড়ল বা বড় চাষিদের ওপর নির্ভর করেছে। বড় চাষিরা অন্যান্য চাষিদের ওপর কর নির্ধারণ করে সেগুলি সংগ্রহ করে দিতেন। সমগ্র গ্রাম এই অর্থে একক হিসাবে কাজ করছে এবং ঐ রাজস্ব থেকে গ্রামের সার্বজনীন খরচ চালানো হতো। এমন কি গ্রাম টাকা ধার দিচ্ছে কোনো কোনো চাষিকে এরকম প্রমাণও আছে। গ্রামীণ সংস্থা ঐ ঋণ শোধ করছে সার্বজনীন টাকা থেকে। প্রতিটি ব্যক্তি ঐ কাজে অংশগ্রহণ করছে এবং চাঁদা বা কর দিচ্ছে।

বলা বাহুল্য, যারা এই কাজে অগ্রণী হয়েছে তারা নিজেরা হয় কর দিচ্ছে না, নতুবা কম হারে দিচ্ছে। সাধারণত উত্তর ভারতের *খুদকস্থ* বা মহারাষ্ট্রের *মিরাসদার*-রা এই সুযোগ পেন। মুঘল দলিলে বড় চাষিদের এই ভূমিকার নিন্দা করা হয়েছে কিন্তু যেহেতু খাজনা সংগ্রহ করা এই ব্যবস্থায় সহজ সেহেতু মুঘল সরকার এ-ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল।

গ্রামীণ সংস্থার মধ্যে নানারকম দ্বন্দ্ব কাজ করছিল। কবীর ও অন্যান্যদের কবিতায় এর ছবি পাওয়া যায়। প্রায় সব জায়গাতেই খাজনাই দ্বন্দ্বের মূল কারণ গ্রামীণ। সংস্থা অর্থনৈতিক বৈষম্য মেনে নিয়েছিল যার ফলে শোষণের ধারার বিরুদ্ধে তারা যায় নি। এর ফলে মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার শোষণমূলক ধারা গ্রামীণ ব্যবস্থার মধ্যেও প্রতিফলিত হতে দেখি।

৪

অ-কৃষি উৎপাদন ও কারিগরি ব্যবস্থা

মুঘল ভারতের কুটির শিল্পের উৎপাদন সম্বন্ধে বিভিন্ন মত চালু আছে। কারোর মতে, মুঘল ভারতে সমকালীন পৃথিবীর মধ্যে শিল্পোৎপাদন সবথেকে ভালো ছিল যার ফলে অঢেল বিদেশী মুদ্রা পৃথিবীর সব জায়গা থেকে মুঘল ভারতে আসত। বার্নিয়ার বলেছেন, সোনা এবং রূপা একবার ভারতে ঢুকলে তা আর বেরোয় না। এই ধরণের শিল্প উৎপাদনের ফলে অন্যান্য দ্রব্য আমদানির বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। মুঘল ভারত তখন স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বনির্ভর বলে ধরা হতো। প্রধানত বৈদেশিক রপ্তানি ব্যবস্থা এই অবস্থার সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল। ইওরোপের শিল্পবিপ্লব হওয়ার পর কৃৎকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তন হয় কিন্তু এই নতুন কৃৎকৌশল গ্রহণ না করার ফলে মুঘল ভারত ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে।

অনেকেই এই মতের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, মুঘল ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত অতি মূল্যবান বা অতি সাধারণ সামগ্রী দিয়ে ভরা। যেহেতু যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল সেহেতু সমগ্র উৎপাদনের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্য খুবই কম। প্রযুক্তিবিদ্যা অত্যন্ত পুরাতন বা কোনো কোনো জায়গায় একেবারেই নেই। সুতরাং 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা' বলতে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা আসলে বিনিময় প্রথার দুর্বলতা, যার ফলে উৎপাদন বাড়তে পারছে না। জাতপাতের বাধানিষেধ এবং শাসনতন্ত্রের শোষণের ফলে অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ চলাচল খুবই সীমিত। সামগ্রিক অর্থনীতি বিচার করলে কাজকর্মের মান অন্তত পুনরুজ্জীবিত ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রসর ইওরোপের তুলনায় খুব নিচু।

এর মধ্যে কোন্ মতটি প্রমাণগ্রাহ্য সেটা বলা শক্ত। বৈদেশিক বাণিজ্যের খবর কেবল ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির বাণিজ্যের দলিল থেকে আহরণ করা যেতে পারে। কিন্তু কি পরিমাণ লোক কাজ করছিল, উৎপাদন কিরকম হতো বা লগ্নি কত ছিল— এ-সব পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যান্য সূত্র থেকে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে মাত্র।

শিল্পদ্রব্যের চাহিদা মুঘল যুগে বাড়ছিল এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা জানি যে, জনসংখ্যা খুব ধীরে ধীরে বাড়ছিল এবং দু'শ বছরে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়েছিল। একদিকে যেমন গরীব কৃষকদের পাই, তেমনি গ্রামাঞ্চলে বর্ধিষ্ণু লোকদেরও পাওয়া যায়। বর্ধিত উৎপাদন ও নগদ টাকায় খাজনা নেওয়ার জন্য গ্রামীণ অর্থনীতি বদলে যেতে থাকে। নিজামুদ্দিন তার *তবাৎ-ই আকবরী*-তে যে ৩২০০ কসবা বা বাজার শহরের কথা বলেছেন (বাংলার *গঞ্জে*-র সঙ্গে তুলনীয়) সেগুলি প্রায়

সবই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এর থেকে গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের চাহিদারও কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে, জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ গরীব অবস্থার মধ্যে ছিল। ঐ-সময়ে মুঘল ভারতে ঐ ধরণের কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রায় সব ইওরোপীয় পর্যটকই স্বীকার করেছেন, মুঘল জনসাধারণের অবস্থা ছিল অতি গরীব। একটা কারণ অবশ্য এই যে, আসবাবপত্র বা তৈজসপত্র ব্যবহারের অভ্যাস সীমিত হওয়ার ফলে, ইওরোপীয়দের কাছে হয়ত এরা খুবই গরীব বলে প্রতিভাত হয়েছে। কারণ আপামর জনসাধারণ যে গরীব ছিল, এটা ভাবা বোধ হয় একটু ভুল হবে। বাংলার অবস্থা যে খুব খারাপ ছিল এটা মুকুন্দরামের রচনা থেকে মনে হয় না। লবণের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যে ভালো ছিল, একথা স্বীকার করতে হবে। আগ্রা থেকে বাংলায় দশ হাজার টন লবণ বছরে পাঠানো হতো। অস্ত্রশস্ত্রের চাহিদা খুব বেশি থাকাই স্বাভাবিক। গয়নার চাহিদা কেবল উচ্চবিত্তর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এটা মনে করার কারণ নেই। একথা বার্নিয়ার নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। যাদের মূল্যবান ধাতুর গয়না কেনার সাধ্য ছিল না তারা অন্য ধাতুর গয়না পরত। পূর্ববঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বিদেশীরা দেখেছেন যে, ছোটো ছোটো শহরেও মেয়েরা রুপো ও হাতির দাঁতের মিশ্রিত গয়না পরছে।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লবণের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া চিনিও এই ধরণের বাণিজ্যের মধ্যে পড়ে। উত্তর ভারতের শহরে গরীবরা প্রতিদিনই ঘি খেত। ঐ সব শহরে নানা ধরণের মিষ্টি ও রান্না করা খাবার বিক্রি হতো। আগ্রা ও লাহোরের এই সমস্ত বিশাল বাজারের কথা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পর্যটক পাদ্রী মানরিক বলেছেন। ওঁর বর্ণনা থেকে মনে হয়, সাধারণ গরীবরা নানা ধরণের সুস্বাদু নিরামিশাষী রান্না খেত। মাদক দ্রব্যের মধ্যে 'চাল' থেকে করা *আরাক* বা 'গুড়' কি 'মহুয়া'-র থেকে তৈরি মাদক পাওয়া যেত।

কাপড়ের ক্ষেত্রেও এটা বলা যায় যে, শহরের গরীবদেরও বিরাট চাহিদা ছিল। সৈন্যরা এবং বড়লোকদের অনুগত লোকেরা সর্বসমক্ষে খুব ভালো পোশাকে আসত। মুঘল যুগের চিত্রকলায়, শহরের কারিগরদের সাধারণ পোশাকে দেখা যাচ্ছে যেগুলো দর্জির তৈরি। তাদের মাথায় পাগড়ি এবং পায়ে জুতো আছে। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে, শহরে তৈরি পোশাকের চাহিদা বেশ ভালো ছিল। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীবৈষম্যের ফলে কিছু উচ্চবিত্ত লোক ছিল, যার ফলে গ্রামাঞ্চলের চাহিদাও খুব-কম ছিল বলে মনে হয় না। কেবল বলা যায় যে, পাকা বাড়ি তৈরি করার চাহিদা বা তৈজসপত্রর চাহিদা গ্রামাঞ্চলে বেশি কিছু ছিল না। অধিকাংশ লোকই কুঁড়েঘরে বা মাটির ঘরে বাস করত, যেখানে আবার মাটির তৈজসপত্রই প্রধান।

ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড বার্নিয়ারের মন্তব্য মেনে নিয়ে বলেছিলেন যে, মুঘল ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে এই ধারণা সত্য নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ধরা যেতে পারে সাধারণ নিচুস্তরের আমলা, নিষ্কর

জমির স্বত্ব ভোগকারী এবং পেশাদারী লোকদের। এদের নানা জিনিসের চাহিদা ছিল, যার ফলে মুঘল ভারতের শিল্প-উৎপাদন অব্যাহত ছিল। বিদেশী পর্যটক পেলসার্টের বা বণিক বানারসীপ্রসাদ জৈন অথবা আবদুর রহিম খান ই খানান-এর লেখা থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন জাত বিভিন্ন রকমের কাজ করত। এদের উৎপাদনই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা মেটাত। এর মধ্যে আমরা পাই তাঁতি, দর্জি, নাপিত, ছুতোর, তিলি, হালুইকর, কাহার, রাজমিস্ত্রি, স্বর্ণকার, চিত্রকর, ধাতুশিল্প-কারিগর, কাগজ তৈরির কারিগর, কার্পেট তৈরির কারিগর ইত্যাদি। মুকুন্দরামের নানা রচনায়ও এই ধরণের লোকদের শহরের উপকণ্ঠে থাকার কথা পাওয়া যায়। বণিকদের সহজেই উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায় কিন্তু হিন্দু-বণিকদের জীবনযাত্রার মধ্যে ভোগের ছাপ কম। বিদেশী পর্যটকরা কেউই তাদের বিলাসিতার কথা বলেন নি যদিও কেউ কেউ তাদের বাড়িতে স্তূপীকৃত মুদ্রা দেখেছেন। *বাহারিস্তান* থেকে জানতে পারা যায় যে, বাংলার সুবাদার মির্জা নাযান ঢাকার পাইকারদের কাছ থেকে এক রাতে এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করেছিলেন। কোনো কোনো পর্যটক, যেমন ফ্রায়ার, হিন্দু ও মুসলমান বণিকের মধ্যে জীবনযাত্রার তারতম্য খুঁজে পেয়েছেন। মুসলমান বণিকেরা বিলাসব্যসনে আমীর ওমরাহদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করতেন। হিন্দু বণিকরা সে-তুলনায় অনেক সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। এর থেকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক হিন্দু বণিকদের ওপর মুসলমান সরকারের অত্যাচারের কথা বলছেন, যদিও তার প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। ১৬০০-র আগে সুরাট শহরের বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায় যে, হিন্দু ও জৈন বণিকরা অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতেন। তাঁদের বড় বড় বাড়ি ছিল শহরে আর শহরের বাইরে থাকত বাগানবাড়ি যেখানে তারা সপ্তাহান্তে সময় কাটাতেন। ১৬০০-র পর থেকে এ অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে। সুতরাং এটা শুধু সামান্ততান্ত্রিক অত্যাচার নয় বরং এর মধ্যে আরো গভীর সামাজিক কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। আরো একটা কথা হয়ত বলা যায় যে, মুঘল সরকার সুলতানী সরকারের মতোই, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, অষ্ঠাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত বণিকের জগৎ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে নি।

সুরাট বা অনান্য শহরের বাড়িঘরের বর্ণনা থেকে মনে হয়, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তর কাছে বাড়ি তৈরি করার চাহিদা বেশ বেশি মাত্রায় ছিল। লাহোর, খাম্বাজ বা সুরাটে বড় বড় বণিক সম্প্রদায় ছিল যাদের বহুতল বাড়ি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর সুরাটের একটি ওলন্দাজ ছবি থেকে এই রকম বহুতল বাড়ির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সব বাড়িগুলি খুব দামি— ইট, চুন ও দামানের কাঠ দিয়ে তৈরি এবং ওপরের তলাগুলিতে টিক কাঠের ওপর কাজ করা— এনামেল ও লাক্ষা দিয়ে। জানালায় কাচ বা কচ্ছপের বা কুমীরের শেল (**shell**) রয়েছে রোদ আটকাবার জন্য। দিল্লীর নিচু স্তরের আমলারাও চলনসই বাড়িতে থাকতেন— উচ্চবিত্তদের জন্য ছিল ইট ও পাথরের প্রাসাদ। বাংলায় ছিল সাধারণত বাঁশের বাড়ি। আবুল ফজল বলেছেন যে, এ-রকম বড় একটা বাড়ির দাম প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মতো। কাশ্মীরে কাঠের বাড়িই বেশী তৈরি হতো।

এসব বাড়িতে কাঁথা, মাদুর, কার্পেট ও রেশমের ঢাকনা দেওয়া বালিশ থাকত। খাটের পায়া অবশ্য অনেকসময় ধাতুতে মোড়া ছিল। ধাতুর তৈজসপত্র ছিল বড়লোকদের বাড়িতে। বাংলায় মুসলমানদের ঘরে ইওরোপীয়দের জন্য টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ ইত্যাদি ছিল। যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য প্রধানত পাল্‌কি ব্যবহার করা হতো। গরুর গাড়ি ছিল সর্বসাধারণের জন্য। সুরাটে ইওরোপীয় বণিকরা গরুর গাড়ি চড়তেন এরকম নিদর্শনও আছে। সেগুলি সাধারণত রেশম বা অন্যান্য মূল্যবান কাপড়ে ঢাকা থাকত। পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে প্রধান ছিল বস্ত্রের মান কারণ বৈচিত্র্য তখনো খুব বেশি সমাদর পায় নি। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি পর্যটক থেভনো লিখছেন যে, আগ্রার হিন্দু ব্যবসায়ীরা কাশ্মীরের শাল ও পায়ে রেশমের জরি করা জুতো পরতেন। পুরুষদের কাপড়ের মধ্যে দর্জির তৈরি রেশম ও ব্রোকেডের পোশাক ছিল প্রধান, যদিও এ-সব বলা হচ্ছে মুসলমানদের সম্বন্ধে। মনে হয়, উচ্চপদস্থ হিন্দুরাও এ-ধরণের পোশাকই পরতেন– অন্তত মুঘল চিত্রকলা সেই রকমই আভাস দেয়। মহিলা ও পুরুষ উভয়েই সোনার গহনা ও অলঙ্কার ব্যবহার করতেন।

আমরা আগে দেখেছি যে, কিছু সংখ্যক লোক রাজস্ব বেশি মাত্রায় ভোগ করছে। ১৬৪৭ সালে ৪৪৫ জন মনসব্‌দার রাজস্বের শতকরা ৬১ ভাগ পেতেন যার এক-চতুর্থাংশ তাদের ব্যক্তিগত আয় বলে ধরা যেতে পারে। বর্তমান কালের মূল্যমান হিসেবে বলা যায়, আকবরের সময়ের একহাজারী মনসব্‌দারদের মাসিক মাহিনা বর্তমান কালের প্রায় পনের হাজার টাকার সমান। এটি তার ব্যক্তিগত আয় বলে ধরা যেতে পারে। মোরল্যাণ্ডের মত অনুযায়ী, এর বেশিরভাগই লুকিয়ে রাখা হতো। যদিও অধিকাংশ অর্থই যেত বিলাস ব্যসনে ও অনুগতদের পেছনে। ওমরাহদের জীবনযাত্রায় বিলাস দ্রব্য যে অপরিহার্য ছিল, এটি প্রায় সব পর্যবেক্ষকই বলেছেন। এর মধ্যে খুব অল্প একটা অংশ ছিল বিদেশ থেকে আনা। এসব সত্ত্বেও পর্যটকরা, বিশেষত বার্নিয়ার বলছেন যে, ওমরাহ-রা জোর করে কারিগরদের দিয়ে কাজ করাতেন। প্রত্যেক ওমরাহ-র ঘরে চাবুক ঝোলানো থাকত যার সাহায্যে এ-সব কাজ করানো হতো। কিন্তু এটা আমরা বুঝতে পারি না যে, কেন প্রায় অখ্যাত শহরগুলিতে এত রকমের দ্রব্য বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এমনকি লাহোর, আগ্রা বা দিল্লির মতো শহরেও বিশাল বাজারে বিভিন্ন ধরণের দ্রব্য বিনা বাধায় কেনা ও বেচা হচ্ছে। আগ্রা থেকে ফতেপুর সিক্রী একটা বিরাট বাজারে পরিণত হয়েছিল। এমনকি, মুঘল সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত বাজার পর্যন্ত ছিল। এ-সব তথ্য ধরলে বার্নিয়ারের মতামত গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

এই সব ওমরাহ-ই মুঘল দরবারের আচার, রীতি ও ভোগবিলাসের অনুকরণ করার চেষ্টা করতেন। বার্নিয়ার মুঘল হারেমে সূক্ষ্ম সোনার কাপড়, ব্রোকেড, রেশম, জরি, মুক্তো, সুন্দর গন্ধ ইত্যাদির ছড়াছড়ি ছিল বলেছেন। আর একজন পর্যটক ওমরাহদের ঐশ্বর্যের বর্ণনা করার ভাষা পান নি। প্রাসাদোপম বাড়ি চমৎকারভাবে সাজানো, সুন্দর কাপড়, মণিমুক্ত ভরা অলঙ্কার, রেশম ও ব্রোকেডের কাপড় শুধু

প্রাসাদের জন্যই নয়, তাঁবুতে খাটানোর জন্যও ছিল। নানা ধরণের সুগন্ধি ও মদ, ঘোড়া ও হাতির জিন, রেকাব অনেকসময়ই সোনা-রুপোয় তৈরি, সুন্দরভাবে সাজানো পাল্‌কি, নানা ধরণের অস্ত্র এই সব কিছুরই ওপর সম্রাট ও তাঁর অভিজাতরা অর্থ খরচ করতেন। আবুল ফজল বলছেন যে, আকবরের জন্য বছরে হাজারটা জামা করানো হতো এবং প্রতিবছর পুরোনো কাপড়-চোপড় চাকরদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হতো। আর একজন পর্যটক বলেছেন যে, প্রতিদিন সম্রাটের খাইখরচের ও জামাকাপড়ের জন্য খরচ করা হতো দশ হাজার টাকা। তাঁর হারেমের জন্য দিনে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করা হতো। মোরল্যাণ্ড বলছেন যে, অলঙ্কার ছাড়া সব থেকে বেশি খরচ হতো ওমরাহদের আস্তাবলের পেছনে। এটা এই থেকে বোঝা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের সময় যখন সৈন্যদের বেতন দেওয়ার টাকা ছিল না তখন আওরংজেব তাঁর ঘোড়া ও হাতির সোনা-রুপার জিন, রেকাব ইত্যাদি গালিয়ে মুদ্রা তৈরি করে তাদের বেতন দিয়েছিলেন।

এই ধরণের খরচ করার ফলে কারিগরি দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছিল। সম্রাট ও অভিজাতরা বড় বড় প্রাসাদ দুর্গ পথঘাট বাঁধ ইত্যাদি তৈরি করার ফলে ঐ ধরণের কাজের চাহিদা বেড়ে যায়। এর ফলে যাতায়াতের প্রয়োজনীয় পাল্‌কি, নৌকা, গাড়ি ইত্যাদির চাহিদাও বাড়তে থাকে। বড় বড় শহরে মুঘলরা প্রচুর খরচ করতে থাকে এমনকি ওমরাহরা সম্রাটের নেকনজরে আসার জন্য দিল্লি শহরে প্রচুর খরচ করে যেমন মসজিদ, সরাইখানা, দান-খয়রাত দিয়ে বাড়ি তৈরি এবং এমনকি কোনো কোনো জায়গায় হাসপাতালও তৈরি করেছিলেন। শাহজাহানের দিল্লির প্রাসাদ তৈরি করার ইতিহাস মোটামুটি জানা। এর ফলে জিনিস ও কাজের লোকের চাহিদা বাড়তে থাকে। সরকারি কারখানায় বহু ধরণের জিনিস তৈরি হলে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বাড়তেই থাকে।

সাম্প্রতিক গবেষণার সূত্র থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য উত্তরোত্তর মুঘল যুগে বেড়ে চলছিল যার ফলে কারিগরি দ্রব্যের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছিল। বলা নিস্প্রয়োজন যে, উৎপাদনও ঐ সঙ্গে বাড়ছিল। মুঘল যুগে শান্তি নিরাপত্তা ও শহরবিন্যাসের ফলে ঐ চাহিদা ও উৎপাদন ক্রমাগত বেড়ে চলছিল। উল্লেখযোগ্য যে, মাঝারি ধরণের জিনিসের চাহিদাও বাড়তে থাকে– যেমন সুতো, সোনার জরি, কাঁচা রেশম, জাহাজের জন্য ধাতু, জিনিসপত্রের জন্য বস্তা বা কাঁচের বাক্স, দড়ি ইত্যাদি। সামুদ্রিক বাণিজ্যে যেমন কাপড়, চিনি ও হীরের রপ্তানি বাড়ছিল। স্থলপথে মসলিন ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য যেত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বাজারে। এ-সবের ফলে জাহাজের চাহিদাও বাড়তে থাকে যার সঙ্গে যোগ দেওয়া যায় ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির মুঘল ভারতে জাহাজ তৈরির চেষ্টা।

সহজ কথায় সরকারি ও বেসরকারি চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে মুঘল ভারতে কারিগরি দ্রব্যের উৎপাদন বাড়তে থাকে। কিন্তু আয়ের বিশাল তারতম্যের জন্য এই চাহিদা ও উৎপাদন কোনো কোনো জায়গায় একেবারে বন্ধ হয়ে যায় এবং

কোনো কোনো জায়গায় বেড়ে যায়। কাপড়ের উৎপাদন ও চাহিদা যেমন বাড়তেই থাকে বিশেষত ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি এদেশে আসার পর পরই তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অশান্তি এর আভ্যন্তরীণ চাহিদাকে ক্ষুণ্ণ করেছিল কি-না এ-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

এই কারিগরি দ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে বার্নিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মোরল্যাণ্ডের মতে, এই পর্যবেক্ষণ সঠিক নয়, কারণ এরা যাতয়াতের পথের ধারের যে শহরগুলি দেখেছেন তার থেকেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। দেশের বাকি অংশের খবর এর রাখতেন না। ওঁর মতে, জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা এত কম ছিল যে, চাহিদা ও উৎপাদন দুই-ই যথেষ্ট কম ছিল। কিন্তু তাঁতের কাপড় সম্পর্কে মোরল্যাণ্ড স্বীকার করেছেন যে, সারা দেশই যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল তাই নয়, এদেশের মোট উৎপাদন সমগ্র বিশ্বের বাজারে একটা বিশেষ ঘটনা বলা যেতে পারে। মনে হয়, এই ধরণের কথা আরো বলা যায়, কারিগরি দ্রব্য, খাবার, বাড়ি তৈরি শিল্প, যাতায়াতের শিল্প, চামড়ার দ্রব্য ইত্যাদি সম্পর্কে। যে-সব পর্যটক বাঁধাপথের বাইরে যাতায়াত করছেন তারাই এই সত্য স্বীকার করেছেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য, শহরের বর্ণনা দিতে গিয়ে সমকালীন সাহিত্য সবসময়ই বিভিন্ন ধরণের কারিগর জাতের তালিকা দিয়েছেন। যদিও পরবর্তীকালের ইংরেজদের লেখা থেকে এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। এগুলি ইংরেজ যুগের সমসাময়িক বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। এই সব কারিগরি শিল্প নানান কারণে বিশেষ বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল। এদের প্রত্যেকটির কিছু বৈচিত্র্য আছে যা শুধু দক্ষ শ্রমিকের সমাবেশের মধ্যেই নয়, কাঁচা মালের সহজলভ্যতার জন্য বিশেষ কয়েকটি জায়গায় উন্নতি করেছিল, বিশেষত যেখান থেকে বাজার খুব কাছে। এ-ছাড়াও বাণিজ্য পথ ও বন্দরের কাছাকাছি অবস্থান নির্বাচনের জন্য কিছুটা সহায়ক। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, মাত্র কয়েকটি শহরেই শুধু কারিগরি শিল্প সীমাবদ্ধ ছিল না।

তাঁত বা তাঁতের কাপড় শিল্প অবিসংবাদিতভাবে দেশের সবচেয়ে উন্নত শিল্প। মনে করা যেতে পারে যে, দেশের সব জায়গাতেই স্থানীয় চাহিদার জন্য ও দূরদূরান্তের বাজারের জন্য এই কাপড় তৈরি হতো। সমকালীন দলিলে প্রায় ১৫০ রকম কাপড়ের নাম পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই টুকরো কাপড় বা তৈরি কাপড়। এছাড়া আছে ক্যালিকো বা মোটা কাপড়, মস্‌লিন বা মিহি-কাপড়। কোরা বা আনকোরা সাদা বা রঙিন বা বিভিন্ন ধরণের নকশা-কাটা যেগুলি তাঁত-যন্ত্রেই রঙিন সুতো দিয়ে বোনা অথবা ছাপা কিংবা তুলি দিয়ে রঙ করা। তাঁতিদের কাজের ওপর এবং সুতোর ওপর কাপড়ের দাম নির্ভর করত। বাংলায় ক্যালিকোকে 'ধুতি' এবং গুজরাটে 'বাফতা' বলা হতো। এগুলি সাধারণত ১২ থেকে ১৫ গজের কাছাকাছি। যদিও মুঘল ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই কাপড় তৈরি হতো কিন্তু কতকগুলি জায়গা বিশেষ ধরণের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। মসলিন প্রধানত দাক্ষিণাত্য ও বাংলা থেকে, তাঁত ও রেশম মিশ্রিত কাপড় গুজরাট থেকে এবং চিত্রিত কাপড় দক্ষিণ

করমণ্ডল থেকে পাওয়া যেত। কতকগুলি শহরে বিশেষ ধরণের কাপড় বিক্রি হতো এবং অনেক সময়ে ঐসব কাপড়ের নাম রাখা হতো ঐসব শহরের নামেই। এর ফলে, ঐ বিশেষ ধরণের কাপড় ঐ সবজায়গা থেকে সংগ্রহ করাও সুবিধাজনক ছিল। বৈদেশিক বাজারও বিশেষ ধরণের কাপড় কিনত এবং সে-জন্য ঐ সব বাজারগুলিকেও আলাদাভাবে চিহ্নিত করা সহজ।

জামার কাপড় ছাড়া তাঁতের কার্পেট, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, রুমাল, বাংলার কাঁথা, সিন্ধ-এর মাদুর, তাঁবু ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হতো। সম্রাট ও ওমরাহদের কাছে তাঁবুর প্রয়োজন খুব বেশি ছিল। আবুল ফজল এগারো রকম তাঁবুর কথা বলেছেন। বড় তাঁবুর দাম দশ হাজার টাকার ওপরে এবং খাটাতে দুদিন লেগে যেত। এর মধ্যে রেশম, ভেলভেট ইত্যাদি থাকলেও মূল তাঁবু ছিল তাঁতের।

তাঁতের সুতো তৈরি করা সব সময়ই ছিল আলাদা কাজ এবং সাধারণত তাঁতিদের পরিবারই এইসব কাজ করতেন। কিন্তু এছাড়াও স্বাধীনভাবে সুতো তৈরি করার লোক ছিল, যারা বাজারে এগুলি বেচত। ব্রোচ, বালাসোর, কাশিমবাজার ইত্যাদি জায়গা ছিল সুতো তৈরির কেন্দ্র। ইংরাজ কোম্পানি গুজরাট, বেরহামপুর ও বাংলা থেকে সুতো রপ্তানি করত। এই সব রপ্তানি খুব মোটা দাগের কারণ ইওরোপীয় কারিগররা সরু সুতোয় কাজ করতে পারত না। সবথেকে সরু সুতোয় তৈরি হতো মস্‌লিন যেগুলি মূলত বাংলার ঢাকা থেকে পাওয়া যেত। সপ্তদশ শতাব্দীতে গুজরাটে সুতোর উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়ছিল। ১৬৮০-র পর সুরাট থেকে বাংলায় সুতো আমদানি বাড়তে থাকে এবং ১৭০১-০২ সালে চোদ্দহাজার মণ সুতো বাংলায় আসে। ১৭১০ সালের মধ্যে সব থেকে বেশি আমদানি-র তথ্য এইটি।

সতের শতকের মধ্যে বাংলার রেশমের উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়তে থাকে। এর আগে গুজরাট ছাড়া কাশ্মীর ও বাংলায় রেশম তৈরি হতো অল্পস্বল্প। বিদেশী পর্যটকরা বলেছেন যে, আগ্রা, লাহোর, ফতেপুর ইত্যাদি শহর রেশম তৈরির কেন্দ্র ছিল। রেশম তৈরিতে আকবরের যে বিশেষ উৎসাহ ছিল এটা আবুল ফজল লিখেছেন এবং এজন্য তিনি বিদেশী তাঁতিও নিয়ে আসেন। চীন দেশের রেশমের ওপর গুজরাট খুবই নির্ভরশীল ছিল কারণ এদেশে তখনো তুঁত এর থেকে রেশম তৈরির পদ্ধতি বিশেষ জানা ছিল না। বাংলায় এটা প্রথম শুরু হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বাংলা চীনের রেশমকে হটিয়ে দেয়। ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ারের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, কাশিমবাজারে ২৩ লক্ষ পাউণ্ড কাঁচা রেশম হতো যার দুই-তৃতীয়াংশ গুজরাটে যেত, যদিও এটা সারা বাংলার উৎপাদন বলে কেউ কেউ ধরছেন। উৎপন্ন রেশম দ্রব্যের মধ্যে ছিল গালিচা, ভেলভেটের তাঁবু, পাটোলা কাপড়, সোনার জরি দেওয়া সাটিন ও টাফেটা এবং বিভিন্ন রঙের বৈচিত্র্যময় কাপড়। আসামের মুগা ও তসরের উল্লেখও কেউ কেউ করেছেন।

আবুল ফজল তাঁর নামের তালিকার মধ্যে পশম বা উলও ধরেছেন। বর্নিয়ার কাশ্মীরের শালের কথা বলেছেন এবং তিব্বতী ভেড়ার পশমেরও উল্লেখ করছেন।

পাটনা, আগ্রা ও লাহোরে পারসিক ধরণের গালিচা নিজের কারখানায় করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন আকবর। সাম্রাজ্যের অন্যান্য শহরেও গালিচা তৈরি করার চেষ্টা শুরু হয়। সাধারণত পারস্য থেকে আগত কারিগররা এই সব গালিচা তৈরি করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বাংলায় এই ধরণের গালিচা তৈরির কারিগরের কথা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

বস্তা বা মাল বাঁধার দড়ি সম্পর্কে খুব কম জানা যায়। কাশিমবাজারের কাছে শণের দড়ি পাওয়া যেত। তাভারনিয়ার একধরণের মাল বাঁধার দড়ির কথা বলছেন, যার নাম দিয়েছেন *তাভি*। এটা তিনি দেখেছেন দাক্ষিণাত্যে। মোরল্যাণ্ড বলেছেন, বাংলার গরীবরা একধরণের পাটের কাপড় ব্যবহার করে। এখন এই কাপড়কে বুনো রেশম (পাট নয়) বলে ধরা হয়েছে। এদের বোধ হয় আবুল ফজল *তাঁতবস্ত্র* বলেছেন। সুতরাং মুঘল যুগ থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কাপড়ের অন্যান্য কাজও— যেমন রঙ করা বা ছাপ লাগানো ইত্যাদি একটা আলাদা ও স্বাধীন কাজ হিসাবে চলে আসছে। যদিও সপ্তদশ শতাব্দীর আগে কাজের এই ধরণের বিভাজন হয়েছিল বলে মনে হয় না।

মুঘল যুগে উৎপাদন কত হয়েছিল সেটা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। থাট্টায় তাঁতি পরিবারের স্যংখ্যা বা কাশিমবাজারের রেশম উৎপাদন ছাড়া আর বিশেষ কোনো তথ্য নেই। সুতরাং মোরল্যাণ্ড উৎপাদনের যে হিসাব দিয়েছেন, সেটা মেনে নেওয়া শক্ত। এটা অবশ্য বলা যায় যে, মুঘল যুগে কাপড়ের উৎপাদন ক্রমশ বাড়ছিল। উৎপাদনের নতুন কেন্দ্র তৈরি হওয়া, দূরপাল্লার বাণিজ্য বেড়ে যাওয়া ইত্যাদির ফলে উৎপাদন যে অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছিল এতে সন্দেহ নেই। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এই যে, রপ্তানির কেন্দ্র গুজরাট থেকে সরে আসে বাংলায়। গুজরাটের ১৬৩০ দশকের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষর পরই এটা শুরু হয় যদিও অধ্যাপক ওমপ্রকাশ ওলন্দাজ সূত্র থেকে দেখাচ্ছেন যে, ১৬৮০-র পরই ইওরোপীয় লগ্নি গুজরাট থেকে সরে বাংলায় আসতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে গুজরাটে মুঘল-মারাঠা যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে মন্দা আসার ফলে বাংলার রপ্তানি গুজরাটের তুলনায় বাড়তে থাকে। এই সময় থেকে বাংলা রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে রঙ ও চিনি কৃষির সঙ্গে জড়িত। লাল রঙ প্রধানত করমণ্ডল উপকূল থেকে আসত। নীল হতো আগ্রার কাছে বিয়ানা এবং গুজরাটের সরখেজে। এ-ছাড়া উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ করমণ্ডলেও কিছু রঙ উৎপন্ন হতো। বিয়ানা-য় হতো সব থেকে ভালো নীল এবং এর দাম ছিল ছিল সব চেয়ে বেশি। সাধারণত কৃষকরাই এর উৎপাদন করত কিন্তু অনেক সময়ে এরা পাতা দিয়ে দিত অন্যদেরকে যারা রঙ তৈরি করার কারিগরি বিদ্যা জানত। ক্রমে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা নীল রপ্তানি শুরু করে। গুজরাটের দুর্ভিক্ষ-র পর নীলের উৎপাদন কমতে থাকে কারণ খাদ্যশস্যের দাম তখন খুব বেশি বেড়ে যায়।

আখ থেকে গুড়, চিনি ও মিছরি তৈরি হতো বিভিন্ন জায়গায়। সবথেকে ভালো

ও কম দামী চিনি পাওয়া যেত বাংলায়। আগ্রা ও তার চারপাশে এবং মূলতান ও উড়িষ্যাতেও চিনির উৎপাদন হতো। ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি বাংলার চিনি ইওরোপের ও পারস্যের বাজারে বিক্রি করত। ১৬৪০-এর দশকে ওলন্দাজ কোম্পানি প্রতি বছর গড়ে চার লক্ষ পাউণ্ড চিনি পারস্যে রপ্তানি করেছে। ইংরেজরা অবশ্য বেশিদিন চিনি রপ্তানি করে নি।

কৃষি থেকে উৎপাদিত আরো কিছু দ্রব' ছিল যেগুলি দেশের ভেতরে চলত। এর মধ্যে আছে তেল, তামাক, আফিম, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি। উড়িষ্যা উপকূলে পাওয়া ইওরোপীয়রা 'জিঞ্জেলী'-র কথা বলেছেন, যেটা একধরণের তেলের বীজ ; বাংলার মেদিনীপুরে ফুল ও অন্যান্য বীজ থেকেও তেল হতো। গোয়ালিয়র চামেলি তেলের জন্য বিখ্যাত ছিল। পর্তুগিজরা আকবরের আমলের শেষদিকে উত্তর ভারতে তামাক নিয়ে আসে। সপ্তদশ শতাব্দীতে এর উৎপাদন অনেক বেড়ে যায়। পর্যটক মানুচী সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখেছেন যে, দিল্লির আবগারি কর তামাকে ছিল দিনে পাঁচহাজার টাকার মতো। ঐ সময় থেকে তামাক গুজরাট, বাংলা ও করমণ্ডল থেকে রপ্তানি হচ্ছে। মালব ও বিহারে আফিম হতো। মুঘল ভারতের বহু জায়গায় মহুয়া, গুড় ইত্যাদি থেকে মাদকদ্রব্য হতো।

খনিজ দ্রব্য মুঘল ভারতে বিশেষ ছিল না। মোরল্যাণ্ড বলছেন, এর কারণ খনিজ দ্রব্য ও জ্বালানির সমন্বয়ের অভাব। খনি গভীর করার কলাকৌশল না জানার ফলেও আরো অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু লোহার উৎপাদনে ভারতবর্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। বাংলা, এলাহাবাদ, আগ্রা, বেরার, গুজরাট, দিল্লি ও কাশ্মীরে লোহার উৎপাদন হতো। ওলন্দাজরা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে করমণ্ডল উপকূল থেকে বাটাভিয়াতে লোহার পেরেক, কামানের গোলা ও লোহার অন্যান্য দ্রব্যাদি রপ্তানি করতে থাকে। এর মধ্যে ইস্পাতের রপ্তানিও ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইন্দুর-এর কাছ থেকে দামাস্কাসে রপ্তানি হতো ইস্পাত— এটা সমকালীন ফরাসি পর্যটক মার্তাঁ দেখেছেন। এ-ছাড়া সোরার প্রয়োজন ছিল বারুদ তৈরি ও অভিজাতদের জল ঠাণ্ডা রাখার জন্যে। গুজরাট, করমণ্ডল ও বাংলা থেকে সোরা রপ্তানি হতো। ১৬৮৮ সালে পাটনা এলাকায় কাঁচা সোরার উৎপাদন দাঁড়ায় ১,২৬,২০০ মণ। পরিশোধনের পর এই অঙ্ক দাড়ায় ১,২৭,২৩৮ মণে। পাটনার সোরা সবথেকে ভালো বলে ধরা হতো এবং সরকারি কারখানায় ও ইওরোপীয়দের মধ্যে এর ব্যবহার বেশি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মুঘল সম্রাটের আদেশে পাটনা থেকে ইওরোপীয়দের সোরা কেনা বন্ধ হয়ে যায়। ফরাসিরা আর্মেনিয়ান ও মুঘল বণিকের নামে পাটনা থেকে তাদের প্রয়োজন মতো সোরা কিনতে থাকে যদিও তার দাম অনেক বেশি পড়ে: ১৬৯৩ সালে হুগলী থেকে লেখা একটি ফরাসি চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, তারা পনেরো হাজার বেল সোরা সংগ্রহ করে জাহাজে তোলার ব্যবস্থা করছে।

হীরে সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকরা লিখেছেন যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় এর

অবদান প্রায় কিছুই ছিল না। অবশ্য এখানে দিনমজুরের সংখ্যা খুব বেশি ছিল, যদিও তাভারনিয়ার যে সংখ্যা দিয়েছেন তাতে সন্দেহ আছে। প্রধান খনি দুটি ছিল বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায়। ছোটনাগপুরে নদীর ধার থেকেও কিছু হীরে পাওয়া যেত।

বস্তুত, অনেক বেশি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল লবণ। পাঞ্জাবের পাহাড় ও সম্বর হ্রদ থেকে লবণ পাওয়া যেত। এছাড়াও সমুদ্র থেকে বিভিন্ন জায়গায় লবণ উৎপন্ন হতো। লবণের আলাদা ব্যাপারী ছিল যারা বিভিন্ন জায়গায় লবণ নিয়ে যেত। খুব অল্প পরিমাণে সোনা ও রূপো পাওয়া যেত। তামা বেশ বেশি মাত্রায় পাওয়া যেত বলা হচ্ছে। হিমালয়ের পাদদেশে এবং রাজস্থানের খনি থেকেও কিছু কিছু তামা পাওয়া যেত।

যাতায়াত শিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল নৌকা তৈরি। নানা ধরণের নৌকোর ছবি মুঘল চিত্রকলায় দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের গায়ে খোদাই থেকে ফরাসি পণ্ডিত দলোস বাংলায় এই ধরণের নৌকোর ছবি দিয়েছেন। সমকালীন পারসিক ইতিহাস ও ইওরোপীয় লেখকদের লেখা থেকে আমরা বিভিন্ন ধরণের নৌকো তৈরি ও তার ব্যবহারের কথা পাই। আবুল ফজলের লেখায় ও বাহারিস্তানে বাংলার *নওয়ারা*-র কথা পাই যেগুলি প্রধানত উপকূলবর্তী এলাকায় তৈরি হতো। সপ্তদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মুঘল ভারতে জাহাজ তৈরির শিল্প। শুধু উপকূল এলাকা নয়, দূরপাল্লার সমুদ্রযাত্রার জন্যেও জাহাজ তৈরি করা হতো। এগুলি সবই *জাঙ্ক* ধরণের– বর্তমান কালের জাহাজের তুলনায় বিরাট বড় যেগুলি প্রধানত মক্কায় হজ্ যাত্রীদের নিয়ে যেত। এর প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, নড়াচড়া করতে এগুলির অসুবিধা হতো এবং ইওরোপীয় জাহাজের তুলনায় এদের কামান ততটা কার্যকর ছিল না। যে-সব অঞ্চলে কাঠ বেশি পাওয়া যেত প্রধানত সেখানেই জাহাজ তৈরি হতো। এজন্যে সুরাট জাহাজ তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল, পরবর্তীকালে বোম্বাই এই স্থান দখল করে নেয়। ইওরোপীয় ধরণের জাহাজ মূলত পর্তুগিজরা তাদের এলাকায় তৈরি করত এবং তার দামও ছিল অত্যন্ত চড়া। ঐ সময়ের কিছু পরে সুরাটে ইওরোপীয়দের তাগিদে এবং চাহিদা অনুযায়ী ঐ ধরণের জাহাজ তৈরি করা শুরু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ওলন্দাজরা করমণ্ডল এলাকায় ঐ ধরণের জাহাজ তৈরি করা শুরু করে। কিন্তু তার দাম অত্যন্ত বেশি পড়ে যাওয়ায় কিছুকাল পরে ঐ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং মানের দিক থেকে ও উৎপাদন হিসাবে এই শিল্প অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা যেতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসিরা বাংলা থেকে বড় লোহার নোঙর সংগ্রহ করতে পারছে না যেগুলি আর সহজেই মিলত সুরাট ও করমণ্ডল এলাকায়। এমনকি ফরাসিরা বাংলায় ঐ সময়ে ছোটো নৌকাও পাচ্ছে না এবং সুরাটে তৈরি করার জন্য লিখছে। এর একটা কারণ হয়ত এই যে, এই সময় ফরাসিদের সঙ্গে ওলন্দাজদের যুদ্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও খাম্বাজ শহরে জাহাজ তৈরি হচ্ছে একথা সমকালীন ইংরেজ পর্যটকদের লেখা থেকে জানা যায়। তাঁরা কারখানায় জাহাজ তৈরির কাজ দেখেছেন।

উচ্চবিত্তদের জীবনযাত্রার প্রণালীর ফলে গৃহস্থালীর কিছু কিছু জিনিসের চাহিদা বেড়ে যায় যার মধ্যে রয়েছে তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, চামড়ার দ্রব্য, দর্জির তৈরি জামাকাপড়, লেখার সরঞ্জাম, সুগন্ধি, গহনা, ঘোড়ার জিন, রেকাব ইত্যাদি। *আইন-ই আকবরী* তে এই সব ধরণের জিনিসের বর্ণনা রয়েছে যার অধিকাংশই সম্রাটের প্রাসাদে ব্যবহৃত হতো। এর অল্প একটু অবশ্যই আসত রাষ্ট্রের নিজস্ব কারখানা থেকে। এসবের অধিকাংশই তৈরি করত স্থানীয় বাসিন্দারা। আগেই বলা হয়েছে যে, কয়েকটি জিনিসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যেমন কাশ্মীর ও গুজরাটে হতো কাঠের কাজ, অবশ্য গুজরাট লাক্ষার জন্যও বিখ্যাত ছিল। লাহোরে চামড়ার জুতো, জিন, রেকাব ইত্যাদি, মুলতানে চামড়ার অন্যান্য দ্রব্য, এবং সাম্রাজ্যের দূর প্রান্ত থেকে আসত আতর। পাটনায় সুগন্ধি মাটির পাত্র এবং এলাহাবাদের কাছে শাহজাদাপুরে কাগজ তৈরি হতো। এ-সবের থেকে মনে হয় যে, নানা ধরণের কারিগরি কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কারিগর ছিল— যারা কেবল ঐ বিশেষ ধরণের কাজ করত। যেহেতু মুঘল মনসব্‌দাররা মুঘল সম্রাটের জীবনযাত্রার অনুকরণ করত তাই এই সব জিনিসের চাহিদা তাদের কাছে কম ছিল বলে মনে হয় না।

কিন্তু এই বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরণের কারিগরি কাজের নানা রকম বাধা-বিপত্তি ও সীমাবদ্ধতাও ছিল। যে ধরণের বাজারের জন্য যে যে কাজ করা হতো— তার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। যে কারণে প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তনের কোনো তাগিদ অনুভূত হয় নি এবং কলা কৌশলেরও কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হতো তা ছিল সবই সস্তা ও সরল, যার জন্যে প্রতি একক উৎপাদনে খুব কম লগ্নি আর কারিগরের প্রয়োজন হতো। উৎপাদনের একটা বিরাট অংশ ছিল বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ বাজারের জন্য এবং এর অনেকটাই পরম্পরাগত প্রথায় হাত বদল হতো। যুগ যুগ ধরে যে সামাজিক ব্যবস্থা বলে আসছিল, তাতে সব ধরণের উৎপাদন সমান গুরুত্ব পেলেও বর্ণব্যবস্থার ফলে কোনো শ্রেণীর কারিগরের সামাজিক গুরুত্ব ছিল বেশি আর কারো ছিল কম। যদিও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার হিসাবে কোনোটির গুরুত্ব কম ছিল না। এখানে উত্তরাধিকার সূত্রে কারিগর তৈরি হতো। অধিকাংশ উৎপাদন ছিল পরিবারভিত্তিক। এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি, তিনি একদিকে পরিবারের এবং অন্যদিকে ছিলেন কারিগরদের কর্তা। এর ফলে পরিবারের সকলের মধ্যে যেমন আয় ভাগ হয়ে যাচ্ছে, তেমনি দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের মধ্যেও আয়ের ফারাক কমে যেত। আর এই ব্যবস্থায় দক্ষ কারিগর বিত্তশালী হয়ে কর্তা হয়ে উঠেছে— যা ইওরোপের মধ্যযুগে হয়েছিল— সেটা এখানে দেখা যায় না। বিশেষ বিশেষ জিনিসের চাহিদা— যা মূলত অভিজাতদের বিলাসব্যসনের কারণে, সেটা পূরণ করতে পারে কেবল বিভিন্ন ধরণের কারিগর বিভিন্ন অংশের কাজ করে। এ-কারণে ঐ সব কাজের জন্য কারিগরদের মধ্যেও বিভিন্ন জাত তৈরি হয়েছিল যারা একটি জিনিসের কেবল একটি অংশই তৈরি করত। আবদুর রহিম বা *অর্ধকথানক*-এর লেখকের লেখায় তাই আমরা কারিগরদের মধ্যে এত জাতের কথা পাই। উদাহরণস্বরূপ, কাপড় তৈরিতে

তাঁতি ছাড়াও, বহুরকম পেশার কথা আমরা পাই। আবার যেমন সপ্তদশ শতাব্দীতে ধুনুরীর কথা আমরা প্রথম পাই। যাই হোক, কাপড় ছাপানো, রঙ করা, আঁকা- সবই বিভিন্ন জাতের কারিগররা করতে থাকে যারা আলাদা জাত হিসাবে পরিগণিত হতো। গুজরাটের কর্ণেলিয়ান পাথর তৈরি করার জন্য তের রকম পেশার প্রয়োজন হয়েছিল যারা প্রত্যেকেই ছিল আলাদা জাতের কারিগর।

কারিগরি কাজ ও জাতি-সমাজবিন্যাস বিশেষ একটা রূপ নেওয়ার ফলে পেশা বদল করা বা নিচুস্তর থেকে ওপরে ওঠা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কারিগরদের এই সামাজিক স্তর বিন্যাসকে ঈশ্বর-প্রদত্ত বলে মেনে নেওয়া হতো যেটা ঐ সময়কার সমাজে বদলানো সম্ভব ছিল না। সুতরাং মধ্যযুগীয় ইওরোপে অমরা যেটা দেখি, অর্থাৎ কারিগর নিজেই পেশা ঠিক করে কাজ করছে, সেটা মুঘল ভারতে বিরল। অত্যন্ত শক্তিশালী শাসকশ্রেণী মুঘল ভারতে কারিগরদের এই নিচুস্তরকে নিচুতে রাখতে সাহায্য করেছে। উচুঁ জাতের লোকেরা কারিগরি বিদ্যার দিকে যায় নি। মেয়েদের সূতাকাটা অবশ্য একটা ব্যতিক্রম। সুতরাং শাসকশ্রেণী সরাসরি কারখানা চালাচ্ছে বা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না মুঘল ভারতে।

মধ্যযুগের ভারতে উৎপাদন প্রধানত গ্রামীণ ব্যবস্থার মধ্যে হলেও শহরে কারিগরদের কাজ কারবার ছিল। যদিও ওটা সাধারণত বিলাসদ্রব্যের উৎপাদনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। ইওরোপে যেমন গ্রাম থেকে কাঁচামাল এসে শহরে তৈরি হচ্ছে, ঠিক এ-ধরনের চিত্র খুব পরিষ্কারভাবে মুঘল ভারতে পাওয়া যায় না। গ্রামে বা শহরে কারিগরের পরিবারই উৎপাদক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়েকটি সূত্রে আমরা পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কাজের ভাগ দেখতে পাই। ইওরোপীয় পর্যটকরা দেখেছেন যে, একটা কারিগর পরিবারে মেয়েরা ও ছোটো ছেলেরা কিভাবে কাপড়ে রঙ দিয়ে চিত্র তৈরির কাজে সাহায্য করছে। ঐতিহাসিক আবদুল করিম দেখিয়েছেন যে, ঢাকার কারিগরের মেয়েরা মস্‌লিন কাপড় তৈরি করতে কয়েকটি বিষেশ ধরণের কাজ করছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে কারিগরের বাসস্থানই তার কারখানা এবং জীবনধারণের খরচ বাদ দিয়ে যা তার উদ্বৃত্ত থাকছে, সেটাই তার বিক্রি। এই পুরুষ ও মহিলাদের কাজের বিভাজন বাংলায় অন্তত ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ছিল না বলেই মনে হয়। মুকুন্দরামের বা বৈষ্ণব কবিদের লেখায় এ-ধরণের বিভাজনের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

গ্রামীণ উৎপাদন যে গ্রামীণ প্রথা অনুসারে গ্রামের বিভিন্ন লোকেদের মধ্যে তাদের কাজের বিনিময়ে বিতরণ করা হতো এর যথেষ্ঠ প্রমাণ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে পাওয় যায়। একে *যজমানী* প্রথা বলা হতো এবং পূর্ব ভারতে এ-প্রথা প্রচলিত ছিল এটা মনে করারও কারণ আছে। উত্তর ভারতেও এই প্রথা পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রে এটা একটা প্রভাবশালী প্রথা ছিল। এর থেকে মনে করা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রথা চালু ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর আগেই বিনিময় প্রথা আরম্ভ হয়। নগদ টাকায় বা পণ্যে দিনমজুরি ব্যবস্থা শুরু হয়ে যায়। যদিও পাশাপাশি চলতে থাকে পূর্বেকার ব্যবস্থা। নতুন প্রথার সম্পর্কে অবশ্য প্রমাণ যথেষ্ট কম। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, কারিগররা গ্রামীণ ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও বর্দ্ধিত বাজারের জন্য কাজ করেছে। নিজামুদ্দিনের ৩২০০ কসবার উল্লেখ থেকে ক্রমবর্ধমান বাজার শহরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে যে-সব জিনিসের তালিকা রয়েছে তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, স্থানীয় কারিগররাই এই সব নানান ধরণের জিনিস তৈরি করেছে। কিন্তু পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এরকম কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে বাজারের নতুন ভূমিকা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একটা চাপ সৃষ্টি করেছিল যার একটা কারণ ছিল আভিজাতদের ক্রমাগত চাপ। এর উদ্দেশ্য ছিল কারিগরদের নিষ্কর জমি থেকে সরিয়ে জমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা। এর ফলে গ্রামীণ বিনিময় ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়ে। যদিও তখনো কারিগররা গ্রামীণ ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

গরীব কৃষকদের পক্ষে বাজারের জন্য উৎপাদন করা অস্বাভাবিক নয় যদিও তারা প্রধানত নিজেদের জীবন-ধারণের জন্যই উৎপাদন করত। বিভিন্ন উৎপাদন কৃষির সঙ্গে জড়িত যেমন আখ থেকে চিনি, নীল, নানা ধরণের রঙ ও কাঁচা রেশম। এসবই কৃষকদের ঘরে হতো। রেশমের কাপড় অন্যরা তৈরি করলেও তুঁত থেকে কাঁচা রেশম তৈরি করা ছিল কৃষকদের কাজ। কাজের যে বিভাজন হয়েছিল সেটা বোধ হয় পরবর্তীকালের তৈরি। লবণ ও সোরা তৈরি করা ছিল এক সময়ের কৃষকদের আধাসময়ের কাজ। পরবর্তীকালে 'নূনিয়া' ও 'মলঙ্গী' নামের বিশেষ জাতরা এই কাজ করত । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের পর্যটক হ্যামিলটন বুখাননের বিহারের লোহারীদের নাম উল্লেখ থেকে মনে হয় যে, এ-ধরণের কাজ শুরু হয়েছিল মুঘল যুগের শেষ দিকে। বিনিময় প্রথা ভালো করে শুরু হলে কৃষক ও কারিগর বাজারের জন্য উৎপাদন শুরু করতে দ্বিধা করে নি।

এটা সাধারণত মনে করা হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্থানীয় এবং দূরপাল্লার বাণিজ্যের জন্য উৎপাদন প্রধানত কারিগরদের ওপর নির্ভর করত। অবশ্য এর থেকে এই ধারণা হতে পারে যে, যাজমানি প্রথার থেকে কারিগররা বাইরে চলে যাচ্ছে। কারণ অধিকাংশ কারিগরই আগাম দাদনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সে আগাম নগদ টাকা হোক বা পণ্য যাই হোক না কেন। এই আগাম দিত দালালরা বা সরাসরি বণিকরা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই আগাম শস্যেও দেওয়া হতো। ১৬৭৭ সালে ইংরেজেরা মসুলিপত্তম শহর সম্বন্ধে লিখছেন যে, আগে বহু বণিক এই শহরে ছিল এবং দু-তিন দিনের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ক্যালিকো কিনতে পাওয়া যেত। কিন্তু এখন অনেক বেশি সংখ্যক ক্যালিকো পাওয়া যায় যদি কয়েকমাস আগে আগাম দেওয়া হয়। ১৬৬৪ সালে সুরাট থেকে ইংরাজরা লিখছেন, তাঁতিদের আগাম না দিলে, অর্ধেক পরিমাণ কাপড়ও আর পাওয়া যাবে না। দাদন দেওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, কারিগরদের হাতে লগ্নি করার মতো টাকা নেই। ইওরোপীয় কোম্পানির

উন্নতির মূলে অবশ্য অন্য কারণও আছে। তাঁতিরা তাদের তাঁত বদলাতে চাইত না কোম্পানির বিশেষ চাহিদার জন্য। কারণ তারা ভাবত, যদি কোম্পানি তাদের মাল না নেয় তাহলে তাদের ক্ষতি হবে। দাদন প্রথা তাদের এই ক্ষতির সম্ভবনা কমিয়ে দেয়। উৎপাদনকারীরাও ঐ কোম্পানির কাছে বাঁধা হয়ে পড়ত। কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রেই কারিগররা দাদন নিয়ে দিন-মজুরে পরিণত হয় যখন বণিকরা আগাম কাঁচামাল ও দিন-মজুরি দিতে থাকে। করমণ্ডল উপকূলের ইংরেজদের একজন প্রধান পণ্য যোগানকারী কাশি ভিরারি আগাম দিয়ে দিন-মজুরির কাজ করাতেন। কাশিমবাজার কুঠির রেশমের কারিগররাও এই ধরণের দিন-মজুরের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কারিগরদের কিছু স্বাধীনতা ছিল। ১৭৯০ সাল পর্যন্ত কোম্পানির বাংলা কুঠির তাঁতিরা তাদের প্রয়োজনীয় সুতো নিজেরা জোগাড় করেছে। যখন কাঁচা মাল অত্যন্ত দামী বা অত্যন্ত দূরদেশ থেকে আসত, সেখানে কারিগররা বণিক বা ক্রেতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ত। কিন্তু এতে বণিকেরা অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে লগ্নি উৎপাদনের ওপর। সেই পরিমাণে উৎপাদন পদ্ধতির ওপর এর ছাপ পড়েছিল কম। অর্থনৈতিক চাপ ছাড়া অন্য আর যে চাপ ছিল, সেটা জাতপাতের। গুজরাটের পাথরের শিল্পের কারিগররা বণিকদের গিল্ড-এর দ্বারা প্রভাবিত হতো।

বাণিজ্য বাড়তে থাকার ফলে অবশ্য উৎপাদন কয়েকটা বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইওরোপীয় কোম্পানির বণিকরা বিভিন্ন শহর ও গ্রামে ঘুরে মাল সংগ্রহ করতেন। এর ফলে উৎপাদন আগের মতো ছড়ানো ছিল। বিশেষ বিশেষ জায়গায় 'আওরং' গড়ে ওঠে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আওরং প্রথা জোরদার হয়ে ওঠে। শুধু কাশিমবাজারেই তিনটি ইওরোপীয় কোম্পানি প্রায় ১৬০০ রেশমের কারিগর নিযুক্ত করেছিল যার থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, এই অঞ্চলে ঐ ধরণের কারিগরদের সংখ্যা আড়াই হাজারের ওপরে ছিল। মসুলিপত্তমে বা বেনারসে আমরা প্রায় সাত হাজার তাঁতির কথা পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ঢাকা থেকে সুরাটের মধ্যেকার সব ছোটো-বড়ো শহরে বেশ বেশি সংখ্যক কারিগর ছিল। যদিও এর ফলে কাপড়ের দাম কম হতো কি না সন্দেহ।

কারিগররা প্রধানত বাজার শহরের চারপাশে বসতি স্থাপন করত। বিশেষত এই শহরগুলি যদি সমুদ্র উপকূলে হয় বা রপ্তানি বন্দরের কাছে হয়। কলকাতা বা মাদ্রাজের মতো ইওরোপীয় কোম্পানির বন্দরে উচ্চবিত্তদের প্রভাব থাকায় কারিগররা আসতে চাইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত গুজরাটের ক্যাম্বে শহর প্রধান রপ্তানি বন্দর না হলেও, কারিগরদের বসতি ছিল। এদের মধ্যে পাথর ও কাপড়ের কারিগর ছিল যারা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরতলীতে আসার পর কাজ করত এবং যাদের কাজ এখান থেকে সুরাট বা বোম্বাইতে চালান যেত রপ্তানির জন্য। কাঁচামালের যোগানের কাছেও কারিগররা বসতি করত। আগ্রা বা আমেদাবাদে সারা দেশ থেকে কাপড় যেত কারণ ঐ অঞ্চলে নীল পাওয়া যেত। কেবল সুরাট বা আমেদাবাদে রেশম কারিগরে সংখ্যার এত বেশি ছিল কেন তার সদুত্তর পাওয়া কঠিন। ঐ রেশম আসত

বাংলার কাশিমবাজার থেকে। গুজরাটে কেন কাঁচা রেশম তৈরি হতো না বা বাংলাতে কেন রেশমের কাপড় হতো না সেটা জানা যায় না। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, কারিগররা তাদের জায়গা ছেড়ে দূরে যেতে চাইত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একবার ইংরাজ কোম্পানি বাংলা থেকে কিছু কারিগরকে মাদ্রাজ নিয়ে যেতে চাইলে তারা আপত্তি করে। তবে এটা স্পষ্ট যে, ইওরোপের মতো এখানকার উৎপাদন পণ্য শহর থেকে গ্রাম বা গ্রাম থেকে শহরে যাচ্ছে না। এর ফলে ইওরোপের নগর বিন্যাস ও তার আনুষঙ্গিক সমাজ বিবর্তন যেভাবে হয়েছিল, সেটি মুঘল ভারতে দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে পরম্পরা ভাঙবার মতো কিছু ঘটলেও তার প্রসার খুব বেশি হয় নি।

রেশম শিল্পে কারিগরদের মধ্যে স্তর বিন্যাস আমরা দেখতে পাই সমকালীন চীনদেশে। এখানে বড় বড় মালিকরা দিন-মজুর দিয়ে কারিগর রাখছে এবং যার ফলে একটা স্তর বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা স্বাধীন কারিগর পাই। যে কাপড় তৈরি করছে এবং বিক্রি করছে। অর্থাৎ এরা নিজেরাই বিক্রি করছে। লক্ষ্ণৌতে আমরা কারিগরদের কর্তা পাই যাদের অর্থ আছে। বাজার বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এদের আবির্ভাব ঘটেছিল এটা মনে হতে পারে। গুজরাটে পার্শী জাহাজের কর্তারও আবির্ভাব হচ্ছে। এরা ভাড়া মজুরের সাহায্যে জাহাজ তৈরি করছে।

স্বাধীন উৎপাদক কারিগরদের আয়ের তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, সমকলীন সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি ও অভিজাতদের ব্যবহার কারিগরদের নিচুতলায় রাখতে সাহায্য করেছিল। আবুল ফজল কারিগরদের দৈনিক রোজগারের হিসাব দিয়েছেন। তিনি দিন-মজুরি দুই *দাম* থেকে সাত *দামের* মধ্যে কাজ অনুযায়ী রেখেছেন। এদের মধ্যে দক্ষতা অনুযায়ী রোজগারের স্তর বিন্যাস আছে। যেমন পাঁচ শ্রেণীর ছুতোর ছিল এবং তাদের দৈনিক মজুরি সাত *দাম* থেকে দুই *দামের* মধ্যে। ইরফান হবিব হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, এই রোজগারে কারিগর গমের রুটি, ডাল এমনকি দুধ ও দই খেতে পারত। আগ্রাতে গরীবরা যে ঘি খেত সেটা বিদেশী পর্যটকরা দেখেছেন। অর্থাৎ কারিগরদের রোজগার সাধারণভাবে জীবনধারণের তুলনায় ভালোর মধ্যেই ছিল। কিন্তু এর থেকে টাকা জমানো সম্ভব হতো না। ফলে লগ্নি পুঁজি তৈরি করা অসম্ভব ছিল। জুহুরী, স্বর্ণকার ও ধাতুর কারিগররা বেশি রোজগার করত সে-কথা আবুল ফজল বলেছেন ; বিশেষত যারা মুক্তো তৈরি করে বা মুদ্রায় লেখনী করে তারা অনেক বেশি মজুরি পেত— প্রায় দশ *দাম* থেকে কুড়ি *দামের* মধ্যে। তারা কোনো লগ্নি করতে পারত কিনা বলা যায় না। কিন্তু ইওরোপে কারিগররা যে-রকম লাভ করছে বা কারিগর-উদ্যোগ তৈরি করছে সে-রকম কোনো অবস্থা মুঘল ভারতে ছিল না এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

কখনো কখনো এই নিচুতলার বিত্তহীনরা প্রতিবাদও করত। ১৬৩০ সালে ব্রোচ শহরের কারিগররা সরবে প্রতিবাদ জানায় ইংরাজদের সূতা কেনার বিপক্ষে।

পরবর্তীকালে বরোদার কারিগররা শহর ছেড়ে চলে যায় শাসনকর্তার অত্যাচারের প্রতিবাদে। ১৬৮৬ সালে মাদ্রাজের লোকরা ইংরাজদের একটা কর বসানোর বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে। কিন্তু এগুলি সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এর থেকে সাধারণত কারিগরদের দীন অবস্থার যে উন্নতি হয়েছিল এটা বলা যায় না।

সপ্তদশ শতাব্দীর সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, কতকগুলি বড় সংস্থা তৈরি হচ্ছিল যেখানে বহুসংখ্যক কারিগর কাজ করতে পারে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, অর্থনীতি তখন এমন ছিল না যে, কেন্দ্রীভূত উৎপাদন সম্ভব হবে। এটাও বলা দরকার যে, এই ধরণের বড় সংস্থা মুঘল ভারতে তখন বিরল। এবং এই ধরণের সবথেকে বড় সংস্থা ছিল কাশিমবাজারের ওলন্দাজদের কুঠি— যেখানে সাত থেকে আট-শ কারিগর কাজ করত। আর এই ধরণের বড় সংস্থা তৈরির উদ্দেশ্য কাজের মান যাতে একই রকমের থাকে এবং অন্যান্য প্রতিযোগীরা পিছিয়ে পড়ে। ভারতীয়রা এই ধরণের সংস্থা তৈরি করে নি। এমন কি ইওরোপীয় চাহিদা বাড়ার পরও, পার্শী জাহাজী মালিকরা জাহাজ তৈরির জন্য এ-ধরণের বড় সংস্থা তৈরি করে নি। অবশ্য এটা বলা যায় যে, সরকারি কারখানাগুলি, যেখানে জুতো থেকে গহনা সবই তৈরি হতো, মুঘল ভারতের সব থেকে বড় সংস্থা। প্রথমত, ঐ কারখানাগুলি শুধু সম্রাটের ও তার পরিবারের চাহিদাই মেটাত। বাজারের চাহিদার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয়ত, এখানে একই ধরণের ও একই মানের দ্রব্য উৎপাদন হতো এটা বলা যায় না যেটি ইওরোপীয় কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য ছিল। হুগলী, পিপলি ও আমেদাবাদে সোরা শুদ্ধ করার জন্য ইওরোপীয়রা উন্নত মানের তামার পাত্র ইওরোপ থেকে আমদানি করে। রেশম তৈরির জন্যও ইওরোপীয়রা বাইরে থেকে অভিজ্ঞ লোক নিয়ে আসে এখানকার কারিগরদের বিশেষ কলাকৌশল শিক্ষা দেওয়ার জন্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলায় আর্মেনিয়ানরা ঐ ধরণের দিন-মজুর কারিগর নিয়োগ করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে দিন-মজুরি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বহু মজুর দিয়ে বড় সংস্থা তৈরি করা প্রধানত ইওরোপীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরিবারভিত্তিক ছোটো উৎপাদন সংস্থা আগের মতোই চলছিল।

শুধু ইওরোপীয় কোম্পানির বড় সংস্থা গড়ে তোলা ছাড়াও ছোটোখাটো পরিবর্তন মুঘল ভারতের উৎপাদন পদ্ধতিতে লক্ষ্য করা যায় যদিও এর মানে এই নয় যে, পুরোনো প্রথা সম্পূর্ণভাবে পিছনে চলে গিয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তনগুলি মূলে শুরু হচ্ছে। সোরা পরিশুদ্ধতার নতুন পদ্ধতি অথবা রেশম তৈরির নতুন কলাকৌশল এই মূল পরিবর্তন আনে নি। বরং দাদনী প্রথা বা বিশেষ জায়গায় বিশেষ ধরণের উৎপাদন এই পরিবর্তনের সূচনা করেছে। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা বা কলা-কৌশল সমগ্র শিল্পে কোনো যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে নি। কিন্তু বাজারে বর্ধিত চাহিদার ফলে নতুন অর্থনীতির জোয়ার যে আসছে, তার সূচনামাত্র। পরিবারভিত্তিক উৎপাদন রয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, শিল্পবিপ্লব আসছে না।

ইওরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে পুঁজির পরিমাণ বেড়ে যায় কারণ লাভ জমতে থাকে। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে ইংল্যাণ্ডে যে জমার হার ছিল শতকরা এক ভাগ, শিল্পবিপ্লবের পরে সেটা শতকরা দুই থেকে পনের ভাগের মধ্যে ওঠানামা করতে থাকে। মুঘল যুগে এ-ধরণের তথ্য বিরল। কিন্তু যখন দেখি যে, মুঘল ভারতে রাজস্বের বিরাট অংশ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে রয়েছে তখন বলা যায় যে, জমার হার সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল ভারতে বেশি ছিল। কিন্তু মুঘল সম্রাট ও রাজপুরুষদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ফলে এই জমা লগ্নি হয়ে উঠতে পারে নি। বার্নিয়ার লিখেছেন যে, শাহজাহানের সাম্রাজ্যের আয় তুর্কির সুলতান ও ইরাণের শাহ্-র সম্মিলিত আয় থেকে বেশি হলেও গহনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তা ছাড়া নগদ টাকা ছয় কোটির বেশি মুঘলরা জমাতে পারে নি। বাণিজ্যিক লাভ থেকে অনেকখানি চলে যেত বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের খরচে। এর ফলে লগ্নির চাহিদা মেটাতে পারত না। এ ছাড়াও এমন কোনো সংস্থা ছিল না যে, যার মাধ্যমে এই জমা অর্থ উৎপাদনে ব্যয় করা যেতে পারে। যাদের হাতে এই জমা ছিল— প্রধানত অভিজাত ও বণিকদের হাতে— তারা উৎপাদনে এই ব্যয় করত না। সুতরাং মোরল্যাণ্ড যখন বলছেন যে, জমা টাকা অধিকাংশ সময়ই বিলাসব্যসনে বা মাটির তলায় চলে যেত তখন সেটা মেনে নিতে দ্বিধা হয় না। প্রায় সকলেই এই ধরণের জমা সোনা বা রূপার গহনায় পরিবর্তন করে রাখত যেটা বাণিজ্যিক লগ্নির থেকে অনেক দূরের ব্যাপার।

কারিগরি উৎপাদন পুঁজির একটা ছোটো অংশ নিয়ে নিত। বড় একটা অংশ যেত সেচ ব্যবস্থা, পথঘাট, শহরের বাড়ি তৈরি এবং বণিকদের লগ্নি হিসাবে। উৎপাদনের ও চাহিদার কাঠামোর এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, পুঁজি তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল না। সামাজিক উৎসব ও রীতিনীতির পদ্ধতিও এই পুঁজি তৈরি হওয়ার পক্ষে বাধা ছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে পথঘাট তৈরি, সরাইখানা বানানো এমন-কি দুর্গ তৈরি করার জন্য লগ্নি উৎপাদককে সাহায্য করেছে। শহরের বাড়ি বণিকদের লগ্নির মধ্যে ধরা যায়, যেগুলির একটা অংশ তার দপ্তর, গুদাম বা দোকান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে ফরাসি পর্যটক মোদাভ ছোটো ছোটো শহরে একরকম বহু বাড়ি দেখেছেন যেগুলির উপরতলায় ব্যবসায়ীরা বাস করে ও নিচের তলায় রয়েছে তাদের গুদাম ও দোকান। গুজরাটের খাম্বাজ শহরে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এ-ধরণের বাড়ি বিক্রির দলিল আছে। সুরাটে ও খাম্বাজে ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি বাড়ি ভাড়া করে তাদের বাসস্থান ও কুঠি বানায়। অন্তত কারিগররা শহরে এধরণের বাড়ি তৈরি করছে বা সেটি ভাড়া দিয়ে আয় করছে এ-রকম কোনো নিদর্শন আমরা পাই না। ইওরোপের তুলনায় মুঘল ভারতে পুঁজির থেকে শ্রমের হার অনেক বেশি এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এটা খুব স্পষ্ট যে, কারিগরদের কোনো মূলধন নেই এবং কোনো পুঁজি জমছে না। তার বিশেষ কোনো মালও জমা থাকছে না। দালাল বা বণিকের কাছ থেকে আগাম নিয়ে মাল তৈরি করছে ও তাদের কাছে বিক্রি করছে নির্ধারিত দামে। ইওরোপীয়

কোম্পানিগুলি একই ধরণের মাল নিতে চায় ফলে দালাল বা বণিকের মাধ্যমে তারা কারিগরদের দিয়ে একই ধরণের মাল তৈরি করাচ্ছে। প্রথমদিকে ইংরাজেরা দেখেছিল যে, ভারতীয় বণিকরা বিভিন্ন শহর ঘুরে মাল কিনছে, কিন্তু যেহেতু তারা একই ধরণের মাল চায়, সেহেতু তাদের পক্ষে ঘুরে ঘুরে মাল কেনা সম্ভব নয়। কিন্তু এটাই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। বার্নিয়ার দিল্লির গুদামে বহু মূল্যবান মাল জমা হয়ে থাকতে দেখেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে হ্যামিলটন বিভিন্ন পাইকারদের ও খুচরো ব্যাপারীদের গোলায় মাল জমা থাকতে দেখেছেন। এ-চিত্র অবশ্য বিরল কারণ, প্রধানত আগাম নিয়ে কাজ করছে এটাই ছিল রীতি। সতের শতকের শেষেও বাংলায় ফরাসি কোম্পানি এই দুই ধরণের কথা বলেছেন। বণিক মহম্মদ জাস (যৌস ?) তাঁর লোকজনদের আগাম টাকা দিয়ে বাংলার বিভিন্ন কাপড় উৎপাদনের জায়গায় পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা সস্তায় কাপড় কিনত। বর্ষার সময় কাপড় কিনে কাজ করিয়ে নেওয়া সস্তা পড়ে একথাও ফরাসিরা বলেছেন। বণিকদের হাতে এত বেশি টাকা থাকার মানেই এই যে, তারা ঐ টাকাটা বাজারে ছাড়ছে না, জমিয়ে রাখছে। এমনকি এরকমই দুটো বড় উদ্যোগ– জাহাজী করবার ও হীরের খনির কাজ খুব কম লগ্নিতে চলত। হীরের খনির জমি কেনারও দরকার ছিল না, কিছু টাকার বিনিময়ে সরকারি অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করা যেত। সুতরাং লগ্নির সঙ্গে কারিগর বা শ্রমিকই হচ্ছে অন্যতম অঙ্গ। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশ থেকে প্রচুর সোনা বা রুপো এলেও লগ্নি বেড়ে যায় নি বা সুদের হার কমে যায় নি। পুঁজি জমত প্রধানত উপকূল এলাকায় যেখানে আমদানি রপ্তানি হচ্ছে– যেমন গুজরাট ও বাংলা। ঐ সব জায়গায় সুদের হার কিছু কমে নি। বরং যেখানে পুঁজি কম সেখানে সুদের হার ছিল বেশি। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, ঐ সব উপকূল এলাকায় অল্প সময়ের মধ্যে এত দ্রুত হারে মালের চাহিদা বাড়ছিল যে, পুঁজির যোগান সামাল দিতে পারছিল না। ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির কুঠিয়ালরা ভারতীয় বণিকদের কাছ থেকে ধার নিতে বাধ্য হতো চড়া সুদে। অবশ্য দাদনী প্রথার ফলে ধারে আসল ব্যয় কমে যায় কারণ মালের যোগান প্রত্যাশিত ও নিরাপদ হয়ে যেত। মোট কথা, মুঘল ভারতের কারিগরি উৎপাদনে পুঁজির গুরুত্ব বেশি নয়। অন্যদিকে যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষ এই প্রথার ওপর বিশেষ ছাপ ফেলে নি। গুজরাটের দুর্ভিক্ষের পর বা মুর্শিদাবাদের সপ্তদশ শতকের শেষে শোভা সিংহের বিদ্রোহ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মারাঠাদের আক্রমণেও বস্ত্রশিল্পের বিশেষ ক্ষতি হয় নি। এ-সব ঘটনার কিছুদিন পর পরই আবার সেই পুরোনো অবস্থাই ফিরে এসেছিল।

মুঘল ভারতের কারিগরি শিল্পে উৎপাদন পৃথিবীর বিস্ময় হলেও সমকালীন প্রযুক্তিবিদ্যা ও কলাকৌশল মুঘল ভারতে খুবই সরল ও নিম্নমানের ছিল। তাঁতে উন্নত কোনো যন্ত্র ছিল না। জাহাজে এস্ট্রোল্যাব ছাড়া আর কোনো যন্ত্র নেই, এমন কি বিখ্যাত মুঘল প্রাসাদ ও সৌধ নির্মাণের যন্ত্রও অতি সরল। চীন ও ইরাণে যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হতো, সেগুলোও চালানোর কোনো চেষ্টা মুঘল ভারতে হয় নি। ছাপার যন্ত্র পর্তুগিজরা সুরাটে বসানোর চেষ্টা করলে, নানা প্রতিবাদে সে চেষ্টা

বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা যে দেখা দেয় নি একথা সহজেই স্বীকার করে নেওয়া যায়। কারণ মানুষের অর্থাৎ মনুষ্য-শ্রম দিয়ে যে কাজ করা যায়, যন্ত্র দিয়ে সে কাজ করা হতো না।

কতকগুলি ক্ষেত্রে অবশ্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে পৃথিবীর সব থেকে ভারী কামান তৈরি হচ্ছিল, প্রধানত ব্রোঞ্জের ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা *মালিক ময়দান* এই ধরণের কামান। এছাড়াও ছিল হালকা কামান। এগুলি লোহার এবং লোহার কাজ তখনও উন্নত হয় নি। বার্নিয়ার অবশ্য হাত বন্দুকের প্রশংসা করেছেন। ষোড়শ শতকের মুঘল কারখানায় বিভিন্ন ধরণের বন্দুক তৈরি হতো যার মধ্যে চকমকি ও গাদা বন্দুক দুই-ই ছিল। এ-সব ছাড়া কারুশিল্পে মুঘল ভারত অসাধারণ উন্নতি করেছিল যা সর্বজনবিদিত।

সুতরাং ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা যে একেবারে ওই নিশ্চল হয়েছিল একথাও মেনে নেওয়া যায় না। একাধিক ক্ষেত্রে ভারতীয় কারিগররা নতুন কলা-কৌশল গ্রহণ করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ইওরোপীয় ধরণের জাহাজ তৈরি, এই নতুন কলা-কৌশল গ্রহণ করার নিদর্শন। ইংরাজ-পর্যটক ওভিংটন সুরাটের জাহাজ তৈরির ছুতোরদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড থেকে আসা যে কোনো জাহাজের চেয়ে ভালো আকারের জাহাজ তৈরি করতে পারে। অস্ত্র তৈরিতে ইওরোপীয় কারিগরদের যেমন আনা হয়েছিল, তেমনি রেশম তৈরিতেও কাশিমবাজারে ইওরোপীয় কারিগর কিছু এসেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে নানা রঙ এর ছাপ দেওয়ার জন্য কাঠের ছাপ তৈরি করা হয়েছিল যেটা তখনকার দিনে নতুন। সব ছাড়িয়ে যেটা চোখে পড়ে সেটা হলো, কারিগরদের নৈপুণ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে দর্জিরা ইওরোপীয়ান মহিলা ও পুরুষদের জন্য পোশাক তৈরি করত, এ কথা ওভিংটন বলেছেন। কিন্তু তা-সত্ত্বেও সস্তায় ঢালাও মাল তৈরি করার ব্যাপারটাই এ-সময়ে ভারতীয় কারিগরদের কাছে ছিল না ফলে লগ্নি ফেরৎ আসতে সময় লেগে যেত। এটাও মনে রাখতে হবে যে, ওই পুরানো ও পরিবারভিত্তিক কারিগরি ব্যবস্থা প্রায় দশকোটি লোকের, সম্ভ্রান্ত অভিজাত ও মুঘল প্রাসাদের বিলাসবহুল চাহিদা মিটিয়ে ফেলত এবং সে প্রথাকে কোনোভাবেই পশ্চাৎমুখী চাহিদা বলা যাবে না। ঐ প্রযুক্তিবিদ্যা বহু বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল এবং ক্রমবর্ধমান বিদেশী বাজার ও বিশাল আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটাতেও সক্ষম হয়েছিল। যেহেতু শ্রমিক কারিগর প্রচুর সংখ্যায় ছিল এবং তাদের মজুরি ছিল অত্যন্ত কম সুতরাং শ্রম বাঁচানোর জন্য কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন নেই।

একই ধরণের মাল তৈরি করার অন্তরায় ছিল বাজারের বিশেষ ধরণের চাহিদার, যেটা জোগানের জন্য বিশেষ ধরণের কারিগরি বিদ্যার প্রয়োজন ছিল, এর ফলে বহু ধরণের জাত ছিল যারা ঐ বিশেষ ধরণের কাজ করত। শুধু ইওরোপের বাজার নয়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাজারও ঐ বিশেষ ধরণের মাল চাইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওরমে বলেছেন এমন একটা বিশেষ ধরণের কাপড়ের কথা যেটি বাংলার একটি মাত্র গ্রামে তৈরি হতো। পেলসার্ট লিখেছেন, ইওরোপে যেটা একজন লোক করে,

সেটা এখানে চার হাতের মধ্যে দিয়ে যায়। এর ফলে যন্ত্রের প্রয়োজনই শুধু কমে যাচ্ছে তাই নয়, উৎপাদন পদ্ধতির বদলও সহজে হচ্ছে না। উত্তরাধিকার সূত্রে কাজ করার প্রথা এই ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করেছে এবং সেটা মুসলমান কারিগরদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি পার্শীরাও এর বাইরে (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) যেতে পারে নি। কারিগররা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে চাইত না– খুব বেশি হলে শহরতলীতে বা বাজারের কাছেই বসতি স্থাপন করত। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে ; সিন্ধু থেকে তাঁতিরা বোম্বাই গিয়েছিল এমন নিদর্শনও আছে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজদের শহরগুলি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং রাজনৈতিক গোলমালের জন্য খাম্বাজ ছেড়ে তাঁতিরা বোম্বাই গিয়েছিল, এর পরিষ্কার প্রমাণ না থাকলেও অনুমান করা কঠিন নয়। পরম্পরা বজায় রাখতে এই কারিগররা যে সচেষ্ট ছিল এর বহু প্রমাণ আছে।

ওভিংটন বলেছেন যে, ছাপাখানা বসানোর বিরোধিতা করা হয়েছিল প্রধানত নকলকারদের চাকরি বাঁচানোর জন্য। ১৬৭২ সালে কামানের গোলা বহুসংখ্যায় তৈরি করার চেষ্টা ওলন্দাজরা করলে করমণ্ডলের শাসনকর্তারা বাধা দেন। যেহেতু বণিক বা আভিজাতরা উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। সুতরাং একমাত্র কারিগররাই উৎপাদন প্রথার বদল করতে পারে। কিন্তু এই বদলের মধ্যে ঝুঁকি আছে। সাধারণ কারিগর এই পরিবর্তনে উৎসাহিত হবে না, এটা দেখি যখন ইওরোপের কোম্পানির দাদন নিয়ে মাল তৈরি করার জন্য তাঁতিরা তাঁত-এর মাপ অত্যন্ত অনিচ্ছাসহকারে বদলাচ্ছিল। এছাড়া কারিগররা বাইরে থেকে স্বাধীন হলেও আসলে তার অবস্থা দাসের সমান। অত্যন্ত দারিদ্রের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে, শ্রমের সঠিক মূল্য না পেয়ে এই গরীব ও সহায়সম্বলহীন কারিগররা আভিজাতদের সম্পূর্ণ অধীন হয়ে পড়ত। বণিকের দালালরাও তাদের নানাভাবে ফাঁকি দিয়ে চলেছে। ইওরোপীয় কারিগরের মতো ভারতীয় কারিগররা কোনো সম্পদ তৈরি করতে পারছে না যার থেকে তারা শহরে জমি বা বাড়ি কিনতে পারে। এই অবস্থায় বেঁচে থাকার লড়াই তার কাছে সবথেকে বড় ভাবনা, কতটা লাভ হবে সে চিন্তা পরের। সুতরাং উৎপাদন প্রথার পরিবর্তন করতে পারে কেবল বণিক বা রাষ্ট্র। অন্তত জাহাজী কারখানায় বা অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে আমরা এই ধরণের পরিবর্তন হতে দেখি কেবল এদের দ্বারাই।

মুঘল ভারতে বহুলোক নিযুক্ত ছিল নানান ধরনের কাজ করে দেওয়ার জন্য। মোরল্যাণ্ড এদেরকে ভোগী শ্রেণীর মধ্যে ধরেছেন। কারণ এরা উৎপাদন করে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে– অর্থাৎ জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ উৎপাদন না করার জন্য এবং উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল থাকার জন্য মোরল্যাণ্ড এই ধরণের অর্থনীতিকে পশ্চাৎমুখী বলে অভিহিত করেছেন। এটা অবশ্য মানতে হবে যে, ক্রমবর্ধমান মুঘল রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে খুব বেশিসংখ্যক মানুষের কাজের চাহিদা তৈরি করে দিচ্ছে। রাষ্ট্রের প্রধান সম্পদ অল্প সংখ্যক লোকের হাতে চলে যাওয়ায় তারা

উন্নতমানের ও সংহতি পূর্ণ কাজের প্রয়োজন তৈরি করছে। মজুর ও ক্ষেতের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি থাকায় খুব সস্তায় মজুর পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে সুরাট শহরে দাস ও চাকর সস্তায় প্রচুর পাওয়া যেত। বলা বাহুল্য, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন থেকে এরা সরে এলেও উৎপাদনের কোনো ক্ষতি হয় নি।

মুঘল রাষ্ট্রের বিরাট শাসনযন্ত্রে মনসব্‌দার ও জায়গীরদাররা প্রধানত রাজস্ব সংগ্রহ করে সরকারের মাধ্যমে সেটির অংশ বেতন হিসাবে নিত। জমিদাররা ক্রমশ মনসব্‌দারদের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যাচ্ছিল যাদের *ওয়াতন জায়গীর* বলে ধরা হতো, এটাকে ঠিক সমকালীন ইওরোপীয় সামন্তপ্রথার সঙ্গে তুলনীয় বলা যাবে না। এই শ্রেণীকে শুধু ভোগী শ্রেণীও বলা যাবে না– কারণ এরা শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রয়োগ করে আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিল যার ফলে উৎপাদন বেড়েছিল ও বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল।

এদের নিচের তলায় যেসব আমলা ছিল তাদের আয় কম ছিল বলে ধরা হয়। বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, মনসবদারদের বা জমিদারদের কাছারিতে যে সব আমলা কাজ করত, তাদের আয় তখনকার কালের তুলনায় বেশ বেশি ছিল। অধ্যাপক ইকতাদার আলম খান এদের ওপর গবেষণা করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের একটা চিত্র দিয়েছেন যার ইঙ্গিত বহুপূর্বে স্মিথ সাহেব দিয়েছিলেন। অধ্যাপক আলম দেখাচ্ছেন যে, এদের বেতন কম হলেও নানারকম উপার্জন এদের ছিল। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ এগারো জন আমলার কাছ থেকে তিরিশ লক্ষ-রও বেশি টাকা নিয়েছিলেন। এর মধ্যে দু-লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা আলিসার মুহুরিরা দিয়েছিল, যাদের মাহিনা খুব বেশি হলে মাসে সতের টাকা। এই ছোটো আমলাদের নিয়োগ করা হতো হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায় থেকে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পদ করেছিল এবং এদের ওপর রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগতভাবে মনসবদার, জমিদার ও বণিকরা নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এরা সবরকমভাবে ওদের ওপরওয়ালার অধীন এবং তাদের মর্জি মেনে কাজ করতে বাধ্য হতো। আবদুল কাদের বাদাওনি বলেছেন যে, রাজা টোডরমল্ল যেভাবে কারেরীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন যার ফলে অনেক ভালো লোক মারা যায়। সুতরাং ইওরোপের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান মুঘল ভারতে হয় নি। ফলে রাজনৈতিকভাবে এদের গুরুত্ব কম।

বার্নিয়ারের একটি মন্তব্যর ওপর ভিত্তি করে মোরল্যাণ্ড বলছেন যে, পেশাগত কাজের কোনো চাহিদা ছিল না। এর মধ্যে তিনি বাংলা সম্পর্কে বলেছেন, এখানে কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নেই। শিক্ষকরা ব্যক্তিগতভাবে বাড়িতে কয়েকটি ছাত্র নিয়ে পড়াতেন যার মধ্যে ভালো ছাত্রের জন্য কোনো সম্মান অপেক্ষা করছে না। ইওরোপের তুলনায় মুঘল ভারতে পেশাগত চাহিদা কম ছিল, এটা স্বীকার করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

বার্নিয়ারের এই বক্তব্যের সবটা মানা কঠিন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নবদ্বীপ লেখাপড়ার জন্য বিখ্যাত ছিল বলে সমকালীন বৈষ্ণব কবিদের লেখায় পাওয়া

যায়। নিজেদের বাড়িতে পড়ানো ছাড়াও পণ্ডিতরা চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্র পড়াতেন। মুসলমান ছাত্রদের জন্যও এই ধরণের পড়ানোর ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল।

এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে পেশাগত শ্রেণীর যে চাহিদা বিশাল ছিল বা আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব ছিল এটা অস্বীকার করা যায় না। এটা নিশ্চিত যে, তাদের জীবনধারণের সংস্থান আসত রাজা, আভিজাত বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে। এই শ্রেণীর মধ্যে আমরা কবি, চিত্রকর, হাকিম বা কবিরাজ ইত্যাদিদের পাই। সপ্তদশ শতাব্দীর পর্যটক তাভারনিয়ার বাজারের মধ্যে বা রাস্তার মোড়ে চিকিৎসক দেখেছেন, যারা টাকা নিয়ে ওষুধ দিচ্ছে। ফ্রায়ার বলেছেন যে, এরা ওষুধের দামের মধ্যেই তাদের পেশার টাকা ধরে নিত। এই ধরণের লোক বিভিন্ন শহরে দেখা যেত। অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখা *মিরাত-ই আহমদী* তে বলা আছে যে, আমেদাবাদের সরকারি হাসপাতালে দুজন করে চিকিৎসক ছিলেন। বাংলার চিকিৎসক বা শিক্ষকরা রাজকীয় ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর খুব একটা নির্ভরশীল ছিলেন না। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিদের লেখায় পাওয়া যাচ্ছে, নবদ্বীপের এক একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক প্রায় এক-শ করে ছাত্র পড়াতেন এবং তাদের টাকায় সংসার চালাতেন। শিক্ষকদের বাড়িতে বা চণ্ডীমণ্ডপে শিক্ষা দেওয়া হতো প্রধানত সকালে ও বিকালে। আবার এদের মধ্যেও কেউ কেউ বিত্তবান ছিলেন একথা সমকালীন বৈষ্ণব লেখক বৃন্দাবন দাস লিখেছেন। বেনারসের এক পণ্ডিতকে সম্রাট শাহজাহান বছরে দু-হাজার টাকা দিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে পুর্ণিয়ার নবাবের বাড়ির খরচার মধ্যে গৃহশিক্ষক বছরে এক-শ টাকাও পাচ্ছে না এটাও পাওয়া যায়।

এদের থেকে আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিচুতে ছিল মোল্লা, গণৎকার, পূজারী ব্রাহ্মণ, ঘটক ইত্যাদি। কিন্তু রাজনুগ্রহে যারা ছিলেন তাঁরা যে সবাই সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে আসতেন এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। আকবরের সভায় অন্তত তিনজন কবি ছিলেন যারা শস্য-ব্যবসায়ী, অস্ত্র তৈরির কারিগর ও মাহুতের ছেলে। এছাড়াও একদল ছিল— যারা পেশায় মনোরঞ্জনকারী। এদের মধ্যে পাওয়া যায় যাদুকর, শারীরিক কসরৎ বা খেলা দেখানোর লোক, আতসবাজীর কারিগর, নাচুনি, সাপুড়ে ইত্যাদি। *কালাওয়ান্ত* বা গায়ক শহর জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন পরবে ও উৎসবে এদের উপস্থিতি আবশ্যক ছিল। নাচুনি ও বারবণিতার মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট। তবে বারবণিতারা যে প্রায় সব বড় শহরে ছিল এটা নিশ্চিত। লাহোরে এ-ধরণের দু-হাজার বাড়ি ছিল যেখান থেকে কোতয়াল সাপ্তাহিক কর আদায় করত। মোরল্যাণ্ড সাধু, সন্ন্যাসী বা ফকিরদের পরাগাছা বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, ইওরোপের গির্জাতে যাদুকর যে ধরণের কাজ করত, মুঘল ভারতে খুব কম খরচে প্রধানত গ্রামাঞ্চলে এরা সেই ধরণের কাজ করতেন। জনসাধারণই এদের জীবনধারণের ব্যয়ভার বহন করতেন সেটা আমাদের মনে রাখা উচিত। সেদিক থেকে এরাও সমাজের একটা অঙ্গ, যদিও এরা নিজেদেরকে সমাজের বাইরে বলে মনে করত। এমনকি ছোটো শহরগুলিতে ধর্মমতের প্রবল প্রতাপ ছিল, নবদ্বীপে

শ্রীচৈতন্যর উত্থান ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিরোধ এটা পরিষ্কার করে দেয়।

সম্রাট, মনসবদার, জমিদার সবাই সৈন্য রাখতেন। ফলে সৈন্যদের একটা বিশাল সংখ্যা ছিল যারা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নয়। সমগ্র ভারতের হিসাব করে মোরল্যাণ্ড এদের সংখ্যা ধরেছেন দশ লক্ষ-র কাছাকাছি। যদি সমগ্র জনসংখ্যা দশ কোটি বলে ধরা হয়, তাহলে ঐ সংখ্যার ওপর কেবল সাবালক পুরুষেরাই সৈন্য হতে পারতেন। এই সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা চার ভাগ বলে ধরা যায়। মধ্যবিত্ত পেশাগত শ্রেণীর লোকদের থেকে এদের আয় কম বলে ধরা যায় না। যেখানে একজন কুস্তিগীরের মাসিক আয় দু-টাকার মতো, সেখানে এক ঘোড়সওয়ারের মাসিক বেতন পনের টাকার কাছে। কিন্তু সৈন্যদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব পরিষ্কার করে বলা কঠিন যখন দেখি তার মাহিনা আহ্‌মেদাবাদের হাসপাতালের চিকিৎসকের সমান। মুঘল সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখতে সৈন্য অপরিহার্য এবং ঐ দিক থেকে তার অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে।

অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অপরিহার্য ছিল বহুসংখ্যক দাস-দাসী আর চাকর-বাকর। এদের যে শুধু বিশেষ বিশেষ ধরণের কাজ ছিল তাই নয়, বাইরের লোকের কাছে ঐ সংখ্যাটা দেখানোর মধ্যেই ছিল নিজেদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের ইঙ্গিত। শুধু যে অভিজাতরাই এই ধরণের দাস-দাসী রাখত তাই নয়, সাধারণ লোকরাও দাস-দাসী রাখার চেষ্টা করত। দাস-ব্যবসায় থাকলেও অবশ্য বেগার খাটানোর প্রথা পাওয়া যায়। অবশ্য চাকররা মাইনে পেত। সুতরাং তাদেরকে পরগাছা বলা যাবে না এবং তাদের কাজকে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই রাখা উচিত। চাকরদের মাইনে অবশ্য খুবই কম ছিল। পশ্চিম উপকূলে ১৬২০ সাল নাগাদ বিদেশী পর্যটকরা তাদের খাওয়া, জামাকাপড় ও মাইনে সমেত মাসে দশ শিলিং-এর মতো ধরেছেন। দাসরা শুধু চাল পেত। কাজের বিশেষত্ব এমনভাবে ভাগ করা ছিল যে, একজন চাকর অন্যজনের কাজ করত না। রাজপ্রাসাদেও এই বিশেষ কাজের ধরণ চরম পর্যায়ে গিয়েছিল। আকবরের হারেমে পাঁচ হাজার মহিলার প্রত্যেকের নিজেদের দাসদাসী ছিল। সম্রাটের তাঁবুতে দুই থেকে তিন হাজার চাকর ছিল। সৈন্যরা যুদ্ধে গেলে তাদের প্রত্যেকের জন্যে দুই থেকে তিন জন চাকর থাকত। এছাড়া সৈন্যদের সঙ্গে আরো বহু লোক ছিল যারা যুদ্ধ করত না। অভিজাতরাও এই ধরণের জীবনযাত্রা অনুসরণ করতেন। এছাড়া পিয়ন, কাহার, রক্ষী এবং হালালকার যারা শহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করত— তারা ছিল।

গ্রামাঞ্চলে নানা ধরণের লোক বিভিন্ন কাজ করত। এরা প্রধানত বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল পূজারী, নাপিত, ধোপা, ছুতোর ইত্যাদি। এরা হয় গ্রামীণ কাজের জন্য নির্দিষ্ট টাকা পেত অথবা নিষ্কর জমি ভোগ করত। কাজের বিনিময়ে শস্য পেত এরকম প্রথাও ছিল। এ-ধরণের লোকেরা, যার মধ্যে নিম্নতর শ্রেণীও আছে, শহরাঞ্চলেও পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম তার বর্ণনায় এদের কথা বলেছেন। প্রজারা ইনাম নিয়ে শহরে বসছে, কুম্ভকার হাঁড়ি

তৈরি করছে, তাঁতি ভূনি ধুতি বুনছে, মালী মালা তৈরি করছে এবং ফুলের পুঁটুলি নিয়ে বিভিন্ন নগরে যাচ্ছে, নাপিত আছে, মোদক মিষ্টি তৈরি করে নিজেই নগরে নগরে যাচ্ছে, গন্ধ বেনে ধূপ-ধুনো নিয়ে হাটে চলেছে, শঙ্খ বেনে শঙ্খ তৈরি করছে– সব জাত নিজের কাজ করছে ও নিজেরাই বিক্রি করছে। শহরের বাইরেও লোক বসছে। এদের মধ্যে আছে চণ্ডাল, ডোম ইত্যাদি যারা নিজেদের কাজের সঙ্গে অন্য জিনিসও বিক্রি করে। নগরের এক পাশে বারবধূরা বসে। মুকুন্দরামের রচনায় এদের দৈন্যর কথা নেই। কিন্তু এদের জীবনযাত্র যে উচ্চবিত্ত বা পেশাগত মধ্যবিত্তর মতো নয় সেটা পরিষ্কার।

একদিকে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ছে, অন্যদিকে রাষ্ট্র নানাধরণের বিশাল দূর্গ, সমাধি ইত্যাদি করছে যেখানে প্রচুর মজুর লাগে। ফলে আর্থিক ব্যবস্থায় একটা জোয়ার এসেছিল বলা যায়। কিন্তু এই জোয়ার কেবল একটা সরু খাত দিয়ে বয়ে চলেছিল। কৃষিতে যেমন নতুন দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে, মুঘল কারিগরদের হাতে সে-রকম কিছু ঘটে নি, বৈদেশিক বাণিজ্যের কিছু পরিবর্তন হলেও সেরকম কোনো পরিবর্তন হয় নি যার জন্য কারিগরদের পদ্ধতি বদলাতে হবে। নতুন চাহিদা মেটানোর জন্য পদ্ধতিগত কোনো পরিবর্তনের দরকার ছিল না, বণিকরাও দাদনীপ্রথার মাধ্যমে কাজ শুরু করলেও পরিবারভিত্তিক কারিগরকে নতুন কিছু করতে বলে নি, তাঁতের মাপ শুধু বদলাতে হয়েছে মাত্র। বণিকরা সেভাবে উৎপাদনের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে নি যার ফলে পুরোনো প্রথাই চলতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে দিন-মজুরি প্রথাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় যেখান থেকে উপনিবেশের অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি হয়েছে।

বৈদেশিক বাজারে মুঘল ভারতের একচেটিয়া প্রভাব থাকার ফলে মুঘল কারিগর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশেষ সম্মুখীন হয় নি। তাদের সহজ ও দীন জীবনযাত্রা। কম মজুরি ইত্যাদি মুঘল ভারতে মালের দাম কম রেখেছিল। ফলে বহু দূর থেকে জাহাজে মাল আনার খরচ সত্ত্বেও ভারতীয় মালের দাম অত্যন্ত কম ছিল, এই অবস্থায় বিদেশী বাণিজ্যের চাহিদা বাড়লেও পুরোনো পদ্ধতি টিকিয়ে রাখার ঝোঁক ছিল বণিক ও কারিগরদের। সুতরাং মুঘল ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শিল্পবিপ্লব আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ছিল বলা যায়।

ইওরোপ ও আমেরিকায় প্রাক-শিল্পবিপ্লবের আগে সীমাবদ্ধতা ছিল তার যাতায়াত ব্যবস্থায়। এশিয়ার বাজার বাড়লেও জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ছিল না ভোগ্যপণ্য কেনার। ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারের ছবিও এক, যদিও নতুন শহর বিন্যাসের ফলে চাহিদা বাড়ছে। শাসকশ্রেণী তার দুর্বার শক্তি নিয়ে এমনভাবে শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে যেখানে ভোগ্যপণ্য কেনার ক্ষমতা সাধারণের নেই। মধ্যবিত্তের সংখ্যা ইওরোপের তুলনায় মুঘল ভারতে খুবই কম। অভিজাতদের জীবনযাত্রার চাহিদা বিলাসদ্রব্যের জন্য, ফলে ক্রমশ বিশেষ বিশেষ কাজের অংশ বিশেষ ধরণের কারিগররা করেছে– যার ফলে তারা জনসাধারণের জন্য উৎপাদন করতে পারত না। এর ফলে

উৎপাদন একটা মাত্রার পর আর বাড়তে পারছে না এবং কারিগররা ছোটো ছোটো জাতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন পদ্ধতি বদলানোরও কোনো তাড়া নেই এবং কারিগরের গরিব অবস্থার ফলে তারা পদ্ধতি বদলানোর কোনো চেষ্টাও করে নি। মুঘল অভিজাতরা বিলাতি *খেলনা* পছন্দ করতেন, বিশেষত ঘড়ি। কিন্তু চীনা করিগরদের মতো ভারতীয় কারিগররা ঘড়ি খুলে দেখার কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে নি। ইওরোপের মতো মুঘল ভারতে কারিগররা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে আসে নি। বণিকদের সঙ্গে কারিগরদের সে-রকম কোনো সংঘাতও হয় নি। কিছু পরিবর্তন মুঘল ভারতে কারিগরি প্রথার মধ্যে হয়েছিল কিন্তু সেগুলি এত বিশাল নয় যে তাতে পরম্পরা ভেঙে নতুন প্রথা আসবে।

গ্রামীণ এবং শহুরে শিল্পের মধ্যেকার সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দাক্ষিণাত্যে জাতভিত্তিক গ্রামীণ শিল্প একই ধারায় চলছিল। গ্রামীণ কারিগর ও দাসদের সংখ্যা প্রধানত বারো বলে বলা হতো *বারা বালুতাদার* । এর মধ্যে ছুতোর, কুম্ভকার, মুচি, নাপিত, ধোপা, জ্যোতিষী, হিন্দু মন্দিরের পূজারী ইত্যাদিও রয়েছে।

এই বারোজন ছাড়া আরো বারোজন গ্রামীণ কারিগর ও দাস ছিল, যাদের বলা হতো *আলুতাদার* । এদের দেখা পাওয়া যেত প্রধানত বড় বড় গ্রামে। আর এদের মধ্যে রয়েছে লিঙ্গায়ত পুরুত, ভিস্তিবাহক, দর্জি, মালী, সঙ্গীতজ্ঞ, রক্ষী, বারুই (যারা পান বেচে) স্বর্ণকার বা ভাট ইত্যাদি।

পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের এই তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁত বোনা বা রং করা প্রধানত শহরের শিল্প। এমনকি তিলিকেও সব গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামের লোকেরা সাধারণত কাছের বাজার থেকে তেল কিনত। এই *বালুতাদার* ও *আলুতাদার*রা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল যদিও একই গ্রামে কাজের সময় মজুরির কোনো তারতম্য ছিল না। প্রথম শ্রেণীর কতকগুলি স্থায়ী অধিকার ছিল যাকে *ওয়াতন* বলা হতো। এদের অধিকাংশই গ্রামে নিষ্কর জমি ভোগ করত যা গ্রামীণ পঞ্চায়েত থেকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই ইনাম (নিষ্কর) জমি ওয়াতনের মধ্যে পড়ে এবং এরাই এটা চাষ করত। বহুদিন ব্যবহার না করলে ওয়াতন বিক্রি করা যেত।

কৃষকরা বালুতাদারদের কাজে নিযুক্ত করত জাজমানি প্রথার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারা গ্রামের কাজও করত। বছরে দুবার সমস্ত কৃষকদের কাছ থেকে তারা টাকা পেত। ঐ টাকা প্রতি ওয়াতন অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা থাকত। সাধারণত ঐ টাকা জিনিসপত্রে দেওয়া হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি গ্রামে ছুতোর, মুচি ও দড়ির কারিগর পেত দশ টাকা, কুম্ভকার পাঁচ টাকা এবং স্বর্ণকার আড়াই টাকা প্রতি ওয়াতন অনুযায়ী। এছাড়া গ্রামের মন্দিরে যা জমা পড়ছে, তার একটা অংশ এরা পেত।

এর থেকে এটা পরিষ্কার যে, কারিগররা বাজারের জন্য উৎপাদন করছে না, গ্রামীণ জীবনযাত্রা ঠিকমতো যাতে চলে তার জন্য করছে। কিন্তু তারা একই জাতের লোকদের কাছে বিক্রি করতে পারে বা শহরে চলে যেতে পারে। এছাড়াও অবসর

সময়ে কাছাকাছি বাজারের জন্য তারা কাজ করতে পারে। এর ফলে বাজারের জন্য আইনত কাজ করতে পারলেও কার্যত তা করা সম্ভব ছিল না।

নানবিধ কারণে দাক্ষিণাত্যের শহরগুলিতে বিভিন্ন রকম কারিগরি শিল্প গড়ে উঠেছিল। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল তাঁত ও রেশম বোনা। সারা সপ্তদশ শতাব্দী ধরেই আওরংবাদ বিখ্যাত ছিল সাদা তাঁতের ও রেশমের কাপড়ের জন্য। বুরহানপুর বিখ্যাত ছিল সাদা ও রঙিন কাপড়ের জন্য, যেগুলি আর্মেনীয় বণিকরা পারস্য, তুর্কি ও আরবদেশে রপ্তানি করত। ভারতের মধ্যে রঙিন কাপড় সব থেকে ভালো তৈরি হতো দাক্ষিণাত্যের শহরগুলিতে। এছাড়াও খুব ভালো ক্যালিকো কাপড় সস্তায় পাওয়া যেত। একটি বিশেষ ধরণের রং (বলা হত *চে*) পূর্ব দাক্ষিণাত্যে পাওয়া যেত এবং এটা রাজার একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। এ-ছাড়া ওয়ারাঙ্গাল ও মসুলিপত্তনে কার্পেট তৈরি হতো।

নিজামাবাদের কাছে ইন্দালয়িতে ছোরা, তরোয়াল, বর্শা ইত্যাদি তৈরি হতো। এগুলির জন্য লোহা আসত কাছের কালাঘাট পাহাড় থেকে। লোহা ও ইস্পাত শিল্প এ-রাজ্যে খুবই উন্নত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসী বণিক মার্তা এখানকার লোহা থেকে ইস্পাত তৈরি হতে দেখেছেন এবং ঐ ইস্পাত থেকে দামাস্কাসের বিখ্যাত তরোয়াল তৈরি হতো, এ-কথা বলেছেন। ঐ সময়ই ওলন্দাজরা তাদের কুঠিতে লোহা থেকে অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করার জন্য কারখানা তৈরি করেছিল। পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি শহরে ঐ ধরণের কারিগরি কাজ হতো যার মধ্যে চাউল শহরের কাপড়ের কাজ উল্লেখযোগ্য। জুনারে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে কাগজ তৈরি করা হতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে মারাঠারা পশ্চিম উপকূলে আধিপত্য বিস্তার করলে, পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে কারিগরি শিল্প আরো বাড়তে থাকে। কল্যাণে পিতলের কাজ, আওরংবাদে রেশম ও জরি করা কাগজের কাজ তৈরি হতে থাকে। পুণাতে সরকারি কারখানা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না।

গ্রামীণ কারিগরি ব্যবস্থার মতো শহরের শিল্পের কারিগরও জাত-এর ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল। মাঝে মাঝে বা কোনো কোনো জায়গায় কিছু বদল হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দর্জিদের একটি জাত রং করার কাজ শুরু করে। এ-প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য কোনো বদল হয় নি যার ফলে শিল্পের চাহিদার উত্থান-পতনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

কিন্তু মধ্যযুগের আহমেদাবাদ বা গুজরাটের অন্যান্য জায়গার মতো কারিগরি শিল্পের নেতা বা প্রধান অন্য জায়গায় ছিল কি-না সন্দেহ। মুসলমানরা আসার আগে কয়েকটি এই ধরণের শিল্পসংস্থা (Trade Guild) ছিল যাদের নেতা বা প্রধান প্রতিটি সদস্যর থেকে সরকারি কর সংগ্রহ করত। মুসলমানরা আসার পর কি অবস্থা হয়েছিল সেটা খুব পরিষ্কার নয়। আহমেদাবাদের গিল্ডের কাজ ও নগরশেঠ সম্পর্কে কিছু তথ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকে পাওয়া যায় যদিও ঐ ধরণের সংস্থা

বহু আগে থেকেই চলছিল। রাজনৈতিক পরিবর্তন ও অশান্তির ফলে যখন কারিগরি শিল্প বিপদে পড়েছে তখনকার অবস্থা সামলানোর জন্য নগরশেঠের প্রয়োজন হয়েছিল। কারিগর ও বণিকরা নিজেরা সভা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এটাও স্পষ্ট। ঐ সময় খাম্বাজ-এ হাতির দাঁতের কাজ করার শিল্পনেতার কথা পাওয়া যায় যিনি শহরের বড় আমলাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। বোম্বাইতে ইংরেজরা বিলাতের গিল্ডের নিয়মানুযায়ী আইন করে। কিন্তু পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে ঐ ধরণের গিল্ড বা সংস্থা ছিল না এটা স্পষ্ট।

শ্রমিক এবং কারিগরদের মজুরির পরিবর্তন নির্ভর করত অনেকখানি খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের ওপর এবং অনেকখানি কতজন মজুর বা কারিগর আছে তার ওপর। মধ্যযুগের দাক্ষিণাত্যে আমরা খুব বেশি তথ্য পাই না। ১৬৭৫-৭৬ সালে ইংরেজরা বোম্বাইতে কুলিদের দৈনিক মজুরি তিন পয়সা থেকে বাড়িয়ে ছয় পয়সা নির্দ্ধারণ করেছিল কারণ খাবার জিনিসের দাম বেড়েছিল। পূর্ব দাক্ষিণাত্যের মজুরি পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের থেকে কিছুটা বেশি ছিল। সাধারণ দৈনিক মজুরি আড়াই আনা বলে ধরা যায়। কোনো কোনো সময় চাহিদা বেড়ে গেলে ও কারিগর কম থাকলে মজুরি বেশি হয়ে যায়। খাম্বাজ শহরে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজরা পাথরের 'বীড' তৈরি করার কারিগর না পেয়ে মজুরি বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। মনে হয় এ-ধরণের অবস্থা আগেও ওখানে হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যের কয়েকটা বড় বড় শিল্পের কথা জানা যায় যেগুলি সাধারণ শহরের শিল্প থেকে পৃথক বলে ধরা যেতে পারে। এগুলির মধ্যে জাহাজ তৈরি, হীরকের খনি এবং রাজকীয় কারখানা রয়েছে।

মসুলিপত্তনের কাছে নরসপুরে সপ্তদশ শতাব্দীতে জাহাজ তৈরির কারখানা ছিল। ভালো কাঠ, লোহা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ওখানে পাওয়া যেত। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও পর্তুগিজরা জাহাজ তৈরি করত। কোনো কোনো জাহাজ ছ-শ টনের মতো বড় হতো। শিবাজী এই ধরণের জাহাজ ও নৌকা তৈরিতে খুবই উৎসাহ দিয়েছিলেন। ওঁর বড় নৌকাগুলি মালাবার উপত্যকা থেকে আরবের উপকূল এলাকার শহরগুলি পর্যন্ত বাণিজ্য করত।

কুতুবশাহী ও আদিলশাহী রাজত্বে হীরার খনি ছিল। রাওলকোণ্ডা ও কুলুরে এগুলি পাওয়া যেত। রাজার কাছ থেকে বণিকরা নির্দ্ধারিত অর্থের বিনিময়ে এই জমি ইজারা নিত। তাভারনিয়ার প্রায় তিরিশ হাজার শ্রমিকের কথা বলেছেন, যেটা খুব বেশি বলে মনে হয়। দশ ক্যারেটের বেশি বড় কোনো হীরা পাওয়া গেলে সেটা রাজার বলে ধরা হতো। কুলুর থেকেই বিখ্যাত কোহিনূর হীরা পাওয়া যায় যেটি এখন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। এই শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিল দুই পয়সা। সাধারণত এদেরকে অদক্ষ শ্রমিক বলে ধরা হতো।

দাক্ষিণাত্যে ও মুঘল ভারতের অন্যান্য জায়গায় ছিল বড় বড় কারখানা। সম্রাট এগুলো বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে বসাতেন। এগুলি অস্ত্রশস্ত্র, সম্রাট ও তার পরিবারের জামাকাপড়, জুতো, গহনা ইত্যাদি তৈরি করত। সম্রাট ও তার ওমরাহদের

জন্য ঐসব কারখানা থেকে প্রাসাদ ও বসতবাড়িও তৈরি হয়েছে। কিন্তু এগুলির কাজকর্ম থেকে সাধারণ শিল্পের উন্নতি কিছু বোঝা যায় না। শুধু কি পরিমাণ দক্ষতা বা সংহতি ছিল সেটা বোঝা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠা সরকারের অনেকগুলি কারখানাতে বেগার শ্রমিক খাটানো হতো। বছরে সাধারণত আট দিন থেকে পনের দিন বিভিন্ন সরকারি বাড়ি তৈরি করার জন্য এই শ্রমিক ব্যবহার করা হতো। অন্যান্য কারিগরদের বছরে পনের দিন থেকে দুই মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো কখনো এদের কিছু পরিমাণ টাকা বা শস্য দেওয়া হতো। ইংরেজরা পরবর্তীকালে স্বভাবতই ঐসব কারখানা বন্ধ করে দেয়।

৫
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

মুঘল ভারতের জনসাধারণের বিরাট অংশ গ্রামে বাস করত এবং সাধারণত গ্রামীণ উৎপাদনের ভিত্তিতে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাত। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অর্থনৈতিক জগতে একটা বিরাট জায়গা জুড়ে আছে। অর্থাৎ কোনো কোনো জায়গায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন হচ্ছে তো কোনো কোনো জায়গায় ঘাটতি উৎপাদন হচ্ছে।

গ্রামীণ বাজার এই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান জায়গা। বর্তমান কালের ঐতিহাসিক ভ্যান লিউর এশিয়ার বাজার ও ছোটো ছোটো বণিক ও ভ্রাম্যমান ব্যাপারীর কথা বলেছেন। সাম্প্রতিক কালে নিল স্টিনসগার্ড ঐ একই ধরণের কথা বলছেন। কিন্তু এদের বর্ণনা অত্যন্ত সরল এই অর্থে যে, গ্রামীণ বাজারের একটা অন্তর্নিহিত জটিলতা আছে। ছোটো ভ্রাম্যমান ব্যাপারী ছাড়াও বড় বণিকও ঐ বাজারে ছিল যাদের যোগাযোগ বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ছিল বলে ধরা যায়।

মুঘল ভারতের বাজারকে করেকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই বাজারগুলির বিভিন্ন স্তরভেদ আছে এবং প্রত্যেকটির মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে এটা মনে করা কষ্টকর।

গ্রামীণ বাজার প্রধানত গ্রামের কাছাকাছি সপ্তাহে কয়েক দিন বসত যেগুলোকে হাট বলা যায়। ইবন বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলার নদীপথে নৌকা করে যাওয়ার সময় বলেছিলেন যে, তিনি বাজারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। গৌড়ের ভগ্নদশা শুরু হবার পর ষষ্ঠদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশী পর্যটকরা ভাগীরথীর তীরে এরকম বহু হাটে সস্তায় জিনিস কিনেছেন যদিও সপ্তগ্রামের বাজার তখনও দীপ্তমান। সমকালীন কবি মুকুন্দরাম লিখেছেন যে, কিভাবে কারিগররা জিনিস তৈরি করে হাটে নিয়ে বিক্রি করত। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী পর্যটক তাভারনিয়ার বলেছেন যে, ছোটো গ্রামেও খাবার দাবার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ১৬৬০-এর দশকে ফরাসী বণিক মার্তা যখন সুরাট থেকে মসুলিপত্তনে আসেন, পথে তাঁর খাবার পেতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

হাটের ওপরের স্তরে ছিল মন্ডি বা বড় বাজার। ব্যাপারী বাণারসী দাস বলেছেন যে, জৌনপুরের বাহান্নটি পরগণার প্রত্যেকটিতে বাজার ও মন্ডি ছিল।

শহরের ও গ্রামের বাজারের সম্পর্ক আরো জটিল। অধিকাংশ শহরে একাধিক বাজার ছিল যার মধ্যে একটাকে প্রধান বাজার বলে ধরা হতো। সুরাট শহরে শুল্ক বিভাগের বাড়ি ও টাঁকশালের মধ্যে একটা কাপড়ের বাজার ছিল। এর পরে চওড়া পথের ধারে দু-পাশে দোকান ছিল ছোটখাটো জিনিস বিক্রির জন্য। তারপরে ছিল খাবারের বাজার। সুরাটের বড় বাজার ছিল শহরের দরওয়াজার বাইরে এবং ময়দানে

যাওয়ার মুখে ছিল ঘোড়া ও গবাদি পশুর বাজার। হুগলী ও সপ্তগ্রামের বাজারের কথা বিদেশী পর্যটকরা লিখেছেন। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে, বার বার সপ্তগ্রামের বাজার থেকে বণিকরা নৌকা ভর্তি করছেন, তার উল্লেখ আছে। এই বাজারের ভেতর দিয়ে যাতায়াত খুবই কঠিন ছিল। ওভিংটন বলেছেন, সুরাটের বাজারে এত বেশি লোক তাঁত বা রেশমের কাপড় বিক্রি করছে যে সেখান দিয়ে যাতায়াত করা অসম্ভব। গোয়াতে প্রতিদিন সকালে দাসরা তাদের প্রভুদের বিভিন্ন পণ্য নিয়ে বিক্রি করতে আসত। সুরাট বা আগ্রার বাজার সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকেরা ইজিপ্টের (মিশর) সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ কেউ পার্থিব স্বর্গ বলে বলেছেন— পৃথিবীর সব কিছু এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু শহরের বাজারের অধিকাংশ জিনিসই ছিল অন্যান্য জায়গার। এসব বাজারের মালপত্র স্থানীয় লোকেদের চাহিদা মেটাত শুধু তাই নয়, দূর বাণিজ্যের বণিকরাও আসত জিনিস কিনতে।

স্থানীয় বাণিজ্যের একটা বড় অংগ হচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে জিনিস আসা। গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অবশ্যই সম্পূর্ণ ছিল না এবং এটা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, কয়েকটি গ্রামের মধ্যে বিনিময় প্রথা চালু ছিল। এর পক্ষে অবশ্য সরাসরি নিদর্শন পাওয়া শক্ত। এই ধরণের জিনিসের মধ্যে ছিল লবণ, মশলা এবং ধাতুর জিনিসপত্র, যেগুলি সবসময় স্থানীয়ভাবে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় মুঘল ভারতে গ্রামীণ বাজারের সংখ্যা কম ছিল এবং প্রধানত বিনিময় প্রথার মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা মেটাত।

গ্রাম থেকে গ্রামে বা শহরের বাণিজ্য আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের একটা রূপ। শহরের চারপাশের গ্রামগুলি প্রধানত শহরের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যার ফলে একটা শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নগদ টাকায় খাজনা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকার ফলে কৃষক বা কারিগরদের চেষ্টা ছিল উৎপন্ন পণ্য বিক্রি করার। এর ফলে বাজারের চাহিদার উঠানামার সঙ্গে উৎপাদনেরও গতি পাওয়া যায়। প্রায় প্রতিটি বড় শহরেই প্রচুর খাদ্য রয়েছে দেখতে পাই, যার অধিকাংশই শহরের বাইরের থেকে এসেছে। বোম্বাই-এর প্রায় ষাট হাজার লোকের জন্য বাইরে থেকে খাবার আনার নিদর্শন আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত খাম্বাজের চারপাশের গ্রামীণ এলাকা থেকে সুরাট ও বোম্বাই-এর ইংরেজদের জন্য গরুর মাংস পাঠানো হচ্ছে, এর প্রচুর নজির আছে। গুজরাটে ১৬৩০-এর দশকের দুর্ভিক্ষের মধ্যেও সম্রাটের সৈন্যদের জন্য বুরহানপুরের বাজারে সবরকম খাবার পাওয়া যাচ্ছিল। ১৬৭০ সালের পাটনার দুর্ভিক্ষের মধ্যেও নবাবের স্ত্রী-র গুদামে প্রচুর খাবার ছিল।

কাঁচামাল কয়েকটি জায়গায় পাওয়া যেত যেখান থেকে বণিকরা কিনত। কাপড়ের জন্য যা কাঁচামাল প্রয়োজন, সেগুলি পাওয়া যেত গ্রামাঞ্চলে। গুজরাটের বারোচ ও মাহমুদাবাদ সুতো তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। এখান থেকে অন্য জায়গায় সুতো চালান যেত। গুজরাটের কয়েকটা মন্ডি বিখ্যাত হয়ে ওঠে পাইকারী তুলোর বাজারের জন্য যার মধ্যে জাম্বুশর বড় হয়ে ওঠে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। কাশ্মীর ও গুজরাটে

কাঠের গোলা ছিল। কাশিমবাজারের কাছে শেরপুরে দড়ি পাওয়া যেত।

এর ফলে কয়েকটি শহর বিখ্যাত হয়ে ওঠে কয়েকটি জিনিসের জন্য। এগুলি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পসরা হিসাবে বিক্রি হতো। বেলগাঁও ও গোয়া দুর্মূল্য পাথরের জন্য বিখ্যাত ছিল। ওমরাহদের অত্যাচারের কথা পেলেও কয়েকটি জায়গায় স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য ও উৎসাহের কথা পাই। আহমেদাবাদের শহরতলীতে কারিগরদের জন্য স্থানীয় প্রশাসন সুরাট থেকে সুগন্ধী ও ওষুধ আমদানির ওপর কোনো আবগারি শুল্ক নিতেন না। মালদা শহরে প্রচুর পরিমাণে যে সমস্ত দ্রব্য তৈরি হতো, সেগুলি আশপাশের শহরে চালান যেত। ফলে মালদায় ইংরাজরা কুঠি তৈরি করে। আশেপাশের বণিকরাও এখানে ভিড় জমায়। মসুলিপত্তনম ও অন্যান্য জায়গা থেকে বণিকরা কৃষ্ণা জেলার ভেলাপেলামে ক্যালিকো নেবার জন্য যেত। এর থেকে সহজেই বলা যায় যে, হুগলী বা মসুলিপত্তনের মতো বন্দর শহরের বিরাট পশ্চাৎভূমি ছিল। হুগলিতে আসত উড়িষ্যা, পাটনা ও বাংলার বিভিন্ন জিনিস যেগুলি হুগলির প্রধান বাজারে প্রতিদিনই বিক্রি হতো। এগুলি অধিকাংশই ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য।

এটা বলা ঠিক হবে না যে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রধানত আধা বিলাসব্যসনের পণ্যের বাণিজ্য। স্থলপথে মাল নেবার খরচ বেশি হওয়া সত্ত্বেও কাপড় ও খাবারের জিনিসের বাণিজ্য বেশ বেশি ছিল বলে মনে হয়। জলপথে সে-তুলনায় অনেক সস্তা এবং বড় বড় নদী ধরে এই বাণিজ্য চলত। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বড় অংশ ছিল উপকূল ধরে। করমণ্ডল উপকূল থেকে তাদের নিজেদের পণ্য ও বিদেশ থেকে আনা বিলাসদ্রব্য যেত পশ্চিম উপকূলে, বিশেষত গুজরাটের বন্দরে। কিছু যেত স্থলপথে দাক্ষিণাত্যের ভেতর দিয়ে বুরহানপুর পর্যন্ত। গুজরাট থেকে ঐভাবেই বিলাসদ্রব্য, তাঁতের কাপড়, বিদেশীদ্রব্য যেত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। এর বদলে গুজরাটে আসত প্রধানত খাদ্যদ্রব্য ও তার কারিগরি শিল্পের কাঁচা মাল। উপকূল ধরেই এই ধরণের বাণিজ্য বেড়ে উঠেছিল। উত্তর ভারত প্রধানত আমদানি এবং রপ্তানি করত লবণ, নীল, খাদ্যদ্রব্য ও কাশ্মীরের বিলাসদ্রব্য। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সপ্তনদীর তীরে মূলত সিন্ধু নদীর জন্য একটা নিজস্ব বাণিজ্যিক এলাকা গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ বহুদিনের পুরোনো বাণিজ্যিক পথ কাবুল-কান্দাহার হয়ে চলে গিয়েছিল মধ্য এশিয়াতে।

এক জায়গায় খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি ও অন্য জায়গায় উদ্বৃত্ত হওয়ার ফলে খাদ্যদ্রব্যের বাণিজ্য সব সময়ই ছিল। বাংলা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করার ফলে এর বাণিজ্য বড় ছিল। ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড বলেছেন যে, বাংলার জিনিসের দাম কম হওয়ার কারণ ছিল মুদ্রার অভাব। এ যুক্তি মানা যায় না কারণ চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই বাংলার জিনিসের দাম কম সে-কথা বিদেশী পর্যটকরা বলেছেন। যেখানে বহির্বাণিজ্য এত উন্নত সেখানে এই কম দাম থেকে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, উৎপাদন ছিল স্থানীয় চাহিদার থেকে বেশি। এই উৎপাদনের কথাও বিভিন্ন পর্যটক

বলে গেছেন। বাংলার চাল গঙ্গাপথে পাটনা দিয়ে আগ্রা, দক্ষিণে করমণ্ডল উপকূলে ও উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে কেরলে পৌঁছত। বিহার ও মালব থেকে গম যেত দিল্লি ও আগ্রায়। মোরাদাবাদ ও সিরহিন্দ থেকে মিহি চাল যেত লাহোরে। খাদ্যদ্রব্য বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হলো উদ্বৃত্ত অংশের রপ্তানি। বাংলা ও উড়িষ্যার চাল করমণ্ডলে যেত কারণ এটা দামে সস্তা। হয়ত মুসলিমপত্তন হয়ে এই চাল যেত দক্ষিণ করমণ্ডলে, যেখানে ঘাটতি ছিল। পাটনায়ও বাংলার যে চাল যেত সেটা বোধ হয় বিশেষ ধরণের। খাদ্যদ্রব্য প্রধানত যেত গুজরাটে যেখানে খাদ্যের ঘাটতি ছিল। মালব ও রাজপুতানা থেকে গম ও অন্যান্য সস্তা দামের শস্য যেত গুজরাটে। দাক্ষিণাত্য থেকে সমুদ্র পথে আসত চাল। খাদ্যদ্রব্যের বাণিজ্যের মধ্যে ছিল মাখন ও তেল। বাংলার মাখন এত সস্তা ছিল যে, জলপথে এটা বহু জায়গায় যেত। থাট্টা বন্দর দিয়ে মাখন রপ্তানি হতো। উড়িষ্যার থেকে তেল রপ্তানি হতো যার ফলে ইংরাজদের দলিলে ঐ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম হয়ে যায় জিঞ্জেলী। দিল্লির বাজারের সব থেকে ভালো আম আসত বাংলা, গোলকুণ্ডা ও গোয়া থেকে। চাল ছাড়া বাংলার প্রধান রপ্তানি ছিল চিনি যা বহু শতাব্দী ধরে জলপথে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেত। মুলতানে চিনি খুব ভালো হতো এবং জলপথে যেত থাট্টা ও লাহোরে। আগ্রা থেকে জলপথে বাংলায় প্রতিবছর আসত রাজপুতানার লবণ যদিও মুকুন্দরামের লেখা থেকে মনে হয় যে, কিছু লবণ স্থানীয়ভাবে তৈরি হতো। বৈষ্ণব কবিদের লেখায় বাংলার বাইরে থেকে কি কি জিনিস আসত তার একটা তালিকা পাওয়া যায়। পাহাড় থেকে কাটা নুন লাহোর দিয়ে বাইরে যেত।

কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের বাণিজ্য ছিল সেটা এখন বলা শক্ত। মানরিক বলছেন যে, বাংলার বিভিন্ন বন্দরে প্রতি বছর এক-শ নৌকা মাল বোঝাই হতো। বাংলার সমকালীন মঙ্গল কবিদের রচনার প্রধান আখ্যান ছিল উপকূল এলাকার বাণিজ্য। এগুলিকে শুধু কবিকল্পনা বলা ঠিক হবে না। ভারতের অভ্যন্তরে স্থলপথে বাঞ্জারা বারো থেকে ষোল হাজার বলদে করে সারা বছর মাল বিক্রি করে বেড়াত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এরকম একটা দলে প্রায় আড়াই হাজার টন মাল ছিল বলে জানা যায়। সৈন্যদের সঙ্গে এরাও খাবার দাবার নিয়ে ভ্রাম্যমান বাজার তৈরি করে চলত। পর্যটক পিটার মুণ্ডি বুরহানপুরের কাছে এ-রকম একটা দলকে দেখেছিলেন। মার্তাও এই ধরণের একটি বড় দলকে লবণ নিয়ে যেতে দেখেছিলেন।

ইওরোপীয় কোম্পানির দলিল থেকে দেখা যায় যে, তারা যে-পরিমাণ কাপড় সংগ্রহ করত সেটা মোট বাণিজ্যের অল্প একটি অংশ। বড় অংশটি নিত ভারতীয় ও এশীয় বণিকরা, যারা এগুলি ভারতের বিভিন্ন অংশে পাঠাত, এবং স্থলপথে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় পাঠাত। এর থেকে বোঝা যায়, বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য এই কাপড় সংগ্রহ হতো না, বড় অংশ স্থায়ীভাবে বিক্রি হতো। দেশের কোনো না কোনো অংশে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাপড় তৈরি হতো। দামও ছিল বিভিন্ন রকমের এবং বলা বাহুল্য বাজারও ছিল আলাদা। লাহোরে সব থেকে মোটা ও সস্তা কাপড়

উৎপাদন হতো। বাফতা ছিল দু-টাকা থেকে চল্লিশ টাকা প্রতি খণ্ড। ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ার বলেছেন যে, সিরোঞ্জের চিজ পারস্য ও তুর্কির সব লোকই ব্যবহার করত। সমকালীন পর্যটক বার্নিয়ার বলেছেন যে, বাংলার তাঁত ও রেশমের গুদাম ছিল শুধু মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য নয়, আশপাশের রাজ্যগুলোর জন্যও। বাংলা থেকে পাঠান ব্যাপারী পাগড়ির কাপড় কিনত বছরে আড়াই লাখ টাকার মতো। বাংলাতে আসত বুরহানপুরের খুব কাপড়। মুলতানের সঙ্গে সিন্ধু নদীর সংযোগকারী খাল মজে যাওয়ার ফলে বাণিজ্য স্থলপথে চলতে থাকে। কিন্তু স্থলপথে সুরাট পর্যন্ত মাল নেওয়া ব্যয়সাপেক্ষ বলে ব্যবসা খুব কমে যায়। এর ফলে মুলতানের কারিগরি শিল্প মার খায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, কাঁচামালের বাণিজ্যও বেশ বড় ছিল। গুজরাটের রেশম শিল্প বাংলার কাঁচা রেশমের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বাংলার কাঁচা রেশম আগ্রাতেও যেত যেখান থেকে এগুলি পাঠানো হতো পারস্য ও তুর্কিতে। বছরে এর পরিমাণ প্রায় তিরিশ হাজার বাণ্ডিল হতো বলে ধরা হয়। উত্তর ভারতের ব্যাপারীরা এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। এমন কি ওলন্দাজরাও কাশিমবাজার থেকে যথেচ্ছ পরিমাণ রেশম পায় নি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে। ওলন্দাজরা বাংলার নীলও মসুলিপত্তনে পাঠাত বিদেশে রপ্তানির জন্য এবং এর মূল্য প্রায় একলাখ টাকার মতো হবে। কিছু খনিজ দ্রব্য কয়েকটি জায়গায় পাওয়া যেত এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি হতো। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া শক্ত। মুঘল ভারত লোহা উৎপাদনে স্বনির্ভর ছিল এবং গোয়ালিয়রের লোহা থেকে তৈরি জিনিসপত্র মুঘল ভারতের শহরের চাহিদা মেটাত। পাটনা এবং আগ্রায় সোরা তৈরি হতো। পাটনা থেকে জলপথে এটি আসত বাংলায় যেটা ছিল রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র। সতের শতকের শেষে ফরাসিরা বছরে প্রায় পাঁচহাজার মণ সোরা রপ্তানি করছিল।

মশলার ও অন্যান্য ফলের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ছিল বেশ বড় রকমের। নারকেল বা ঐ ধরণের ফল মালাবারী জাহাজে বা করমণ্ডলের চেট্টি বণিকরা পূর্ব-উপকূল এবং গুজরাটে নিয়ে যেত। বছরের একদিন গুজরাটে নারকেলের উৎসব হতো। মালাবার থেকে গুজরাটে যেত তাঁত, আফিম ও মশলা। ওলন্দাজরা একচেটিয়া বাণিজ্য শুরু করলে এই বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। সপ্তদশ শতক থেকে বুরহানপুরে প্রচুর তামাকের উৎপাদন হতে থাকে। বাংলাতে এই তামাক ও বিহারের আফিম আসতে থাকে। কাশ্মীরের বিখ্যাত শাল ও কাঠের কাজ ভারতের সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো। বাংলায় ভাগীরথীর তীরে গড়ে ওঠা ছোটো ছোটো শহরেও দক্ষিণদেশের জিনিসপত্র ও কাশ্মীরের দ্রব্য বিক্রি হতে থাকে বলে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। বাংলায় তুতিকোরিণ থেকে শাঁখ আসে যেগুলোয় কারুকাজ করে ভারতের বিভিন্ন অংশে পাঠানো হতো। বাংলার লাক্ষা গুজরাটের লাক্ষার কাজের প্রধান অঙ্গ ছিল। পালকি, খাটের পায়া, বাক্স ইত্যাদি কাঠের জিনিসে এই লাক্ষার প্রয়োজন হতো। এছাড়াও বাণিজ্যের অন্যান্য দ্রব্যর মধ্যে ছিল বিহারের সুগন্ধি মৃৎপাত্র,

গোয়ালিয়রের জাসমিন তেল, সাহাজাদপুরের কাগজ অথবা বাড়ি তৈরির জন্য রাজস্থানের গোলাপী মার্বেল পাথর। দাস ব্যবসায় খুব বিস্তৃত ছিল। বাংলায় আরাকানী পর্তুগিজরা জোর করে ক্রীতদাস ধরে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করত। মুঘল হারেমের খোজারা আধিকাংশই বাংলার ক্রীতদাস বলে পর্যটক পেলসার্ট বলেছেন।

জিনিসপত্রের মূল্যমান সম্পর্কে বিতর্ক আছে এবং এখনও চলছে। ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড বলেছেন যে, ১৬৬০ সাল পর্যন্ত জিনিসপত্রের দাম একভাবে ছিল। শুধু পরিবর্তন হয়েছিল রুপা ও তামার সম্পর্কের; কারণ রুপো অধিক পরিমাণে ভারতে আসায় রূপোর দাম পড়তে থাকে ও তামার দাম বাড়তে থাকে। এর ফলে জিনিসপত্রের দামও বাড়তে থাকে কারণ জিনিসপত্রের দাম রুপার ওপর নির্ভরশীল ছিল। একচেটিয়া বাণিজ্য করার ফলে কয়েকটি দ্রব্যের দাম বাড়ে যার মধ্যে লবঙ্গ অন্যতম।

মোরল্যাণ্ডের এই মত এখন আর গ্রহণ করা যায় না। হিন্দুস্থান, গুজরাট ও পাঞ্জাবে খাদ্যদ্রব্যের দাম যে বেড়েছিল সে-বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ আছে। অন্যদিকে মোরল্যাণ্ডের আর একটি মত হলো এই যে, অত্যধিক রুপো বাংলায় আসার ফলে বাংলার জিনিসপত্রর দাম বেড়ে উত্তর ভারতের কাছাকাছি চলে যায়– যা মানা যায় না। যেহেতু বাংলার খাদ্যের রপ্তানি চলতেই থাকে, অতএব বলা যেতে পারে– বাংলার খাদ্যদ্রব্যের দাম অন্যান্য জায়গার থেকে কম ছিল। বাংলার সুতো ও কাঁচা রেশমের দাম আঠার শতকের প্রথম পর্যন্ত বাড়ে নি। যদিও সোরার দাম শতকরা পঞ্চাশ ভাগের ওপর বেড়ে যায়। সতের শতকের শেষ দশকে চন্দননগর থেকে ফরাসি বণিকরা লিখছে যে, বাংলার কাপড়ের দাম কমে গেছে, যদিও দাম সাধারণত সেই বছরের উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে সোরার দাম বেড়েছিল যদিও ফরাসিরা এর জন্য নবাব বা তার অত্যাচারের দোষ দিয়েছে। সুতরাং প্রচুর পরিমাণে সোনা, রুপো আনলেই বা চাহিদা বাড়লেই যে দাম বাড়বে এরকম কোনো কথা নেই। বাণিজ্যের আয় নির্ভর করছে মাল জোগাড় করার খরচ ও তার বাজারের দামের ফারাকের মধ্যে– অতএব বলা যায় যে, রুপো বাংলায় বেশি এলেও মুদ্রাস্ফীতি হয় নি বা মাল জোগাড় করার খরচও বেশি বাড়ে নি। এই বাণিজ্যের আয়ের মধ্যেই আছে মাল নিয়ে যাবার খরচ। অবশ্য এটা ভাববার বিষয় যে, ইওরোপীয় কোম্পানির যে-সব উৎপাদন পদ্ধতির ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না তার দাম বেড়ে চলেছিল। যে-সবের উৎপাদন পদ্ধতির ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আছে, তার দাম বাড়ে নি।

দাম বাড়া সম্পর্কে যা মত দেওয়া হয়েছিল, সেটিও সর্বজনগ্রাহ্য হয় নি। যেটা বলা হয় যে, ইওরোপ থেকে সোনা, রুপো ও তামা আসার ফলে, এর কিছু সময় পরে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছিল। এটিও সকলে গ্রহণ করেন নি। এছাড়া মুঘল ভারতে দাম বাড়ার কারণ হয়ত আরো গভীরে– শুধু টাকার আমদানির ওপর তা নির্ভরশীল ছিল না। মুঘল শাসনপদ্ধতি ও তার রাজস্বব্যবস্থার ফলে কৃষিপণ্যের বাণিজ্য অনেক বেড়ে যায়। কারিগরি শিল্পেরও দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। নগর বিন্যাস ও জনসংখ্যা

বৃদ্ধির ফলেও বাণিজ্য বাড়তে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন যে, ইওরোপের সঙ্গে বাণিজ্য না থাকলেও অন্যভাবে বাণিজ্য বাড়ত।

জলপথে মাল চলাচলের খরচ কম থাকার ফলে খাদ্যদ্রব্য, লবণ এবং সোরা জলপথেই চালান যেত। প্রধানত উপকূল ধরে এবং আভ্যন্তরীণ নদীপথ ধরেই চলত। গঙ্গা ছিল প্রধান জলপথ। বেনারস, পাটনা হয়ে এলাহাবাদ থেকে রাজমহল অবধি যেত। রাজমহল থেকে শাখা প্রশাখা ধরে মালদা, হুগলি ও ঢাকায় মাল যেত। পশ্চিমে যমুনা নদী এলাহাবাদকে আগ্রার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিল। বেনারসের পশ্চিমে গঙ্গায় চলাচল করা যেত কেবল বর্ষার সময় ও তার পর। শীতকালে গঙ্গা দিয়ে পাটনা ও বাংলার মধ্যে নৌকা চলাচল করত। উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদী ধরে সমুদ্রে যেত মাল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে মুলতান ও সিন্ধুর সংযোগকারী খাল মজে যাওয়ায় এই পথ পরিত্যক্ত হয়। মুলতান থেকে সুরাটে মাল পাঠানো হতো স্থলপথে।

আগ্রা থেকে পাটনার স্থলপথ ছিল অনেকখানিই গঙ্গার তীর বরাবর। আরেকটি পথ বাংলার সঙ্গে বালাসোর গিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমে আগ্রা থেকে মধ্য-এশিয়ার একটি পথ গিয়েছিল দিল্লি, লাহোর ও কাবুল হয়ে। বাংলা থেকে পাটনার স্থলপথ ছিল মেদিনীপুর, কাশিমবাজার, রাজমহল ও মুঙ্গের হয়ে।

গুজরাট ও উত্তর ভারতের মধ্যে যাতায়াতের দুটি পথ ছিল। প্রথমটি সুরাট ও আগ্রার মধ্যে। এটি যেত আজমীর, মেরতা, যোধপুর, জালোর, আহমদাবাদ, খাম্বাজ ও বারোচ হয়ে। দ্বিতীয়টি যেত মালব ও খান্দেশ হয়ে। এটি গোয়ালিয়র, সিরোঞ্জ, উজ্জয়িনী, মান্ডু ও বুরহানপুর হয়ে যেত। টমাস রো এই পথ ধরে এসেছিলেন যদিও মান্ডুর পরে আরো পশ্চিমে চলে যান রাজস্থানের দিকে। সে-সময় প্রায় সব পথেরই এক বা একাধিক বিকল্প পথ ছিল। এমনকি দুই উপকূলের মধ্যেও ছিল বিকল্প পথ। সুরাট থেকে মসুলিপত্তনে যেতে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে ফরাসি বণিক মার্তা এই বিকল্প পথ ধরেছিলেন। ১৬৬৬ সালে মসুলিপত্তন থেকে ফেরার পথে ফরাসি পর্যটক থেভনো আরো দক্ষিণের পথ ধরেছিলেন। তাভারনিয়ারও ঐরকম বিকল্প পথ ধরে যান।

এই ধরণের পথ থেকে এই অনুমান করা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বাজারের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল। উপকূল দিয়ে আরো দক্ষিণে যাতায়াতেরও পথ ছিল যদিও গাড়ি চলাচলের মতো কোনো পথ দক্ষিণে ছিল না। এর ফলে উৎপাদন সচরাচর নিয়ে যাওয়া হতো শুধু উপকূলবর্তী এলাকায়। বড় ও প্রধান পথের সঙ্গে ছোটো ছোটো পথের যোগ ছিল যেগুলি দেশের অভ্যন্তরে মাল পাঠাত। গ্রাম ও কসবার সম্পর্কের মধ্যে এই ধরণের পথের সন্ধান মেলে। কিন্তু এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, এসবই ছিল জাতীয় বাজার গড়ে উঠার লক্ষণ— যদিও বন্দর, উৎপাদন কেন্দ্র ও শহরগুলির মধ্যে যোগসূত্রর নিদর্শন বর্তমান।

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান যুগের তুলনায় মুঘল যুগের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের

পরিধি অনেক কম ছিল এবং বাজারও অনেক ছোটো ছিল। এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধরণের ওজন, মুদ্রা, করের হার বিভিন্ন রকম থাকায় ব্যবসায়ীদের অসুবিধায় পড়তে হতো। তাছাড়া যাতায়াতের পথে ছিল নানারকম চুঙ্গি কর যেগুলি কেন্দ্রীয় শাসন তুলে দেবার চেষ্টা করেও সাফল্যলাভ করে নি। এর জন্য ভ্যান লিউর মন্তব্য করেছেন যে, বিভিন্ন বাজার ও খুচরো বাণিজ্য মুঘল ভারতের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা যায়।

মুঘল যুগের বাজার সম্বন্ধে দুটি কথা বলা যায়। এসব বাজারে পণ্য আসত সাধারণত স্থানীয়ভাবে বিক্রির জন্য অথবা আরো দূরের বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সময় সময় এই দুটি কারণ সহাবস্থান করেছে এবং একই ধরণের লোক এই দু-ধরণের কাজ করেছে। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় কিছু ব্যবসায়ী আলাদাভাবে কাজ করত। এছাড়া, আগেই আমরা দেখেছি যে, মুঘল ভারতের বাজারের বিভিন্ন স্তরভেদ আছে— ছোটো হাট থেকে সুরাটের মতো শহরের বড় বাজার পর্যন্ত। এর থেকে মুঘল ভারতের বাজারকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: এক, দুরপাল্লার ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বাজার, জলপথে বা স্থলপথে; দুই, মন্ডি ও পাইকারি বাজার, যেখানে কিছুদূর থেকে মাল আসত প্রধানত স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য; তিন, বিশেষ সময়ের মেলা, যেখানে স্থানীয়ভাবে বিক্রি বেশি হতো; চার, গ্রামীণ বাজার, যেগুলি স্থানীয় উৎপাদনের উদ্বৃত্ত বিনিময় করত। সমকালীন সাহিত্যে প্রথম তিনটি ধরণের বাজারের মধ্যে যোগাযোগ দেখা যায়। চতুর্থটির কথা কিছু পাওয়া গেলেও বিশেষ বিশেষ সময়ের মেলা থেকে পৃথক কি-না এ-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

প্রথমটিকে অবশ্য নানাভাবে ভাগ করা যায়। বন্দর শহর প্রধানত বৈদেশিক বাণিজ্যের মাল রাখত। আভ্যন্তরীণ বড় বাজার তার পশ্চাদভূমি থেকে মাল আনত ও ওখানে মাল পাঠাত যার ফলে উৎপাদনের ও দামের উঠা নামার রকমফের দেখতে পাওয়া যায়। ছোটো ছোটো শহরের বাজার বিশেষ কয়েকটি জায়গা থেকে মাল আনত এবং দূরপাল্লার বাণিজ্যের জন্য মাল পাঠাত। কতকগুলি শহরের বাজার যাতায়াতের পথের মোড়ে থাকার ফলে বিস্তার লাভ করেছিল। এর মধ্যে আমরা আগ্রা, লাহোর বুরহানপুর ইত্যাদি শহরকে ধরতে পারি। এছাড়া শাসনযন্ত্রের কেন্দ্রস্থল হওয়ার ফলে এ-শহরগুলিও বেড়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই সব বাজার সম্পূর্ণভবে স্বতন্ত্র নয় এবং অধিকাংশ জায়গায় অন্য ধরণের বাজারও এদের মধ্যে লুকিয়ে আছে, তা যতই গৌণ হোক না কেন। এছড়াও বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই কোনো কোনো বাজার শহরের চেহারা নেয় এবং তার কাজেরও পরিবর্তন হয়ে যায়— যা আবার সামগ্রিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। খাম্বাজ শহরের অবনতির সঙ্গেই সুরাট শহর গড়ে ওঠে। বোম্বাই ইংরাজদের হাতে এলে খাম্বাজের নিজস্ব বৈদেশিক বাণিজ্য অনেক কমে যায় এবং এখান থেকে প্রধানত মাল পাঠানো হয় সুরাট ও বোম্বাইতে, যেখান থেকে বিদেশে রপ্তানি হতে থাকে। কিন্তু খাম্বাজের পশ্চাদ্ভূমির সম্পর্কে ক্যাম্বের সম্পর্ক ঠিক থাকে যতদিন না মারাঠারা গুজরাট দখল

করছে। গৌড়ের পতনের পর সপ্তগ্রাম বন্দরের অবস্থার অবনতি হয় এবং হুগলি সেই জায়গা নেয়। কিন্তু সপ্তগ্রামের বাজার চলতে থাকে প্রায় ১৬৩২ সাল পর্যন্ত। এ-সময় মুঘল শাসন বিভাগ সপ্তগ্রাম থেকে হুগলিতে সরিয়ে নিয়ে গেলে সপ্তগ্রামের বাজার পড়ে যায়। সুতরাং অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কারণও রয়েছে বাজার উঠা বা পড়ার মধ্যে।

বণিকদের কাজ এবং তাদের অর্থাবস্থা দেখলে বলা যায় যে, বিভিন্ন ধরণের বণিক ছিল। বড় বড় বাজারের মধ্যে খুব ধনী বণিকের কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি বন্দর শহরের মধ্যে এমন ধনী বণিক ছিল যাদের সঙ্গে ইওরোপের বণিক-রাজাদের তুলনা করা চলে। সুরাটের বণিক ভীরজি বোরাকে তখনকার কালের সব থেকে ধনী ব্যক্তি বলা হতো। এছাড়াও আরো অনেকে ছিলেন— যেমন গুজরাটের আবদুল গফুর ও আহমেদ চেলাবি, গোলকুন্ডার মীর জুমলা, কাশি ভিরেনা ইত্যাদি। এরা শুধু বিদেশী বাণিজ্যেই লিপ্ত ছিল তা নয় আভ্যন্তরীণ আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যেও এদের দখল ছিল। ভীরজি বোরা ও কাশি ভিরেনা-রা কয়েকটি পণ্যর একচেটিয়া বাণিজ্য করতেন। এরা একাই ইওরোপীয় কোম্পানির জাহাজের সব মাল কিনে নিতে পারতেন। এদের অর্থাগম হয়েছিল মূলত বাণিজ্য থেকে, এবং এদের কারো কারোর সঙ্গে মুঘল শাসকদের যোগাযোগ ছিল। যে-জন্যে ওমরাহদের অর্থ ঋণ দেওয়া থেকে শুরু করে ইজারা নেওয়া পর্যন্ত সবই এরা করতেন। জগৎ শেঠের পরিবারের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। মান সিংহের সঙ্গে অম্বরের মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী হীরনন্দ শেঠ বিহারে আসেন। এর পরিবারের ছেলেরা বাংলায় ব্যবসা শুরু করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বাংলায় শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় এঁদের এক ছেলে গোপনে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতেন এবং তাঁর আর এক ভাই নবাবকে সাহায্য করেছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ-র সময়ে মানিকচাঁদ শেঠ *'জগৎ শেঠ'* উপাধি পান ও এদের পরিবার পরবর্তীকালে সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এরা বাংলার রাজস্ব দিল্লিতে পাঠাতেন, জমিদারদের ঋণ দিতেন ও অনাদায়ে জমিদারি দখল করতেন। এদের প্রায় দশ কোটি টাকা ছিল বলে ধরা হয়। এরকম ধরণের চরিত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিরল নয়— এমনকি ইবন বতুতার কথা ধরলে চতুর্দশ শতাব্দীতেও বিরল ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এদের উত্থান যেমন চমকপ্রদ তেমনি পতনও অকস্মাৎ।

এই ধরণের বড় বণিক ছাড়া, ছোটো স্বাধীন ব্যবসায়ীরা ছিলেন যারা তাদের নিজেদের ও ধার করা মূলধন নিয়ে ব্যবসা করতেন, তাদের কাছের ভৌগোলিক এলাকা ও পণ্যের ব্যবসাও ছিল সীমিত। তারা তাদের নিজেদের লোক দিয়ে বিশেষ বিশেষ এলাকায় কাজ-কারবার করতেন। সতের শতকের শেষে বাংলায় ফরাসি দলিলে মহম্মদ জাস বা যৌস বলে একজন বণিকের কথা পাওয়া যায়। ইনি ফরাসিদের সঙ্গে কাজ করতেন এবং নিজের লোকজন দিয়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কাপড় কিনতেন। সুরাটের সঙ্গে এঁর ভালো যোগাযোগ ছিল। এছাড়াও কসমে গোমেজ

বলে আর একজন বণিকের নাম বাংলার ফরাসিদের চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। ইনি ফরাসিদের টাকা ধার দিতেন এবং নিজেও বাণিজ্য চালাতেন।

এদের থেকেও ছোটো ব্যবসায়ী ছিল। এরা ছোটো এলাকায় কারবার চালাতেন এবং বিশেষ কোনো পণ্য নিয়ে ব্যবসা করতেন না। আগ্রায় যাওয়ার পথে তাভারনিয়ার ছোটো ছোটো শহরে পাঁচ-ছয়টা দোকান দেখেছিলেন। এগুলি বণিকদের– যারা মাখন, চাল, গুড়, তরকারি ইত্যাদি বিক্রি করে। এই দোকানের একপাশে চালের বড় গুদাম দেখেছিলেন। বাণারসী দাস তাঁর *অর্ধকথানক*-এ এইরকম একটি জৈন ব্যবসায়ীর কথা লিখেছেন। এরা প্রধানত অলংকারের ব্যবসা করত আগ্রা, জৌনপুর ও খয়রাবাদের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। বাণারসী দাসের নিজের ব্যবসায়ে বহুবার লোকসান হয়েছে কিন্তু আত্মীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে আবার ব্যবসা শুরু করেছেন। বড় বড় বণিক ও এই রকম ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ছিল আর এক দল লোক– যারা পরিপূরক হিসাবে কাজ করত।

এই ছোটো ব্যবসায়ীদের মধ্যে আমরা বাঞ্জারাদের ধরতে পারি। চারটি উপজাতিতে বিভক্ত এরা বিশেষত চাল, ডাল, শস্য ও লবণের ব্যবসা করত শহর থেকে শহরে ঘুরে। কখনো কখনো ব্যবসায়ীরা এদের ভাড়া করত। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই এরা নিজেরা বড় দল করে ঘুরে ঘুরে কেনা-বেচা করত। এদের এরকম একটা দলে প্রায় বিশ হাজার বলদ থাকত। ছোটো ব্যবসায়ও কত বড় করে করা যায় এরা তার নিদর্শন।

কৃষকরাও অনেকসময় নিজেরা শস্য বাজারে নিয়ে যেত। ছোটো ছোটো হাট বা বাজারে কৃষক ও কারিগররা তাদের উৎপাদন বিক্রি করছে এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। রাজপুতানায় মাড়োয়ারি ও গুজরাটি কর সংগ্রাহকরা শস্যে এই কর নিতেন এবং পরে টাকায় রূপান্তরিত করতেন। কৃষকরা যাদের কাছে থেকে আগাম নিয়েছে, তাদেরকে শস্য দিয়ে দিত। কারিগররাও এই একই কাজ করত। এখানে শহরের বণিকরা বা তাদের দালালরাও মহাজন ব্যবসায়ীর কাজ করেছে।

বণিক ও দালালের মধ্যবর্তী সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। ইওরোপীয় কোম্পানির দালালরা নিজেরা বড় ব্যবসায়ী। কিন্তু দালালের নিজস্ব একটা কাজ আছে। নানান ধরণের মালের জন্য আলাদা আলাদা শ্রেণীর দালাল আছে এবং তারা মাল কেনা-বেচার জন্য শতকরা এক থেকে দুই ভাগ দালালী পায়। বাংলায় সরকারের সঙ্গে যুক্ত দালালও ছিল।

ব্যবসায়ীরা প্রধানত কয়েকটা ভাগে বিভক্ত ছিল। গুজরাটে বাণিয়া, বোরা এবং পার্শীরা, রাজস্থানে হিন্দু ও জৈন বণিকরা, উত্তর ভারতে ও পাঞ্জাবে ক্ষত্রিয়রা, পূর্ব উপকূলে চেট্টিরা ও কোমাকিরা ছিল। বিদেশী মুসলমানরা অনেকে ভারতে বসবাস করেছিলেন মূলত গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও বাংলায়। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান আমলারাও বাণিজ্যে অংশ নেওয়া শুরু করেছিল। সপ্তদশ শতকের শেষে ফরাসি বণিক মার্তা বলেছেন, সুরাটে এই সব আমলাদের দালালরা বাণিজ্য চালাতেন। এমনকি মুঘল

সম্রাটেরও নিজস্ব জাহাজ ছিল প্রধানত পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আহমেদাবাদ ও খাম্বাজে আরব ও পারস্যের বণিকরাই ছিলেন।

ইংরাজ কোম্পানির দলিলে আমরা অবাঙালি বণিকদের কথা পাই যারা বাংলায় বাণিজ্য করছে। এদের মধ্যে আর্মেনিয়ানরা উল্লেখযোগ্য। বাঙালি বণিকদের কথা সমকালীন বাংলা মঙ্গলকাব্যে পেলেও, তারা উড়িষ্যার থেকে দূরে কোথাও যে বলে মনে হয় না। যদিও সিংহলে যাবার বিবরণ আছে। কিন্তু গুজরাটি বণিকরা যে খুব ভালোভাবে বাংলায় বাণিজ্য করত এরকম নিদর্শন কোম্পানি দলিল থেকে পাওয়া যায়। মাড়োয়ারিরাও এর মধ্যে ছিল। হিন্দু-মুসলমান বণিকরা সহযোগী ছিল এরকম দৃষ্টান্তও আছে, যদিও সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এর নিদর্শন নেই। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে মুকুন্দরামের রচনায় বাংলার বণিকদের নামের তালিকা পাই। এর মধ্যে কোনো মুসলমান বণিকের নাম নেই। যদিও আবার পর্তুগিজদের লেখায় এদের কথা পাওয়া যায়।

মাল কেনা হতো হয় নগদ টাকায় অথবা আগাম টাকা দিয়ে, যাকে দাদনী বলা হতো। নগদ টাকায় কেনা হতো সাধারণত বড় বাজার থেকে বা ছোটো শহর থেকে। কারিগরের কাছ থেকে ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ীরা বা বড় ব্যবসায়ীরা সরাসরি নগদ টাকায় মাল কিনত। এই জন্য দালাল রাখা হতো। দূরপাল্লার বাণিজ্যের মালের জন্যে অগ্রিম টাকা দেওয়াকে *দাদনী* বলা হতো। ইওরোপীয় কোম্পানিগুলিও এইভাবে মাল সংগ্রহ করত বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং শহরে তাদের কুঠিতে মাল জমা রাখত জাহাজের অপেক্ষায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দাদন প্রথা বেড়ে যায় এবং দূরান্তের উৎপাদন কেন্দ্রগুলি এর আওতায় এসে পড়ে। মুসলপত্তনের ইতিহাস থেকে এর পরিচয় পাওয়া যায়। আগে এখানকার বাজার থেকে প্রায় কুড়িটি জাহাজ ভর্তি করা যেত এবং বড় বড় বণিকে জায়গাটা পরিপূর্ণ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এর পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন শুধু একটা জায়গায় নয়– সারা উপকূল ধরেই চলছিল। কোম্পানিগুলির বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন আরো বাড়তে থাকে। একটা কারণ সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। কোম্পানিগুলির চাহিদার বৈশিষ্ট্য আছে বিশেষ বাজারের জন্য। কারিগরদের এত পুঁজি নেই যে, তারা নিজেরা ঐ বিশেষ ধরণের মাল তৈরি করবে। সুতরাং তারা দাদন চায়। কোম্পানির দিকেও কিছু সুবিধা আছে। প্রথমত জাহাজের জন্য মাল জমা করে রাখা যায়। দ্বিতীয়ত, দাম সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে কারণ দাদন দেওয়ার সময়েই দাম ঠিক করা হতো। দালালরা টাকা নিয়ে পাইকারদের দেয় এবং পাইকাররা বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে তাঁতিদের হাতে দিয়ে দেয়। কাশি ভিরেনা এইভাবে গ্রামের সমস্ত তাঁতিকে দাদন দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। ভিরজি বোরা এই একইভাবে একচেটিয়া বাণিজ্য করে বাজার দখল করেছিলেন। বিশাল পুঁজি থাকার ফলে এই ধরণের কাজ করা এদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অনেক সময় বণিকরা সরাসরি তাঁতিদের সঙ্গে যোগাযোগ

করে দাদন দিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুজরাটে ফরাসি বণিক রোক, কোম্পানিকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কোম্পানির সঙ্গে তাদের দালালদের যে এ-নিয়ে গোলমাল হতো তার বহু নিদর্শন আছে।

মুঘল ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য নানারকম জটিল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চলত। বাণিজ্য দ্রুত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-ব্যবস্থাও জটিল হতে শুরু করে। টাকা ধার দেওয়া বা নগদ টাকায় কারবার না করে অন্যভাবে ব্যবসা করা এ-সময়ে খুব ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল।

এই অন্যভাবে ব্যবসার মধ্যে হুণ্ডি খুবই উল্লেখযোগ্য। এটিতে এই আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে, বিশেষ একটি সময়ের পর এই কাগজ দেখালে টাকা দেওয়া হবে। এর থেকে সুদের জন্য একটা অংশ কেটে নেওয়া হবে। এর ফলে বড় বড় কাজের জন্য নগদ টাকার। বদলে হুণ্ডিতে কাজ-কারবার চালানো হতো। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার রাজস্ব আগ্রায় পাঠানো হতো নগদ টাকায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জগৎ শেঠ এই টাকা হুণ্ডিতে দিল্লিতে পাঠাতে থাকে। এই ধরণের কাজ বিশেষ একদল লোক করতে থাকে যাদের *তরফ* বা *শ্রফ* বলা হতো। বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা ভাণ্ডারের কাজ এরাই করতেন। কতটা অংশ বাদ দেওয়া হবে এই নিয়ে আহমেদাবাদে বণিক ও শ্রফদের মধ্যে গোলমাল হয় ১৭১৫ সালে। এর থেকে বোঝা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হুণ্ডির প্রয়োজনীয়তা বাণিজ্যিক জগতে কি পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল।

এর থেকে আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর আমানত জমা দেওয়ার প্রথাও শুরু হয়েছিল বলে বলা যায়। শ্রফরা এই ধরণের আমানত জমা নিত যে, চাইলে আবার ফেরৎ পাওয়া যাবে। ১৬৪৮ সালে আগ্রাতে একটি নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যেখানে আমানতের ওপর সুদ দেওয়া হচ্ছে প্রতি মাসে শতকরা ৫/৮ ভাগ অথবা বছরে শতকরা সাড়ে সাত। ১৬৩০-এর দশকে সুরাটে ঐ একই হার দেখা যায়। শ্রফরা এই আমানত শতকরা এক বা দেড় ভাগ হারে সুদে খাটাতেন কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে। শ্রফরা কোনো কোনো সময় চড়া সুদে টাকা ধার দিত যা সময় মতো ফেরৎ পাওয়া যেত না, ফলে শ্রফরাও আমানতের টাকা ঠিক সময় ফেরৎ দিতে পারত না। বড় বড় আমলারাও অনেক সময় সরকারি খাজনা আমানত করে সুদ নিত। আমানত নগদ টাকা বা জিনিসে নেওয়া হতো।

সম্রাট শাহজাহানের সময় সরকারি টাকা থেকে বণিকদের টাকা ধার দেওয়া হতো। যেমন, নীল-কে একচেটিয়া সরকারি কারবার করে এক বণিককে ঐ কারবার করার অধিকার দেওয়া হলো ও সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হলো। জগৎ শেঠের উত্থানও বাংলার কোষাগারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বলে ধরা যেতে পারে। বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খান জোর করে বণিকদের ধার দিতেন। যদিও ইসলামে এই ধরণের সুদ ভোগ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু আওরংজেবের সময়েও এই কাজকারবার ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল। তবে সরকার কতটা এর

মধ্যে জড়িত ছিল বলা শক্ত। মূলত সরকারের কাজের বাইরে এটা চলত। সপ্তদশ শতকের শেষে বাংলার নবাব আজিম উনশান বাংলায় একচেটিয়া কারবার কিছুদিন চালালে সম্রাটের আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পরেও পাটনার সোরা বিক্রি সরকার একচেটিয়া করেন ও আর্মেনীয় বণিকদের ওপর বিক্রির ভার দেওয়া হয়। কোম্পানির চিঠিতে এ-ধরণের কাজের নিন্দা করলেও কোম্পানি এই কাজই যে করতে চাইত তার বহু নিদর্শন আছে।

নিচুস্তরে সাহু বা মহাজন সুদে টাকা ধার দিত। এই স্তরে প্রধানত ব্যবসা চালানোর জন্য টাকা ধার দেওয়া হতো। মহাজনের ধারই ব্যবসায়ের লগ্নি হতো। আগেই বলা হয়েছে, কারিগররা আগাম টাকা বা দাদন নিয়ে মাল তৈরি করত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বাংলায় ফরাসিদের টাকার খুব টানাটানি যাচ্ছিল। বাইরে থেকে টাকা ধার নিতে গেলে সুদের হার ছিল শতকরা বারো ভাগ বছরে। এর একটা কারণ হতে পারে যে, যুবরাজ আজিম উনশান ধনরত্ন সঞ্চয় করছিলেন এবং তাঁর দেওয়ানের জোরজুলুম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে জোরে আঘাত করেছিল। বাংলায় শোভা সিংহর বিদ্রোহ ও লুটতরাজও এই সঙ্কটকে কিছুটা প্রভাবিত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় এই সমস্যা তীব্রতর হয়— তখন শতকরা ১৫০ ভাগ সুদে টাকা ধার পাওয়া যেতে থাকে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে বাংলার এই সংকট ছিল বলে মনে হয় না। মুকুন্দরামের রচনায় পোদ্দার ও মহাজনের কথা থাকলেও এই ধরণের সুদের কথা নেই। তবে রাজনৈতিক কারণে টাকা ধার পাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে এ-রকম ইঙ্গিত আছে। মুকুন্দরামের রচনা থেকে মনে হয় যে, ঐ সংকট সাময়িক এবং এর ব্যাপ্তি বিশেষ নেই। সমকালীন পূর্ববঙ্গে এই সংকট ছিল না। মুঘল সেনাপতি এক রাত্রে ঢাকার পাইকারদের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ধার করেছিলেন। ফলে মুকুন্দরামের গ্রাম ছাড়ার অভিজ্ঞতা সমগ্র বাংলার ছবি বলে ধরা ঠিক হবে না।

সুরাটে সুদের হার ওঠানামা করত বাৎসরিক শতকরা ছয় থেকে বারোর মধ্যে। কোনো কোনো সময় বেড়ে শতকরা তিরিশ ভাগ পর্যন্ত হয়েছে। করমণ্ডল উপকূলে এটা ছিল শতকরা আঠার থেকে ছত্রিশ ভাগের মধ্যে। এই ধরণের তারতম্য সারা মুঘল যুগ ধরেই চলছিল যার ফলে বলা যায় যে, পুঁজির বাজার একসূত্রে গাঁথা হয় নি। বাংলায় বিদেশী সোনা রুপো এলেও সুরাটের মতো কোনো বড় মাপের বণিক ছিল না। জগৎ শেঠ এসে সে অভাব অনেকাংশে পূরণ করেন কিন্তু তিনি ছিলেন মূলত মহাজনী কারবারী।

মুঘল যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা। কোনো কোনো ইওরোপীয় পর্যটকের মতে, মুঘল ভারতের যাতায়াত ব্যবস্থা ফরাসি বা ইটালির থেকে কম ছিল না। প্রধানত বলদ টানা দু-চাকার গাড়িই ছিল যাত্রীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা। রাজস্থানে উটের গাড়ি ছিল। ঘোড়া বাইরে থেকে আসত এবং তার দাম অনেক বেশি থাকায় ঘোড়ায়-টানা গাড়ি পাওয়া যেত না। যাদের ভালো অবস্থা তারা পাল্‌কি ব্যবহার করত, যার বর্ণনা ওভিংটন দিয়েছেন। দু-চাকার বলদের

গাড়িতে চালক ছাড়া চারজন যেতে পারত। এ গাড়িগুলি ঢাকা অথবা খোলা ছিল। পিছনের দিকটা এবং দুপাশ সাধারণত খোলা থাকত। চারচাকার গাড়িও কোনো কোনো জায়গায় ছিল। বিদেশী পর্যটকরা লক্ষ্য করেছেন যে, এই বলদ টানা গাড়িগুলি খুব জোরে যেত— প্রায় পঁচাত্তর মিনিটে দুই মাইল যেতে পারে। ইংরাজ পর্যটক ফিচ বলেছেন যে, সারাদিনে এরা কুড়ি মাইল বা তার বেশি যেতে পারত। বড় দলের সঙ্গে আগ্রা ও সুরাটের মধ্যে যাত্রী ও মাল নিয়ে উটে-টানা গাড়ি যেত। টমাস রো উটে টানা গাড়ির থেকে বলদ টানা গাড়ি পছন্দ করেছেন। খুব বেশি ভারী মাল হলে, দুটি বলদের জায়গায় বেশি বলদ জোড়া হতো। বাংলা থেকে রাজস্ব আসত আগ্রায় ছয় বলদ-টানা গাড়িতে।

বলদ টানা গাড়ি ছিল সব থেকে সস্তা। প্রতিটি পাল্‌কিতে লাগত বারোজন লোক এবং প্রতিজনের মজুরি ছিল চার টাকা প্রতি মাসে। বলদে টানা গাড়ির প্রতিদিনের ভাড়া ছিল এক টাকা করে। সুরাট থেকে আগ্রা বা গোলকুণ্ডা যেতে লাগত প্রায় পঁয়তাল্লিশ টাকা। ১৬৩১ সালে সুরাট থেকে মুলতানে মাল নিয়ে যাবার প্রতি মণের ভাড়া ছিল আড়াই টাকা। পাটনা থেকে আগ্রার প্রতি মণের ভাড়া ছিল দু-টাকার কাছাকাছি (সাড়ে বিয়াল্লিশ পাউণ্ড = একমণ)। এই পথ যেতে লাগত উনত্রিশ দিন থেকে চল্লিশ দিনের মতো। পথ তিরিশদিনের বেশি হলে শতকরা পঁচিশ ভাগ কমানো হতো।

মুঘল যুগে ব্যবসায়ীরা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে এরকম দৃষ্টান্তও আছে। ব্যবসায়ী বাণারসী দাস জৌনপুর থেকে আগ্রায় ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলেন। কাশিমবাজার থেকে ঢাকা যাবার পথে নৌকা ছেড়ে তাভারনিয়ার ঘোড়া নিয়েছিলেন। গোলকুণ্ডা থেকে মসুলিপত্তনম-এর পথ ভালো ছিল না বলে ঘোড়া বা পালকি ব্যবহার করা হতো। ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছিল না বললেই চলে। টমাস রো জাহাঙ্গীরকে যে ঘোড়ায় টানা গাড়ি দেন, তাতে করে জাহাঙ্গীর আজমীরে গিয়েছিলেন। রাশিয়ান পর্যটক নিকিতন অবশ্য বিদারের সুলতানের ঘোড়ায় টানা গাড়ির কথা বলেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বারবোসা খাম্বাজ শহরের ধনীলোকদের ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে বেড়ানোর কথা বলেছেন।

পরবর্তীকালে সুরাটে এই ধরণের গাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ওখানকার ধনী ব্যবসায়ীরা গরুর গাড়ি বা বলদ টানা গাড়ি করে সপ্তাহান্তে সুরাট শহরের বাইরে বাগান বাড়িতে যেত। আবুল ফজল *আইন-ই আকবরীতে* *গহরবাহাল* বলে এক ধরণের গাড়ির কথা বলেছেন যেগুলি ঘোড়ায় টানা। এর থেকে মনে হয়, ঘোড়ায় টানা গাড়ি জাহাঙ্গীরের সময়ে এলেও ভারতের কোনো না কোনো জায়গায় এর প্রচলন ছিল। পশ্চিম রাজস্থান, গুজরাট ও সিন্ধুতে উটের প্রচলন ছিল। আবুল ফজল লিখেছেন, কচ্ছে সবথেকে ভালো উট পাওয়া যেত এবং সিন্ধুতে সব থেকে বেশি উট দেখা যায়। ভারী মাল ও ভারী কামান নিয়ে যাবার জন্য হাতির ব্যবহার ছিল। উচ্চবিত্ত লোকরাও হাতি ব্যবহার করতেন।

জলপথে মাল ও যাত্রী চলাচলের দৃষ্টান্ত যা পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয়, দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অনেকখানি অংশই জলপথে চলাচল করত। এইসব মালবাহী নৌকো চার থেকে পাঁচ-শ টন পর্যন্ত হতো। এটাওয়ার কাছে নদীতে পর্যটক মুণ্ডি এই ধরণের কয়েকটি নৌকো দেখেছেন। রাজমহলে পর্যটক মানরিক দু-হাজারের ওপরে দাঁড় টানা নৌকো সারিসারি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। একটা হিসাব অনুযায়ী বলা যায়, কাশ্মীরে প্রায় ত্রিশ হাজার নৌকো ও থাট্টাতে চল্লিশ হাজার নৌকো ছিল। আর একটি হিসাব অনুযায়ী, এসব মালবাহী নৌকা হাজার থেকে দু-হাজার মণ মাল বহন করতে সক্ষম। আর একজন পর্যটক হিসাব দিয়েছেন, পাটনা থেকে হুগলির মধ্যে প্রায় দু-শ টন মাল নিয়ে নৌকা চলাচল করত। বাংলার সব জায়গায় নৌকা একরকম ছিল না। তমলুকের কাছে মানরিক ছোটো ছোটো কয়েকটি নদী পার হয়েছিলেন মাটির বড় হাঁড়ির মধ্যে করে, যার মধ্যে তাঁকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জায়গায় ভেলাই ছিল পারাপারের একমাত্র উপায়।

উপকূলবর্তী এলাকায় আভ্যন্তরীণ নদীপথে বিভিন্ন ধরণের ছোটো বড় নৌকা ছিল। রাজমহলের সামনে মানরিক বড় বড় জাঙ্ক নৌকা দেখেছিলেন। ঐগুলিই তখনকার কালে সব থেকে বড় জাহাজ। গঙ্গায় বিশাল মালবাহী নৌকো চলাচল করত। সিন্ধু নদীতে তলা চ্যাপ্টা নৌকো মাল পরিবহণের জন্য ছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারেথমা বিভিন্ন ধরণের নৌকোর কথা বলেছেন। যার মধ্যে দুই মাস্তুল, এক মাস্তুল, সরু ছিপ ধরণের নৌকা, দাঁড় টানা নৌকো, যেগুলি পঞ্চাশ থেকে ষাটজন লোক নিতে পারে ইত্যাদি রয়েছে। গুজরাটের সাতাশটি বন্দরে ছোটো বড় সব ধরণের জাহাজ ছিল।

মুঘল যুগে মোটামুটি শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকায় দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে সময় বেশি লাগত না। সুরাট থেকে আগ্রায় বলদে টানা গাড়িতে লাগত প্রায় চল্লিশ দিন। মাল নিয়ে গাড়ি বা উটের সময় লাগত প্রায় পঞ্চাশ দিন। মানরিক পাটনা থেকে আগ্রার ৫৪৪ মাইল পঁচিশ দিনে পৌঁছেছিলেন অর্থাৎ দিন গড়ে প্রায় বাইশ মাইলের মতো রাস্তা অতিক্রম করেছিলেন। তাভারনিয়ার নিয়েছিলেন উনত্রিশ দিন— বেলগ্রেড থেকে ইস্তাম্বুলে পৌঁছাতে। অন্যান্য দূরত্বের মধ্যে লাহোর থেকে আগ্রা লাগত একুশ দিন। লাহোর থেকে মুলতান দশ দিন, বিজাপুর থেকে গোলকুণ্ডা নয় দিন। গোলকুণ্ডা থেকে মসুলিপত্তন আট দিন। জলপথে আরো বেশি দিন লাগত এবং বিশেষ বিশেষ সময় ছাড়া যাওয়াও যেত না। হুগলি থেকে পাটনা জলপথে যেতে লাগত ষাট দিন, লাহোর থেকে থাট্টা ত্রিশ দিন।

তাভারনিয়ার লিখেছেন, যাতায়াতের ব্যবস্থা মুঘল ভারতে ফ্রান্স ও ইটালির থেকে কম সুখকর ছিল না। কিন্তু এ-মন্তব্য প্রধানত রাজপথ সম্পর্কে প্রযোজ্য। এ-সব চওড়া পথের দুপাশে বড় বড় গাছ ও দূরত্ব নির্দেশক চিহ্ন আছে। প্রতি দশ ক্রোশ অন্তর সরাইখানা আছে। কিন্তু অন্যান্য পথগুলি এ-রকম ভালো ছিল না— বর্ষাকালে

কাদায় ভর্তি হয়ে যেত। ১৬৩২-এর অগাস্ট মাসে পর্যটক মুণ্ডি এলাহাবাদ ও বেনারসের মধ্যেকার পথের দুর্দশার কথা বর্ণনা করেছেন। উড়িষ্যাতে মানরিক জলকাদার পথ দিয়ে দিনে চোদ্দ মাইল পথও যেতে পারেন নি। ছোটো নালার ওপর দিয়ে মুঘলরা কয়েকটি সেতু তৈরি করেছিল। কিন্তু বড় নদী পার হওয়ার জন্য নৌকোয় নৌকোয় জোড়া লাগিয়ে সেতু তৈরি করে পার হতে হতো। রাজপুতানায় বালির ওপর গাড়ি করে যাওয়া বেশ শক্ত ছিল।

বাঞ্জারাদের জন্য কোনো সরকারি সংস্থা কিছু ছিল না— ফলে তারা যখন ইচ্ছা ও যেখানে ইচ্ছা যেতে বা থাকতে পারত। তাদের নিজের মধ্যে ছিল একজন নেতা। এই ধরণের বিরাট দলের *(কাফিলা)* মধ্যে ছিল বিভিন্ন জাতের লোক যাদের মধ্যে মাঝে মাঝেই গোলমাল হতো। দুটি দল একটা ছোটো পথের মাঝখানে এসে গেলে মারামারি ছিল অবশ্যম্ভাবী। আগ্রা-সুরাট পথে বহু মালবাহী পশু মারা যেত এ-কারণে, যার ফলে ক্ষতি হতো ব্যাপারীদের।

পর্যটকদের জন্য যাবার ব্যবস্থা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ছিল। রাজপথের থেকে বড় বড় শহরের ব্যবস্থা ভালো ছিল। আগ্রা থেকে পাটনা বা লাহোর থেকে মুলতানের প্রতিদিনের পথের শেষে সরাই পাওয়া যেত। রাজস্থানের মধ্যে দিয়ে আগ্রা বা সুরাট যাবার পথে সরাই মিলত প্রায় সাতদিন অন্তর। ঐ সরাইগুলো আগ্রা-পাটনা পথের সরাই-এর মতো এত ভালো নয়। উড়িষ্যায় প্রায় কোনো সরাই ছিল না বললেই চলে। শহরের কাছে সৈন্যরা তাঁবু খাঁটালে, বুরহানপুর শহরের মতো জায়গায় থাকার ব্যবস্থা পাওয়া কঠিন ছিল। শেরশাহ প্রায় সতের-শ সরাই তৈরি করে দেন। ইসলাম শাহ এ-জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেন। রাজন্যবর্গ ছাড়া গ্রামের লোকদের খরচে সরাই তৈরি করা হতো। ভারতীয় ব্যবসায়ী বা ভ্রমণকারীর পক্ষে এগুলো অস্বচ্ছন্দের ব্যাপার ছিল এ-রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। বার্নিয়ার বলেছেন, এগুলো বড় খামার বাড়ির মতো, যেখানে শত শত মানুষ বিভিন্ন ধরণের পশু নিয়ে থাকছে। পর্যটক থেভনো বলেছেন যে, আগ্রায় ষাটটা সরাই ছিল যেগুলো সত্যিই সুন্দর। বড় ধরণের সরাইতে আট-শ থেকে হাজার লোক তাদের ঘোড়া, উট, গাড়ি ইত্যাদি নিয়ে থাকতে পারে। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ঘর আছে। উঠোনে গাছ আছে। জিনিসপত্র বিক্রির জন্য দোকানঘর আছে। মালের জন্য গুদামঘর আছে এবং কাজ করবার মহিলা ও পুরুষের থাকবার ঘর আছে। বিভিন্ন ধরণের ঘর ও ব্যবস্থা নির্ভর করত বিভিন্ন শ্রেণীর পর্যটকদের ওপরে। অর্থাৎ মুঘল সমাজের শ্রেণীবিন্যাস এখানেও দেখা যেত। বড়লোকদের ঘরের মাপ বড়। বিদেশী পর্যটকরা মাসিক ভাড়া দিয়ে বহুদিন থাকতে পারত। বড় সরাই এর চারপাশে দেওয়াল ছিল এবং আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার বন্দোবস্ত ছিল। দরজা বন্ধ হতো সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এবং খুলত সূর্যোদয়ের মুহূর্তে। এছাড়াও, ভ্রমণকারীদের আকাশের তলায় থাকতে হয়েছে বহু রাত্রেই। কিন্তু তাদের খাওয়া-পরার কোনো অসুবিধা হয় নি। সুরাট থেকে স্থলপথে মসুলিপত্তন যাবার পথে ফরাসি বণিক মার্তা

বলেছেন যে, যাবার অসুবিধা হলেও খাবারের কোনো অসুবিধা হয় নি। সমস্ত পথে তিনি চার পাঁচটা সরাই পেয়েছিলেন এবং সেগুলো তাঁর কাছে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের বলে মনে হয়েছিল। তিনি অবশ্য বলেছেন যে, তুর্কি বা পারস্যর তুলনায় ভারতে সরাই-এর সংখ্যা কম।

মুঘল যুগে সরকারি ডাকব্যবস্থা ছিল সরকারি কাগজপত্র পাঠানোর জন্য। বণিক ও ব্যবসায়ীরা পাট্টামারের (অর্থাৎ ডাকহরকরা) সাহায্যে কাগজপত্র পাঠাত। এরা খুব অল্পসময়েই পথ অতিক্রম করত। আগ্রা থেকে পাটনা এরা নিত নয় দিন। এরা এ-জন্য নির্দিষ্ট টাকা নিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরাজ কোম্পানি স্থলপথে পাট্টামারের সাহায্যে কাগজপত্র পাঠাত। পাটনায় এই ধরণের পাট্টামার পাওয়া যেত বাজারের মধ্যে *বাজার কাসিদার* কাছ থেকে। সতের শতকের শেষ থেকে আমরা ফরাসি চিঠিপত্রে দেখতে পাই, তারা সুরাট থেকে হুগলি বা চন্দননগর থেকে সুরাটে পাট্টামারের হাত দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছে। কোনো কোনো সময় এই চিঠি যেতে প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত লেগে যেত। এই পাট্টামার ছিল এক ভারতীয় বণিকের যার সঙ্গে ফরাসিদের সম্পর্ক ছিল। ফলে প্রতিটি চিঠির জন্য আলাদা করে তিনটাকা ফরাসিদের দিতে হতো পাট্টামারকে। আঠার শতকের শেষেও আমরা পাট্টামারদের দেখি ইংরাজদের কাগজপত্রে। আফগানিস্থান ও উত্তর ভারতের শহরগুলির ব্যবসায়ীদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের শেষেও পাট্টামার যাতায়াত করত। এদের সূত্রেই কাবুলের জামান শাহ্-র লাহোর আগ্রাসনের প্রস্তুতির কথা জানতে পারে।

মোরল্যাণ্ড বলেছেন, পথের অশান্তির জন্য বাণিজ্যের খরচ বেশি পড়ে যেত কারণ বড় দল *(কাফিলা)* তৈরি করে পাঠাতে হতো। এটা নিশ্চিত যে, একা পথ চলা নিরাপদ ছিল না, বিদেশী পর্যটকরা বরাবরই এই ধরণের *কাফিলা*র সঙ্গে পথ চলেছেন। এমন কি জলপথেও, উপকূলে প্রায় দু-শ নৌকার *কাফিলা* তৈরি করে পথ চলত। সবাই অবশ্য কাফিলার সঙ্গে যান নি। মানরিক মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বণিকের বেশে গিয়েছিলেন। আগ্রা থেকে পাটনা যাবার পথে মুণ্ডিও *কাফিলা*র সঙ্গে যান নি। বাণারসী দাস মণিমুক্তো নিয়ে আগ্রা থেকে পাটনা যাওয়ার সময় মাত্র দুজন লোককে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর লেখা থেকে এটা মনে হয় না যে, মাত্র এই কয়েকজন লোক নিয়ে পথ চলা বিপজ্জনক ছিল ; যদিও ইওরোপীয় পর্যটকরা বারবার এই ধরণের বিপদের কথা বলেছেন। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া তাদের বিপদে পড়ার দৃষ্টান্ত নেই। মার্তার কাছ থেকে স্থানীয় কর চাওয়া হলে গোলমাল হয়। থেভনা বলেছেন যে, পথে বড় ধরণের বিপদ নেই, আসলে ছোটো ছোটো আমলারাই কিছু টাকা আদায় করার জন্য চাপ দিত। কেবল উপকূলবর্তী এলাকায় জলদস্যুদের ভয় ছিল। আওরংজেবের মৃত্যুর পর অবশ্য চিত্রটা বদলে যায়। মারাঠাদের লুঠতরাজে গুজরাটের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্য চলছিল যদিও ততদিনে উত্তর ভারতের সঙ্গে গুজরাটের সম্পর্কে অনেকখানি ছিন্ন হয়ে এসেছে।

মুঘল অর্থনীতির মধ্যে একটা স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ লোকই, যা উৎপাদন হতো তাই ভোগ করত বা বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যকিছু ভোগ করত। এর ফলে অধিকাংশ লোকই হয় উৎপাদন করছে না-হলে ভোগ করছে। এই সঙ্গে দেখা যায় যে, কৃষি উৎপাদনের প্রায় শতকরা পঞ্চাশভাগ রাজস্ব হিসাবে নেওয়া হচ্ছে এবং নগদ টাকায় রূপান্তরিত হচ্ছে। কারিগরদের ওপর ঐ ধরণের কর ছিল। এর থেকে দেখা যায়, এরকম দরিদ্র ও গরীব লোকেরা যা উৎপাদন করছে তার অর্ধেকটাই কর হিসেবে দিচ্ছে এবং বিনিময়-প্রথার জন্য বাজারে নিয়ে যাচ্ছে। এই স্ববিরোধিতা কেবল ঐ ধরণের বিশাল রাজস্ব নেওয়ার মধ্যে দেখা যায়। যারা ঐ রাজস্ব দিচ্ছে তারা অন্য কিছু কিনতে পারত বলে মনে হয় না এবং একমাত্র উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত উচ্চস্তরের লোকদের জীবনযাত্রার ছন্দ ও মান আভ্যন্তরীণ চাহিদার সৃষ্টি করেছিল। মুঘল শান্তি ও শৃঙ্খলা বাজার অর্থনীতির প্রসারে নানারকম সুযোগ এনে দেয়। এই বাজার যে একসূত্রে গাঁথা এরকম নয় কিন্তু ব্যবসায়ীদের প্রসার হওয়াতে ক্রমশ বিভিন্ন শহর-বাজারের যোগসূত্র বাড়ছিল— এমনকি গ্রামের বাজারেও পৌঁছে যাচ্ছিল। উৎপাদন, চাহিদা ও পণ্যের মূল্য বেড়ে যাচ্ছিল। এককথায় বলা যায় যে, মুঘল ভারতের অর্থনীতির কাঠামো শুধু সংখ্যা দিয়ে বদলে যাচ্ছিল তা নয় তার গুণগত পরিবর্তনও হচ্ছিল। বিদেশী বাণিজ্যের চাহিদাও বাড়ছিল। কিন্তু সে-সব সত্ত্বেও বলা যায় যে, মুঘল ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের যে পরম্পরা ও কাঠামো ছিল, তার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি।

৬
বৈদেশিক বাণিজ্য

ক. বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কাঠামো

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে মালাবার উপকূলে পর্তুগিজের আগমনকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলে বলা হয়েছে। সমকালীন লোকরাও এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এক মুসলমান নাবিকের সহায়তায় কালিকট বন্দরে পৌঁছে ভাস্কো ডা গামা বলেছিলেন, পর্তুগিজরা খ্রিশ্চান ও মশলা খুঁজতে এসেছে। দু-বছর পরে গামা লিসবন শহরে ফিরলে পর্তুগিজ রাজা এমানুয়েল নিজেকে ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতের অধীশ্বর বলে ঘোষণা করেন। ১৫০০ সালে কাব্রাল যখন কালিকটে আসেন তখন তিনি কালিকটের রাজাকে জানান, খ্রিশ্চানদের সঙ্গে মুসলমানদের শত্রুতার সম্পর্ক বহুদিনের এবং পর্তুগিজরা কালিকটের জাহাজ সমুদ্রে পেলে বাজেয়াপ্ত করবে।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে পর্তুগিজরা লোহিত সাগর ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের মধ্যে বিভিন্ন জাহাজের ওপর আক্রমণ চালায়। এর থেকেই ক্রমশ মশলার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পর্তুগিজ নীতি তৈরি হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন ছিল এশীয় জাহাজের বদলে পর্তুগিজ জাহাজের নৌশক্তির প্রাধান্য তৈরি করা ও কয়েকটি বিশেষ জায়গায় শক্ত ঘাঁটি তৈরি করা। এই ঘাঁটিগুলি থেকে সহজেই নৌ-বাহিনী আক্রমণ করতে পারবে ও বাণিজ্য সহজ করতে পারবে। ১৫০২ সালে পর্তুগীজরা কালিকট শহরের ওপর বোমাবর্ষণ করে– যখন তারা দেখে যে, কালিকটের রাজা জামোরিন তাঁর রাজ্য থেকে মুসলমান বণিকদের তাড়িয়ে দেবেন না। কালিকটের শত্রু এবং কোচিনের রাজা ১৫০৩ সালে প্রথম দুর্গ তৈরি করার অধিকার দেন পর্তুগিজদের। আলবুকার্কের অধীনে ১৫১০ সালে পর্তুগিজরা বিজাপুর থেকে গোয়া ছিনিয়ে নিলে পর্তুগিজদের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ১৫০৯ সালে পর্তুগিজ নৌবহর ইজিপ্টের নৌবহরকে দিউ-এর সামনে যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ১৫১১ সালে পর্তুগিজরা মালাক্কা বন্দর দখল করলে দূর-প্রাচ্যের বাণিজ্য পথের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ এসে যায়। ১৫১৫ সালে পারসিক উপসাগরে পর্তুগিজরা হরমুজ বন্দর দখল করে। এর পর আরো কয়েকটি জায়গা তারা দখল করে ঘাঁটি করে। এর মধ্যে আছে করমণ্ডল উপকূলে সাও টোমে। বাংলায় হুগলি ও চট্টগ্রাম, চীনের ম্যাকাও বন্দর ও সিংহলের কলম্বো।

পর্তুগিজদের এই সাম্রাজ্যকে বলা হতো *এসতাদা দ ইণ্ডিয়া*। এর কার্যকলাপ থেকে বলা যায় যে, এসতাদা-এর মধ্যে সংস্থাগত কতকগুলি নতুন জিনিস ছিল।

এশিয়ার বাণিজ্য জগতে কোনো পণ্যের ওপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার ছিল বিরল ব্যতিক্রম। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও বণিকদের কাছে সুদূরের একটি কেন্দ্র থেকে পর্তুগিজদের বাণিজ্য পরিচালনা ছিল বিস্ময়কর ব্যাপার। ভারতীয় মহাসাগরে মশলার বাণিজ্য একচেটিয়া করে নেওয়া পর্তুগিজদের কাছে স্বাভাবিক হলেও ভারতীয়দের কাছে অভাবনীয়। ১৫০৬ সাল থেকে পর্তুগিজরা মশলার বাণিজ্যকে একচেটিয়া সরকারি বাণিজ্য বলে ঘোষণা করে। এটিকে সুরক্ষিত করার জন্য তারা তাদের নৌশক্তিকে কাজে লাগায়, যদিও লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরে কতটা সাফল্য তারা পেয়েছিল এটা ভাবার বিষয়। ১৫১০ সালে স্থলপথের বাণিজ্য শুরু হয়ে যায় এবং ভারত থেকে সস্তা মাল ভূমধ্য সাগরীয় বন্দরে যেতে শুরু করে। ফলে পর্তুগিজরা উত্তমাশা অন্তরীপ সমুদ্রপথ ধরে ভারতে পৌঁছলেও, তাদের একচেটিয়া কারবারের সাফল্য সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন।

ভারতীয় রাজন্যবর্গের কাছে দূরপাল্লার বাণিজ্যে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল রাজস্ব আদায় করা। বণিকরাও বিভিন্ন রকমের কর দিতেন তাদের মাল সুরক্ষা করার খাতিরে। এই ধরণের কর দেওয়া ও নেওয়ার উদ্দেশ্য ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও এশিয়ার বণিকদের কাছে পরিষ্কার ছিল। পর্তুগিজরা যে-নতুন ধারণা নিয়ে এল, সেটি হচ্ছে তারাই একমাত্র সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী যার ফলে এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্য তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে। এশিয়ার রাজন্যবর্গের জোট বাঁধতে পারার অক্ষমতা ও নৌশক্তির দুর্বলতার ফলে পর্তুগিজদের উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হয়। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকার বিনিময়ে পর্তুগিজরা এশিয়ার বণিকদের ছাড়পত্র দেয় বাণিজ্য করার। একে বলা হতো *কার্তাজ* যেটি পাওয়া যেত গোয়ার শাসনকর্তার কাছ থেকে। পর্তুগিজরা অবশ্য এটি দাবি করত পোপের সনদের ওপরে যেখানে ভারতীয় সমুদ্রের অধিকার পর্তুগালের রাজাকে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রাজন্যবর্গ, যেমন বিজাপুরের সুলতান পোপের ঘোষণা না মানলেও কার্যত *কার্তাজ* প্রথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমনকি মুঘল সম্রাটও *কার্তাজ* নিয়ে সুরাট থেকে মোখাতে জাহাজ পাঠাতেন।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে কিছু ভারতীয় বণিক পর্তুগিজদের সঙ্গে যুগ্মভাবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে জাহাজ পাঠাতেন। বলা বাহুল্য *কার্তাজ* থেকে পর্তুগিজদের রাজস্ব ভালোই হতো। কিন্তু *এসতাদা দ ইণ্ডিয়া*কে পরগাছা বলা ঠিক হবে না। সমকালীন ইওরোপীয় পর্যটকরা লিখেছেন যে, এশিয়ার মধ্যে গোয়ার নিজস্ব বাণিজ্য ছিল। তবে গোয়ার বাণিজ্য ক্রমশ কমে গেলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত ভালো ছিল এটা বলা যায়।

পর্তুগিজ প্রচেষ্টা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় মশলার বাণিজ্যকে ধ্বংস করা। কিন্তু সরকারি গাফিলতি ও দুর্নীতির ফলে তাদের সে চেষ্টা সফল হয় নি এবং ক্রমশ তারা আবগারী আমলাতে পরিণত হয়। আসলে মসলার বাণিজ্যের উৎস মুখ বা যাতায়াতের পথ বন্ধ করতে পর্তুগিজরা সক্ষম হয় নি। নিজেদের পসরার দাম না কমানোর ফলে

স্থলপথে মশলার বাণিজ্য কোনো পরিবর্তন ছাড়াই চলতে থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে জলদস্যুরা পর্তুগিজদের জায়গা দখল করতে শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ মশলার বাণিজ্য দখল করা। কিন্তু এখানে ইংরাজ কোম্পানি আসতে শুরু করে যার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ইওরোপীয় বাণিজ্যের কাঠামোও বদলে যায়।

পর্তুগাল ও স্পেনের শক্তি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি ভারত অভিমুখে যাত্রা শুরু করে, যার উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য করা। প্রথমদিকে এরা ইন্দোনেশীয় ও মশলা দ্বীপপুঞ্জে জাহাজ পাঠায়। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারে যে, ভারত ভূখণ্ডকে বাদ দিয়ে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করা সম্ভব হবে না। ভারত থেকে তাঁতের কাপড় দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে বিক্রি করে সেখান থেকে মশলা ইওরোপে নেওয়া অনেক বেশি লাভজনক। ঐ দ্বীপপুঞ্জগুলিতে টাকা পয়সার প্রচলন তখন ছিল না যার ফলে ভারতীয় কাপড় দিয়ে ঐ বাণিজ্য করা সম্ভব ছিল। ওলন্দাজরা ক্রমশ বুঝতে পারে, ঐ বাণিজ্যের বাম হাত হচ্ছে করমণ্ডল উপকূল।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে করমণ্ডল ও গুজরাটের তাঁতের কাপড়ের চাহিদা ছিল। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ঐ বাণিজ্য ভারতীয় বণিকদের পক্ষে লাভজনক ছিল। ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি মসুলিপত্তন ও সুরাটে তাদের ব্যবসা শুরু করে প্রধানত আন্ত-এশিয়ার বাণিজ্যের চাহিদা মেটাতে। কিন্তু ক্রমশ এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় কাপড় ও অন্যান্য পণ্য ইওরোপের বাজারে প্রচুর লাভে বিক্রি করা যাবে। এর ফলে ধীরে ধীরে একটা নতুন বাণিজ্যের কাঠামো গড়ে ওঠে। ওলন্দাজরা পর্তুগিজদের বাণিজ্য দখল করে। ইংরাজরাও ওই বাণিজ্য দখল করতে যায় এবং কিছুটা সফল হয়। ক্রমশ দুটি কোম্পানিই সরাসরি ইওরোপের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রথা শুরু করে। ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজদের বাণিজ্যিক প্রথার সঙ্গে এদের প্রথার বিশেষ তফাৎ নেই। এরাও এশিয়ার বাণিজ্যে একচেটিয়া কারবার তৈরি করার চেষ্টা চালায় এবং সরকারি করের ক্ষেত্রে নানারকম ছাড় আদায় করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ওলন্দাজরা লবঙ্গ, গোলমরিচ ইত্যাদি মশলার বাণিজ্য করলেও করমণ্ডল উপকূলে সম্পর্ক তৈরি করতে চায় কাপড়ের বাণিজ্যের জন্যে। ওলন্দাজরা মসুলিপত্তনে কুঠি করে ও তাদের জন্য সরকারি কর কমিয়ে দেওয়া হয়। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী জায়গা চিত্রিত কাপড়ের (যাকে *চীনস* বলা হতো) জন্যে বিখ্যাত ছিল। এগুলি রপ্তানি হতো আচিন, মলাক্কা ও ম্যানিলাতে। ক্রমে ওলন্দাজরা বুঝতে পারে যে, বিজয়নগরে গোলকুণ্ডা থেকে আরো সস্তায় ভালো কাপড় পাওয়া যায়। মশলা দ্বীপপুঞ্জে পুলিকটের কাপড়ের চাহিদা ছিল। এইজন্য ওলন্দাজরা তেগেনাপত্তনমে কুঠি করতে চায় এবং পরবর্তীকালে পুলিকটে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে এটাই ওলন্দাজদের প্রধান ঘাঁটি হয়।

গুজরাটের কাপড়ের চাহিদা থাকলেও ওলন্দাজরা পর্তুগিজদের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করেছিল। মুঘল দরবারেও পর্তুগিজ প্রভাব ছিল। ১৬১৪ সালে মুঘল-পর্তুগিজ নৌযুদ্ধের সময়, মসুলিপত্তনের ওলন্দাজ কুঠির কাছে নিমন্ত্রণ আসে। ১৬১৭ সালে ওলন্দাজরা পশ্চিমে কুঠি খোলে। ওলন্দাজরা ততদিনে ঠিক করে নিয়েছে কিভাবে পর্তুগিজ ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করবে। প্রথমে তারা জাহাজগুলি আক্রমণ করে ও পরে ঘাঁটিগুলি। গোয়া ও মালাক্কা সমুদ্রপথে অবরোধ করা হয়। একের পর এক জাহাজ খোয়া যেতে পর্তুগিজ শক্তি অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। ওলন্দাজরা ১৬৩৬ সাল থেকে গোয়া অবরোধ করতে থাকে যা চলে প্রায় দশ বছর ধরে। ১৬৪১-এ মালক্কার পতন হয়। ওলন্দাজরা কলম্বো (১৬৩৬) ও কোচিন (১৬৬১) দখল করে। এখানে ওলন্দাজরা স্থানীয় রাজাকে জোর করে তাদের একচেটিয়া বাণিজ্য করাতে বাধ্য করে। এই একই ধরণের নীতি তারা ইন্দোনেশিয়াতেও নিয়েছিল।

ইংরাজ কোম্পানির আর্থিক অবস্থাও ওলন্দাজদের মতো এত ভালো ছিল না। ওলন্দাজদের থেকে ইংরাজদের বাণিজ্যের নীতি ছিল আলাদা। প্রথমদিকের যাত্রায় ইংরেজরা মশলা দ্বীপপুঞ্জের ও ইন্দোনেশিয়ার বন্দরে গিয়েছিল। কিন্তু তারা দেখল যে, ওলন্দাজরা তাদের জায়গা ছাড়তে রাজি নয় এবং ওলন্দাজদের নৌ ও সামরিক শক্তি তাদের থেকে বেশি। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের বাজার এত বড় নয় যে, এর থেকে লাভজনক বাণিজ্য করা যাবে। ১৬০৩ সালে ইংল্যাণ্ডে যে পরিমাণ মশলা জমে গিয়েছিল তার থেকে এটা বোঝা যায়। এর ফলে ইংরাজদের ভারতীয় বন্দরগুলিতে যাওয়া ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় ছিল না। এর থেকেই আমরা দেখতে পাই যে, ইওরোপের বাণিজ্য কিভাবে বাড়ছে এবং গুজরাট, করমণ্ডল ও বাংলায় ইংরাজদের ঘাঁটি তৈরি হচ্ছে।

১৬০৭ সাল থেকে ইংরাজরা ছক কষতে থাকে কিভাবে সুরাট ও লোহিত সাগরের বাণিজ্য পাওয়া যায়। ১৬০৯ সাল থেকে ইংরাজরা সুরাট বন্দরে কুঠি তৈরি করার চেষ্টা করে। ১৬১২ সালে সম্রাটের আদেশ পেলে সুরাটের মুঘল আমলাদের অত্যাচার থেকে ইংরাজরা অনেকখানি নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু পর্তুগিজদের আক্রমণের আশঙ্কা দূর হয় নি। ১৬১৩ সালে ইংরাজরা সুরাটে কুঠি তৈরি করে ইওরোপের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য করার জন্য। এর আগে ১৬১১ সালে মসুলিপত্তনে ইংরাজ কুঠি হয়েছিল। কিন্তু ইংরাজদের লাভ প্রধানত এসেছে আন্তর্দেশীয় ও আন্ত-এশিয়ার বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে। ১৬২২ সালে হরমুজের দখল পর্তুগিজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে এবং ১৬৩২ সালে মুঘলরা হুগলি থেকে পর্তুগিজদের হটিয়ে দিলে পর, ইংরেজদের জয় যাত্রা শুরু হয়। এই একই সময়ে ওলন্দাজ কোম্পানির সামনেও পথ খুলে যায়।

উত্তর ইওরোপীয় কোম্পানির ভারতে বাণিজ্যিক কাঠামো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে একই রকম ছিল— বড় কোনো ভারতীয় বন্দরে প্রধান কুঠি করে দেশের ভেতরে ছোটো ছোটো কুঠি তৈরি করা। এই ছোটো ছোটো কুঠিগুলি উৎপাদন

এলাকার সঙ্গে যোগ রেখে রপ্তানির মাল সংগ্রহ করবে। একাধিক প্রধান কুঠি বিভিন্ন এলাকায় আছে এবং তারা পরস্পরের থেকে স্বাধীন। সুরাট, কোচিন, পুলিকট, নেগাপত্তনম, মুসলিপত্তনম ও হুগলিতে ওলন্দাজদের কুঠি ছিল। ওলন্দাজদের এই কাঠামো চলতে থাকে বহুদিন। ইংরাজ কোম্পানির কাঠামোটি আলাদা। ইংরাজরা চাইছে দুর্ভেদ্য ঘাঁটি কারণ কোম্পানি স্থানীয় রাজাদের নিরাপত্তার জন্য টাকা দিতে চায় না। তারা নিজেরাই এই টাকা নিয়ে অন্যদেরকে নিরাপত্তা দিতে চায়। ১৬৩৯ সালে মাদ্রাজ ও ১৬৬১ সালে বোম্বাই নেওয়া এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সুরক্ষিত করা– সবই এই একই ছকের মধ্যে পড়ে। পশ্চিম উপকূলে ইঙ্গ-মুঘল যুদ্ধও এই ছকের অন্তর্গত।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুঘল ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য অনেক বেড়ে যায়। এর মূলে নিশ্চয়ই রয়েছে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসি কোম্পানির বাণিজ্যে ক্রমবর্দ্ধমান লগ্নি। ভারতীয় ও এশিয়ার বণিকদের কতটা হাত ছিল এই বাণিজ্যে তা আমরা এখনো জানতে পারি নি। কিন্তু ১৬৮০ পযর্ন্ত সুরাট শহরের বৃদ্ধি আমাদের দৃষ্টি এদিকে নিয়ে যায়।

ইংরাজরা ওলন্দাজদের জায়গায় এলেও অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকে ফরাসি বাণিজ্য বিস্তার ইংরাজদের কাছে চক্ষুশূল হয়েছিল। ১৬৬৪ সালে ফরাসি মন্ত্রী কোলাবার্টের উদ্যোগে নতুন ফরাসি কোম্পানি স্থাপিত হলে ফরাসিরা কয়েক বছর পরে সুরাটে কুঠি করার অনুমতি পায়। অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তির বাধাদান এবং ফরাসি কোম্পানির বণিকদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে ফরাসিরা সেরকমভাবে অগ্রসর হতে পারে নি। ১৬৭১ সালে এক শক্তিশালী ফরাসি নৌবহর সুরাটের সামনে এলেও ফরাসিদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নি। ফরাসি কোম্পানি প্রথম ধাক্কা খায় যখন সেন্ট থমে থেকে ওলন্দাজ ও গোলকুণ্ডার মিলিত শক্তি তাদের হটিয়ে দেয়। এর ফলে বিজাপুরের এক নায়েক শের খান লোদীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা পণ্ডিচেরি গ্রামটি পায়, যদিও তারা তখন বাংলায় কুঠি তৈরি করার চেষ্টা করছিল। ১৬৭৩ সালের পর পণ্ডিচেরিতে বসবাস শুরু করলেও ফরাসিরা সেন্ট থমে ফিরে পাবার চেষ্টা ছাড়ে নি। এতে সাফল্য লাভ না করায় তারা পণ্ডিচেরিতেই মনোনিবেশ করে। ১৬৬৫ থেকে ১৬৭৬ সাল পর্যন্ত পঁয়ত্রিশটি ফরাসি জাহাজ ভারতে আসে। ১৬৭৯ থেকে ১৬৯৫ সালের মধ্যে আসে উনচল্লিশটি জাহাজ। এর পরে ওলন্দাজরা পণ্ডিচেরি দখল করলে অবস্থার পরিবর্তন হয়। সপ্তদশ শতকের শেষে সুরাটে ও বাংলায় ফরাসিদের অবস্থা শোচনীয় হয়। ১৭১৯ সালে নতুন ফরাসি কোম্পানি তৈরি হলে তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শক্ত দুর্ভেদ্য ঘাঁটি তৈরি করে এশিয়ায় বাণিজ্য করা ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির মূল নীতি ছিল। এর সঙ্গে ছিল স্থানীয় রাজন্যবর্গের বন্দরের মুখ জাহাজ দিয়ে অবরোধ করা, যায় ফলে ভারতীয় জাহাজ বন্দর ছেড়ে বেরোতে বা বন্দরে ঢুকতে না পারে। সুরাট বা হুগলিতে মুঘল নিরাপত্তার মধ্যে বাণিজ্য করলেও

বা ঐ-সব বন্দরে বাস করলেও, এ-রকম চাপ তারা দিত নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য। মুঘল শক্তি বা স্থানীয় রাজন্যবর্গ তখন ইওরোপীয় কুঠি অবরোধ করত। প্রধানত শুল্ক বিরোধই এই সব গোলমালের কারণ। পণ্যের মূল্যমান কত হবে সেটা নিয়ে বিরোধ ছাড়াও, মুঘল আমলারা সন্দেহ করত যে, ভারতীয় বণিকরা কম হারে শুল্ক দেওয়ার জন্য ইওরোপীয়দের নামে বাণিজ্য চালাচ্ছে। ১৭১৭ সালে মুঘল সম্রাট ফারুক শিয়ারের কাছ থেকে ইংরাজরা ফরমান জোগাড় করে যে, বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে তারা মুঘল ভারতে বিনা শুল্কে ব্যবসা করবে। তাছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির কুঠির অধিকার বা কোম্পানির অধিকার নিয়ে গোলমাল বাধে। কোম্পানিগুলির মতে, যে-সব ভারতীয়রা কোম্পানিতে কাজ করছে তারা সবাই কোম্পানির আইনের ধারায় পড়বে। অর্থাৎ কোম্পানি চাইলে তাদের শাস্তি দিতে পারবে। স্থানীয় প্রশাসন মনে করত, এটা তাদের বিচার-ব্যবস্থার ওপর হস্তক্ষেপ। এই ধরণের গোলমাল, যেটা অনেকসময় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে পাওয়া যায় ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরো বাড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে কেন্দ্রীয় মুঘল শাসনের দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। ঐ-সময় থেকে ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি তাদের শক্তি বাড়াতে থাকে, যার ওপর নির্ভর করে তাদের বাণিজ্যিক লাভ। ১৭৫৭-য় পলাশীর প্রান্তরে বাংলার নবাব সিরাজ উদ্-দৌলা প্রধানত তাঁর সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরাজ সৈন্যদের কাছে হেরে গেলে ইতিহাস অন্য দিকে মোড় নেয়। বিলেতের কোম্পানির পরিচালকবর্গ বাণিজ্যের বদলে জায়গা-জমি দখল করার নীতি অনুমোদন না করলেও স্থানীয় ইংরাজরা এই নীতি অনুসরণ করতে থাকে।

খ. বাণিজ্যিক পণ্যের কাঠামো

এটা এখন অনস্বীকার্য যে, দক্ষিণ আমেরিকার সোনা-রুপোর খনি না পাওয়া গেলে, এশিয়ায় ইওরোপীয় বাণিজ্য এতদিন ধরে চালানো সম্ভব হতো না। ইওরোপে টাকা সহজলভ্য হয়ে যাওয়া এবং ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালানো আকস্মিক কোনো ব্যাপার নয়। টাকার যোগান বেড়ে যাবার ফলে ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি তিন শতাব্দী ধরে এশিয়া মহাদেশে লগ্নি করতে পেরেছে এবং উৎপাদনের প্রথাও কিছুটা পরিমাণে বদলাতে সক্ষম হয়েছে। ইওরোপ থেকে এই পরিমাণ লগ্নি বাইরে চলে যাওয়ায় সমকালীন ইওরোপীয় লেখকরা সমালোচনা করতেন। এঁদের কাছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও বাইরে চলে যাওয়ার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। আর এর জন্য এরা এত পরিমাণ লগ্নি বাইরে পাঠানোর জন্য ইওরোপীয় কোম্পানিগুলিকে সমালোচনা করতেন। অবশ্য কারো কারো মতে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চরিত্রের সঙ্গে মূল্যমান ও মজুরির একটা সম্পর্ক আছে। এশিয়াতে টাকা পয়সা কম আছে বলেই ঐ সব দেশে ইওরোপ থেকে লগ্নি যাচ্ছে এবং এর ফলে

ঐ সব দেশের মজুরি ও পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। দুই দেশের দামের তফাৎ থাকার ফলেই এই ধরণের লগ্নি ইওরোপ থেকে এশিয়াতে চলে যাচ্ছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো এর থেকেই তাঁর বিখ্যাত তুলনামূলক সুবিধার মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। এখনও অবশ্য বলা খুব শক্ত যে, কেন ইওরোপ ও এশিয়ার মূল্যমানের তফাৎ ছিল আর তার কতটা লগ্নির অভাব আর কতটাই বা উৎপাদনের প্রথা এর জন্য দায়ী। কাপড়ের মূল্যমানের তফাতের জন্য উৎপাদনের কলাকৌশল অনেকাংশে দায়ী। এছাড়া, ইংল্যাণ্ডে মজুরির দাম বেশি থাকায় কাপড়ের দাম বেশি পড়ে যেত। এর ফলে ইংল্যাণ্ডে কাপড় তৈরিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের চাহিদা মেটানোর জন্য ভারতের কাপড় ইংল্যাণ্ডে আমদানি করা হতো।

ভারতে এই পরিমাণ ইওরোপীয় লগ্নি আসার কী ফল হয়েছিল সেটা সম্বন্ধে অনেকে একমত নন। প্রাচীনপন্থী ঐতিহাসিকদের মত ছিল যে, ভারতীয়দের গহনা তৈরি করা ও মাটির তলায় টাকা পুঁতে রাখার স্বভাবের জন্যে এই লগ্নির কোনো ফল হয় নি। এইভাবে টাকা জমানো শুধু ভারতবর্ষে কেন, ইওরোপেও দেখা যায়। এর সাথে এও বলা যায় যে, বিদেশ থেকে আনা সোনা, রুপোর দাম একরকম ছিল না। ইওরোপ থেকে অথবা ফিলিপাইন থেকে রুপো ভারতে এলেও এখানেই যে থাকত তা নয়। অনেকসময় চীনে চলে যেত যেখানে সোনা-রুপো-তামার আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের মূল্যমান ভারতের থেকে নিচে। সমকালীন ইওরোপীয় পর্যটকরা অবশ্য জোর দিয়ে বলে আসছেন যে, ভারতে যে সোনা রুপো একবার ঢোকে তা আর বেরোয় না। ১৬৯১ সালে পর্যটক কারেরী বলেছেন, পৃথিবীতে যা সোনা-রুপো আছে তা সবই শেষপর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যে পৌছাঁবে। ইওরোপ থেকে সোনা, রুপোর তাল প্রধানত তিনটি পথ ধরে মুঘল ভারতে আসত। একটি আলেপ্পো হয়ে, যার বিনিময়ে কাঁচা রেশম কেনা হতো। দ্বিতীয়টি লোহিত সাগর ধরে মোখা যেখানে তাঁতের কাপড় পাওয়া যেত। তৃতীয়টি উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে সুরাট বন্দরে এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসত নীল ও মশলার খোঁজে। ১৬২১ সালের এই হিসাব অনুযায়ী এশিয়াতে প্রতি বছর সোনা-রুপোর তাল আসত বছরে ১৫ লক্ষ পাউণ্ডের মতো।

টাকার অঙ্কটা বড় বেশি বলে মনে হয় যদিও এর সত্যতা যাচাই করার কোনো ব্যবস্থা নেই। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে পর্তুগিজরা প্রায় দু-লাখের মতো রুপোর টাকা আমদানি করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইংরেজরা ষাট হাজার টাকার মতো নিয়ে এসেছিল যেটা ১৬২৯ সালে এটা দু-লক্ষে পৌঁছয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরেজদের আমদানি আট লাখের কাছাকাছি যায় এবং ওলন্দাজদের প্রায় চার লাখের কাছে। টাকা ছাড়াও মশলা দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্য থেকে ওলন্দাজরা ভারতে লগ্নি করতে পেরেছিল যেটা ইংরাজরা করতে পারে নি। ইওরোপের বিলাসদ্রব্য ও ইংরাজদের কাপড় ভারতে আমদানি করে তারা লগ্নির এই চাহিদা পূরণ করতে চেষ্টা করে।

এটা সকলেরই এখন জানা যে, ইওরোপীয়দের এশিয়ার বাণিজ্যের লাভ আসছে

ইওরোপের বাজারে এশিয়ার দ্রব্য বিক্রি করে, ইওরোপের মাল ভারতে বিক্রি করে নয়। এশিয়ার মাল তারা ইওরোপের বাজার ছাড়াও আফ্রিকা, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রি করত। আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দাসদের ওপর ভিত্তি করে আর্থ-সামাজিক অবস্থা চলত। একটা ত্রিভুজাকৃতি বাণিজ্য তৈরি হচ্ছে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল, আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাজার নিয়ে।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা মালাবার ও কানাড়া থেকে মরিচ চালান দিত সরাসরি ইওরোপে। ঐ মরিচ জোগাড় করার জন্য তারা কোচিন কান্নানোর ও কুইলনে কুঠি তৈরি করেছিল। ষষ্টদশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই একটা হিসাব অনুযায়ী পর্তুগিজরা মালাবারে উৎপাদনের প্রায় শতকরা তিরিশ ভাগ লিসবনে চালান দিত। শতাব্দীর শেষে এটা কমে শতকরা চার ভাগে দাঁড়ায়। ভেনিসিয়ানদের হিসাব অনুযায়ী, ১৫৮৪ সাল নাগাদ মরিচের বাণিজ্য থেকে পর্তুগিজদের আয় প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ ক্রুসাডো-র কাছে গিয়েছিল। ইংরেজরা জানত যে, অ্যান্টিওয়ার্প-এর বণিকরা পর্তুগিজদের আমদানি করা মরিচ ইওরোপে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করত। ১৬২১ সালে একটা হিসাব করা হয় যে, আট লক্ষ পাউণ্ড ইওরোপে আমদানি করা হতো প্রতি বছর। এক বছর পরে ওলন্দাজরা হিসাব দেয় ৭০ লক্ষ পাউণ্ড, যার মধ্যে পর্তুগিজরা আমদানি করত চোদ্দ লক্ষ পাউণ্ড।

১৬৭০ সালে ওলন্দাজরা বার্ষিক আমদানি করত প্রায় ৯০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ইংরাজরা আনত প্রায় পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ডের মতো। এ-হিসাবটা বাড়তে থাকে প্রতিবছর। ইওরোপের জাহাজগুলিতে এত বেশি মরিচ আনবার কারণ হলো ইওরোপের বাজার বেশ ভালো ছিল এবং এর পরিবেশনার কাঠামোও বাঁধা ছিল। এটা খুচরো বিক্রি করতে অসুবিধা ছিল না কারণ জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই ছিল এটা। কিন্তু এছাড়াও বোধ হয় আরেকটা কারণ ছিল। জাহাজকে ভাসানোর জন্য শুধু দামী জিনিস দিয়ে জাহাজ ভরালে চলবে না কারণ জাহাজ ডুবে গেলে বহু ক্ষতি হবে। ফলে এই ধরণের সাধারণ জিনিস কিনে জাহাজে তুলে তার ভারসাম্য বজায় রাখা হতো। ১৬৭০-এর দশকে ওলন্দাজরা মালাবার দখল করার চেষ্টা করলে ইংরাজরা ভয় পেয়ে যায়। এর ফলে মরিচ যুদ্ধ শুরু হয়, যার জন্য সামগ্রিক রপ্তানি কমতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য কারণে মরিচের বাণিজ্য এশিয়ার প্রধান রপ্তানি থেকে সরে আসে এবং এর জায়গায় আসে ভারতীয় কাপড়।

ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি গুজরাট ও করমণ্ডলের টুকরো কাপড় ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে পাঠাত। এখান থেকে সরাসরি ইওরোপে রপ্তানি করা কঠিন কাজ নয়। আগে কিছু কিছু টুকরো কাপড় ইওরোপে এলেও, ১৬১৩ সালে ভারতীয় কাপড় লণ্ডনের নিলামে উঠতে থাকে। মোট আমদানি পরবর্তী দু-বছরে বিশেষ বাড়ে না। ১৬১৯ সালে ছাব্বিশ হাজার টুকরো কাপড় বিক্রি হয় নীলামে। ১৬২১ সালে রপ্তানি বেড়ে হয় একলক্ষ তেইশ হাজার টুকরো এবং ১৬২৫ সালে এটা দু-লক্ষ একুশ হাজারের ওপরে চলে যায়। এ-তুলনায় ওলন্দাজ কোম্পানি অনেক কম আমদানি

করে ইওরোপে।

সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতীয় কাপড়ের জনপ্রিয়তা ইওরোপে বেড়ে যায় যার ফলে মিহি কাপড়ও আসতে শুরু করে। ইওরোপীয় লেখকরা ভারতীয় তাঁত ও রেশমের আমদানি ক্ষতিকর বললেও, সাধারণ লোকের মধ্যে ভারতীয় তাঁতের কাপড়ের যথেষ্ট কদর ছিল। যে পরিমাণ কাপড় ইওরোপে আমদানি করা হয়েছিল তার থেকেই এই ধারণা পাওয়া যাবে। ১৬৬৪ সালে ইংরাজ কোম্পানি সাড়ে-সাত লক্ষ টুকরো কাপড় ইওরোপে আমদানি করে। কোম্পানির বাণিজ্যিক মূল্যে প্রায় শতকরা ৭৩ ভাগ। বিশ বছরে এই আমদানি দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং এর মূল্য কোম্পানির বাণিজ্যের প্রায় ৮৫ ভাগ। ১৬৮০-এর দশকে ভারতীয় কাপড়ের রপ্তানি অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপীয় বাজার আর বাড়তে পারে না, যার মূলে রয়েছে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির চড়া শুল্ক। কতকগুলি ধরণের কাপড় ইওরোপে আনা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সমকালীন দলিল থেকে বিভিন্ন ধরণের কাপড়ের ভাগ করা যায়। এদের মধ্যে আছে সাধারণ সাদা তাঁত, রঙ করা তাঁত, নানা ধরণের স্ট্রাইপ ও চেক তাঁত, চিঞ্জ ও জরি-করা রেশম এবং রেশমের টুকরো যার মধ্যে তাঁত ও রেশম মেশানো আছে। রঙ-এর ব্যবহারের জন্য চিঞ্জ খ্যাত ছিল। বাংলার টাফেটা ছিল প্রধান রপ্তানি। সাধারণ তাঁতের মধ্যে ইওরোপীয়রা ক্যালিকো ও মসলিনের মধ্যে তফাৎ করতেন। প্রথমটি মোটা কাপড় এবং পরেরটি খুব মিহি। পশ্চিম উপকূল থেকে প্রধানত কম-দামী কাপড় রপ্তানি করা হতো আফ্রিকার দাসদের জন্য। মাদ্রাজ ও বাংলা থেকে মিহি কাপড় যেত মাঝারি ও উচ্চবিত্ত ক্রেতার কাছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইওরোপীয় বাণিজ্য সুরাট থেকে করমণ্ডল উপকূলে ও পরে বাংলায় সরে আসে। দামের তারতম্য থেকে বোঝা যায় যে, ততদিনে ইওরোপের বাজারের মূল কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম যুগের বাজারের চাহিদা ছিল কম-দামী কাপড়ের। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার মসলিন ও করমণ্ডলের চিঞ্জ-এর রপ্তানি অভিজাত বাজারের মধ্যে চলে আসে।

ভারত থেকে রপ্তানি-জাত অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ছিল নীল। প্রথমদিকে এর খুব চাহিদা ছিল। পরে রং এর জায়গায় আসে সোরা ও বাংলার রেশম। রং-এর জন্য নীল ছিল খুব সস্তা এবং এর রং ছিল স্থায়ী। আমেদাবাদ ও আগ্রার নীল সব থেকে ভালো বলে ধরা হতো। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ভারতীয় নীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও স্থানীয় আমেরিকার নীল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ভারতীয় নীলের দাম অন্য জায়গার থেকে চড়া হয়ে যাওয়ায় এর চাহিদা কমতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আবার অন্য জায়গায় নীলের যোগান কমে গেলে ভারতীর নীলের চাহিদা কিছু সময়ের জন্য বেড়ে যায়।

সোরা পরিবহণের ক্ষেত্রে জাহাজের কিছু সুবিধা ছিল, যেমন-তেমনভাবে ফেলে

রাখা বা অত্যধিক টানাটানিতে এর কোনো ক্ষতি হতো না বলে জাহাজের ভারসাম্য রাখার জন্যে এর প্রয়োজনীয়তাও ছিল খুব বেশি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত থেকে সোরা রপ্তানি ক্রমশ বাড়তে থাকে। বারুদে সোরার ব্যবহার এবং ইওরোপের অস্ত্রসস্ত্র তৈরির কারখানাগুলির প্রসার হওয়ার কারণে এর ব্যবহার বাড়ছিল, যা বাণিজ্যের পক্ষে লাভজনক পণ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় সোরার চাহিদা ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসিদের জাতীয় নীতির সঙ্গে জড়িত।

নীল ও সোরার পরে ভারত থেকে সব চেয়ে বেশি রপ্তানি হতো বাংলার কাঁচা রেশম। কাশিমবাজারের চারপাশে ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তুঁতগাছ থেকে যে রেশম পাওয়া যেত সেটাই ভারত বিখ্যাত ছিল। এর ফলে ঐ এলাকায় বড় রেশম বোনার শিল্প গড়ে ওঠে। ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি প্রথমে রেশমের কাপড় কিনতে আকৃষ্ট হয়; পরে তারা কাঁচা রেশম কেনার দিকে মন দেয়। ইওরোপের রেশমশিল্পে যোগান দিত প্রধানত ফরাসি ইটালিয়ান ও পারস্য দেশের রেশম। ১৬৫০ সালের পর বাংলার রেশম এই জায়গা নিয়ে নেয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে কাপড়ের বাণিজ্যের মধ্যে প্রধান জায়গা করে নেয়।

ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানিরা আসার আগে ভারতের সঙ্গে ইওরোপীয় বাণিজ্যের খুব বেশি কিছু পরিবর্তন হয় নি। এশিয়াতে পর্তুগিজ বাণিজ্য সামান্য ছিল না, কিন্তু পরবর্তী কালের বাণিজ্যের তুলনায় এর বৈচিত্র্য বেশি ছিল না। যৌথ মালিকানা ভিত্তিতে তৈরি ইওরোপীয় কোম্পানির বাণিজ্যের কাঠামো ছিল পর্তুগিজদের থেকে আলাদা। এছাড়া ইওরোপীয়দের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ভারত মহাসাগরে শুরু হলে এরা ক্রমশ ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্য দখল করতে থাকে। যে কারণে ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি এতদিন টিকে ছিল তা হলো: তারা এমন একটা সংস্থা তৈরি করেছিল যেটা নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ এদের সংস্থাগুলো কোনো সময় বা কোনো ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল না। এদের নিজেদের দেশের সঙ্গে সব সময়ে যোগাযোগ রেখে চলত এবং দেশের বাজারের চাহিদা ও নীতি অনুযায়ী বাণিজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল।

কার্যকলাপের দিক থেকে দেখতে গেলে এই কোম্পানিগুলি বর্তমানের বহুজাতিক কোম্পানিগুলির পূর্বসূরী। সারা জগৎ জুড়ে এদের বাণিজ্য এবং ব্যক্তিগত কারিগরি ভিত্তিক অবস্থায় মাল তৈরি হলেও মালের মান এক ধরণের ছিল। ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় সময়মতো মাল যোগান দেওয়া বা মালের মান ঠিকমতো ধরে রাখা একটা নতুন ব্যাপার ছিল। লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর অথবা ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে এক বিশেষ ধরণের মালের চাহিদা ছিল। ঐ সব জায়গায় ব্যবসা হতো বিশেষ মরসুমে। ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে ইওরোপীয় বণিকগোষ্ঠীর তফাৎ ছিল শুধু বিশাল সংখ্যার মাল নেওয়ার জন্য নয়, তাদের সঙ্গে যে চুক্তি হচ্ছে তার আইনগত দিক থেকেও। একটা সাধারণ মরসুমে ইওরোপীয় কোম্পানির কাপড়ের টুকরো কেনার পরিমাণ লক্ষের ওপরে চলে যেত। আট থেকে দশ মাস আগে ভারতে ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি

বিলেতে পাঠানো নমুনার ওপর আগাম দিত। অর্থাৎ ভারতে জাহাজ আসার আগে এই মাল কুঠিতে এসে যাওয়া দরকার। এর ফলে চুক্তির মধ্যে কি ধরণের মাল, কবে পাওয়া যাবে এবং বণিকের নাম দেওয়া থাকত। নমুনা মতো মাল না এলে হয় ফেরত দেওয়া হতো অথবা দাম কমিয়ে দেওয়া হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজরা এই ধরণের অপছন্দের মাল বন্ধ করে রাখত যাতে ঐ সব মাল আবার না আসে। ভারতীয় বণিকরা অবশ্য এর প্রতিবাদ করত এই বলে যে, এর ফলে তাদের ক্ষতি হচ্ছে। কোনো কারিগরই একসঙ্গে একই ধরণের দুটো টুকরো তৈরি করতে পারত না। এছাড়া একবার মাল ফেরত এলে এগুলি ভারতের বাজারে বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এর ফলে ভারতীয় বণিকরাও চাইত দেরি করে মালের যোগান দেওয়া; বিশেষত তারা চাইত, জাহাজ আসার ঠিক আগেই মাল যেন দেওয়া হয়। এর ফলে কুঠি থেকে মাল ফেরত দেবার সম্ভবনা কম থাকত। মাল ফেরৎ দিলে জাহাজ খালি যাবে এবং বাকি মাল পাঠানোর খরচও বাড়বে।

ভারতীয় কারিগররা দুভাবে এই চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন করত। একদল ছিল যারা পরম্পরা মেনে খোলা বাজারের জন্য বিভিন্ন ধরণের কাপড় তৈরি করত চিরাচরিত পদ্ধতিতে। এরা আবার কোনো কোনো বণিকের জন্য কাজ করত যারা আগাম দিয়ে কাজ করিয়ে নিত এমন ধরণের কাপড়ের, যার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বাস্তবে এই দুটো প্রথা একে অপরকে বাদ দিয়ে চলেছে এমন নয়। যারা কাজের মরসুমে ব্যস্ত, তারাই আবার অন্য সময়ে খোলা বাজারের জন্য কাজ করছে। যেভাবেই হোক না কেন, তাঁতির সঙ্গে আসল ক্রেতার পরিচয় হচ্ছে না। মাঝাখানে কিছু লোক রয়েছে। তাঁতি নিজের টাকাতে করুক বা পরের টাকা নিয়েই করুক, সে বাজারে মাল নিয়ে বিক্রি করার জন্য পাইকারের ওপর নির্ভরশীল। চিরাচরিত প্রথায় ভারতীয় বণিকরা আগাম দিত নগদ টাকা, কাঁচা মাল নয়। এই টাকায় মাল কেনা হতো এবং একজন তাঁতির জীবনধারণ করাও সম্ভব হতো। আরো বড় কথা হলো এই যে, এই টাকায় যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় কেনা যেত। তাঁতি এখানে ঐ আগাম টাকাকে ধরে নিচ্ছে মাল কেনবার জন্য বায়না। অর্থাৎ উভয় পক্ষে একটা বোঝাপড়া হচ্ছে। ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি এটা ভালো করেই জানত এবং সেই জন্য টাকা আগাম দিত। কিন্তু তারা সাধারণত সরাসরি তাঁতির সঙ্গে যোগাযোগ করে নি যদিও ফরাসি বণিক রোক পশ্চিম ভারতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসিদের এই যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি বরং বড় কোনো বণিকের মাধ্যমে এই কাজ করার চেষ্টা করেছে। ঐ বণিক 'অর্ডার' এর ওপর একটা ভাগ নিত যদিও কোনো কোনো সময় কয়েকজন বণিক যৌথভাবে এই কাজটা করেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ইওরোপীয় বাণিজ্যের ফল ভারতীয় অর্থনীতির ওপর পড়তে শুরু করে। ভারতে ইংরাজরা সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিশেষ সুবিধা লাভ করতে পারে নি। এর একটা কারণ মুঘল রাজস্ব প্রধানত আসত জমি থেকে, সামুদ্রিক বাণিজ্য থেকে নয়। ঐ বাণিজ্যকে মুঘলরা কখনোই খুব গুরুত্ব

দেয় নি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুঘলরা বিশ্বাস করত যে, ইংরাজ কুঠি টিকে আছে বাণিজ্যের লাভ থেকে নয়, পরের জাহাজ লুঠতরাজ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে সুরাটের বণিকদের কয়েকটি জাহাজ লুঠ হলে, সম্রাট আওরংজেব ইওরোপীয় বাণিজ্য গুজরাটে ও বাংলায় বন্ধ করে দেন। যথেষ্ট প্রমাণ না-থাকা সত্ত্বেও ইংরাজ কোম্পানির লোকেদের কুঠিতে বন্দী করা হয়। ফরাসিদের লেখা চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, ইংরাজ কোম্পানির জাহাজ এই লুঠতরাজ করে নি যদিও দু-একটি ক্ষেত্রে ইংরাজ নিশান ঐ জলদস্যুদের জাহাজে দেখা গেছে। ফরাসিদের এই নিষেধ থেকে কিছু সময় পরে ছাড় দিলেও ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। সুরাটের বৈদেশিক বাণিজ্য কয়েক বছরের জন্য একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এটা হয়ত সবটা সত্যি নয়, কিন্তু মুঘলদের বাণিজ্য সম্বন্ধে তাদের ধারণার কিছু আভাস পাওয়া যায়। এই ধারণাটা অবশ্য পরে বদলে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে সুরাটে মুঘল অভিজাতরা যে বাণিজ্য করতেন, টাকা লগ্নি করতেন, লোক রাখতেন তার প্রমাণ আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইওরোপীয় ব্যক্তিগত ও কোম্পানি বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার হয় যার ফলে ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাঁতি, বণিক ও অন্যান্য কারিগরদের ওপর কর বসাতে থাকে। এই প্রসার বাংলায় সব চেয়ে বেশি হয়। ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসি ও পরে দিনেমারদের কাপড় কেনার ফলে বাংলার বস্ত্রশিল্পের প্রসার হয় এবং বহু লোকের চাকরির সুযোগ-সুবিধা এসে যায়। ইংরাজ কোম্পানি বাংলার এই অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে অবহিত ছিল। ১৭৪৮ সালে লণ্ডন থেকে কলকাতার ইংরাজদের জানানো হয়, নবাবের রাজস্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা বিশাল অঙ্কের টাকাপয়সা বাংলায় নিয়ে আসছে। কলকাতা যদি ফরাসিদের হাতে চলে যায়, তাহলে তারা এ-সবই বরবাদ করে দেবে। সতের শতকের শেষ দশক থেকে ভারতে ফরাসি বাণিজ্য ক্রমশ খারপ হতে থাকে। মুঘলদের নিষেধ উঠে গেলেও ওলন্দাজদের সঙ্গে ইওরোপের যুদ্ধের ফলে ওলন্দাজরা গঙ্গার মুখে জাহাজ রেখে ফরাসি জাহাজের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। সুরাটে জাহাজ না আসার ফলে ফরাসিদের প্রচুর ধার হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নতুন ফরাসি কোম্পানি গঠন হলেও সুরাটে ফরাসিদের অবস্থার উন্নতি হয় না। বাংলায় অবশ্য জাহাজ আসে এবং চীন, ম্যানিলা ইত্যাদির সঙ্গে পণ্ডিচেরির বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে ওঠার ফলে ফরাসি বাণিজ্য ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে হুগলিতে দিনেমারদের সঙ্গে মুঘলদের গোলমাল হলে দিনেমাররা বাংলা থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। ফলে সুরাটে গোলমাল করতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতকে আবার তারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইওরোপীয় বাণিজ্যের প্রধান ধারা দূরপ্রাচ্যে চলে যায় যার ফলে মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরির উন্নতি অব্যাহত থাকে।

গ. ভারতীয় বণিক, রাষ্ট্র ও ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য :

সম্পূর্ণ সংখ্যা-তথ্যের অভাব সত্ত্বেও মধ্যযুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, তার কাঠামো ও বণিকদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। যেটুকু সংখ্যার খবর পাওয়া যায় তা থেকে এটা খুব পরিষ্কার যে, ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতীয় বণিকরা ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে প্রধান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইওরোপীয় কোম্পানির জাহাজ ভারতীয় জাহাজকে ইওরোপীয় বাণিজ্য থেকে হটিয়ে দেয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসা প্রধানত গুজরাটি মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। এরা খাম্বাজ ও মালাক্কার সমুদ্র পথ ধরে বাণিজ্য করত। ভারতীয় বণিকরা লোহিত সাগর ও পারস্য উপমহাসাগরে বাণিজ্য করত বটে তবে আরব সমুদ্র প্রধানত ছিল আরব বণিকদের হাতে। চীন ও মালয়ের মধ্যেকার বাণিজ্য ছিল চীনা বণিকদের হাতে। মালয় ও জাভার জাহাজ চলত ইন্দোনেশিয়ার জল পথে। ভারতের উপকূলবর্তী বাণিজ্য ছিল মুসলমান বণিকদের হাতে। ভেতরের স্থলপথ মাল আনা-নেওয়া করে বাণিজ্য বজায় রাখত হিন্দু ব্যবসায়ীরা। কিন্তু এশিয়ার রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের সঙ্গে ও ইওরোপীয় বণিকদের জাহাজ আসার ফলে এর বেশ কিছু পরিবর্তন হয় যদিও এই পরিবর্তন ঐ কাঠামোর মধ্যেই হয়েছিল। ইওরোপীয় বাণিজ্য এই কাঠামোর পরম্পরার মধ্যে হয়েছিল যদিও ইওরোপীয় নৈপুণ্যে এই কাঠামো আরো জোরদার হয়। ইওরোপীয় সাম্রাজ্য তৈরি হলে পর এই কাঠামো বদলে যায়।

পর্তুগিজ বাণিজ্যের বহু দলিল থাকলেও এগুলি প্রধানত *এসতাদা দ ইন্ডিয়া* -র বাণিজ্য নিয়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইওরোপীয় কোম্পানির বাণিজ্যের দলিল পাওয়া যায়। ইওরোপীয় ব্যক্তিগত বাণিজ্য এই দলিল কখনো উঁকিঝুঁকি মারে। ভারতীয় বণিকদের ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের দলিল প্রায় পাওয়া যায় না। এই তিনটি স্তরের বাণিজ্য পর্যালোচনা করলে আমরা সম্পূর্ণ ইতিহাস পাব। কিন্তু প্রয়োজনীয় দলিলের অভাবে সেটা করা সম্ভব নয়। দলিলের লেখকদের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ও লোভ কিছুমাত্রায় ঐ-সব দলিলকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

এ সব সত্ত্বেও আগেকার শতাব্দীর তুলনায় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পর্তুগিজ বাণিজ্যের ইতিহাস একটা ছবি দেয়। টোমে পিরেসের *সুমা ওরিয়েন্টাল* বইতে তিনি চীনের থেকে মালাক্কা ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ কত প্রয়োজনীয় সেটা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। পঞ্চদশ শতকে চীন, ভারত ও জাভার বণিকদের কাছে মিলনক্ষেত্র হিসাবে গড়ে ওঠে মালাক্কা।

১৫০৫ সালে পর্তুগিজ রাজার প্রতিনিধি ভারতের শাসক হিসাবে শুরু করলে পর পর্তুগিজদের আগ্রাসী ভূমিকা আরো বেড়ে যায়। দুটি বিষয় থেকে পর্তুগিজদের অর্থনৈতিক ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে তারা বুঝতে পারে যে, লোহিত সাগরের পথের থেকে উত্তমাশা অন্তরীপের পথ বেশি লাভজনক নয়। এর ফলে

১৫০৩ সাল থেকে পর্তুগিজরা মক্কার পথ বন্ধ করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে তারা দেখতে পায় যে, এশিয়াকে দেওয়ার মতো ইওরোপের প্রায় কিছুই নেই। মশলা কিনতে গেলে নগদ টাকায় কিনতে হবে এবং যার ফলে বাণিজ্য ইওরোপের বিপক্ষে। পশ্চিম সুদানের সোনা আটলান্টিক পথের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। এ-পথে সোফালা, মোজাম্বিক ও কিলওয়া পড়ে যেখান থেকে পর্তুগিজরা এই সোনা ধরতে পারবে। এই সব বন্দর থেকে পর্তুগিজরা এশিয়াতে যাবার জল ইত্যাদিও পাবে। এর ফলে পর্তুগিজ বাণিজ্যের চেহারাটা আমরা একটা ত্রিভুজের মতো দেখতে পাই— মালাবার, লোহিত সাগর ও মোজাম্বিকের উপকূল ধরে।

ভারতীয় ও আরব বণিকরা মালদ্বীপ হয়ে মশলা লোহিত সাগরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত পর্তুগিজদের চোখ এড়িয়ে। ফরাসি ঐতিহাসিক ফার্নান্দ ব্রদেল এর থেকে মন্তব্য করেছেন যে, পর্তুগিজরা ক্রমশ শুল্কবিভাগের আমলাতে পরিণত হয়েছিল।

১৫০৬ সাল থেকেই পর্তুগিজদের মধ্যে চেষ্টা চলে মালাক্কার সুলতানের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তির। আলফানসো দ আলবুকার্ক-এর শাসনের সময়ে পর্তুগিজদের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরা ১৫১০ সালে গোয়া, ১৫১১ সালে মালাক্কা নিয়ে নেয় এবং ১৫১৭ সালে হরমুজ বন্দরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। অর্থাৎ একদিকে যেমন পর্তুগিজরা পারস্য উপসাগরের কাছে আসে হরমুজের সাহায্যে, অন্যদিকে মালাক্কা দখলের পর দূরপ্রাচ্য আরো কছে চলে আসে। ১৫১১ থেকে ১৫১৩ সালের মধ্যে পর্তুগিজরা মলুকাস, চীন, শ্যামদেশ ও পেগুতে চলে আসে। এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার বাণিজ্য দখল করা ও মালাবার-ইওরোপ বাণিজ্য নিজেদের হাতে আনা। এর ফলে বাংলা, করমণ্ডল উপকূল ও সমুদ্রতীরবর্তী অন্যান্য জায়গা সম্বন্ধে তাদের উৎসাহ বাড়ে।

আগেই আমরা দেখেছি যে, মশলা নগদ টাকায় কিনতে হতো যার ফলে পর্তুগিজরা পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছে যায় সোনার সন্ধানে। ওখানে পর্তুগিজরা গুজরাটের তাঁতের কাপড়, মশলা, বিভিন্ন ধরণের ওষুধ, সুগন্ধি এবং মূল্যবান কাঠের সন্ধান পায় যেগুলো এসেছিল এশিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে— প্রধানত বাংলা ও করমণ্ডল থেকে। এর ফলে পর্তুগিজরা ভারতীয় মহাসাগরের বাণিজ্যপথের সঙ্গে মিশে যায় এবং বঙ্গোপসাগরের দিকে ক্রমশ ঝুঁকতে থাকে। যতই পর্তুগিজ রাজাদের আর্থিক অনটন বাড়তে থাকে ততই আলবুকার্ক রাজাকে বোঝাতে থাকেন বাংলার প্রয়োজনীয়তাও। এবং বাংলায় ইওরোপীয় মালের প্রভূত চাহিদার কথা।

একদিকে পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রণ লোহিত সাগরের ওপর বাড়ছে, অন্যদিকে পর্তুগিজ রাষ্ট্র এশিয়ার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অধিকতর অংশ নিচ্ছে। আর এর থেকেই, পর্তুগিজ রাষ্ট্রের বিরোধী একটি ধারার জন্ম হয় যেটি একটি সমান্তরাল অর্থনীতির সৃষ্টি করে। যতই পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রণ এশিয়াতে বাড়তে থাকে ততই পর্তুগিজদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য এই নতুন অর্থনীতিকে জোরজার করে তুলতে থাকে। এছাড়াও এশিয়ার ভূখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় পর্তুগিজরা ঘাঁটি তৈরি করার পর তাদের প্রয়োজনীয় খাবারের অসুবিধা

দেখা দেয়। হরমুজ, মালাক্কা বা মালাবারের বিভিন্ন ঘাঁটি খাদ্যদ্রব্যে স্বনির্ভর নয়। এসব জায়গার খাবার বহুদূর থেকে আসত। কানাডা থেকে চাল আসত হরমুজের জন্য। মালাক্কার খাদ্যদ্রব্য আসত শ্যাম দেশ, জাভা ও পেগু থেকে। সুতরাং মালাক্কা দখলের পর পর্তুগিজরা বাংলার দিকে দৃষ্টি দেবে এটা আশ্চর্য কিছু নয়। বাংলার বন্দর থেকে কাপড় ও চাল পর্তুগিজ *এস্তাদা দ ইণ্ডিয়া*-র পক্ষে অপরিহার্য ছিল।

ভারতীয় বণিকদের মধ্যে গুজরাটের মুসলমান বণিক গোষ্ঠী প্রধান ছিলেন কিন্তু করমণ্ডল উপকূলের হিন্দু বণিকরা ও বাংলার বণিকরাও মালাক্কায় আসতেন যদিও সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগে ছাড়া এসব দেশের কোনো উল্লেখ নেই। শুধু মুকুন্দরামের একটি পঙ্‌ক্তি এর ব্যতিক্রম।

ভারতীয় ও চীনা বণিকদের ইন্দোনেশিয়া থেকে মশলা কেনার উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়াও ভারত ও চীনের বণিকরা নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য করত। ভারতীয় বণিকরা মশলা ছাড়া চীনাদের থেকে চীনামাটির পাত্র ও রেশম নিয়ে ফিরত। চীনারও প্রচুর পরিমাণে মরিচ কিনত মালাক্কা থেকে, যার প্রধান অংশ আসত মালাবার থেকে। খাম্বাজের কর্নেলিয়ান পাথর, ধূপ ও চন্দনকাঠের বাজার চীনাদের ভালো ছিল। তবে এমনও হতে পারে, চীনারা মালাক্কাতে ভারতীয় কাপড় কিনত এবং সেই কাপড় বেচে ইন্দোনেশীয় মশলা কিনত। ভারতীয় জাহাজ চীনদেশে যেত বলে মনে হয় না যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকে চীন সম্রাট চাইছিলেন যে, চীনা বণিকরা ভারতীয় মহাসাগরে যাতায়াত করুক। ১৪০৫ থেকে ১৪৩৫ সালের মধ্যে চীনা নৌবহর সাতবার ভারতীয় মহাসাগরে ঘুরেছে। এর মধ্যে তারা গিয়েছে হরমুজ, এডেন এবং পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে। ১৪২০-র দশক থেকে উত্তরদিকে মঙ্গোল আক্রমণের ফলে চীনা রাজধানী নানকিং থেকে পিকিং-এ সরে যায়। ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্য নীতিরও কিছু পরিবর্তন ঘটে। চীনা নৌবহর ভারতীয় মহাসাগর থেকে সরে গেলে জলদস্যুদের আবির্ভাব হয়। এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য পরবর্তী কালে চীনারা সমুদ্র এলাকা থেকে চীনদেশে আসার ওপরে নানা বাধানিষেধ আরোপ করে।

ভারতীয় বণিকদের জাহাজ জলদস্যুদের মোকাবিলা করা বা সামুদ্রিক ঝড়ের মধ্যে জাহাজ চালনা করার মতো শক্তি ধরত না। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় কাপড়ের বিরাট চাহিদা ছিল এবং ভারতীয় জাহাজ উত্তর সুমাত্রা ও কাছাকাছির বন্দর পামাইতে যেত। গুজরাটি জাহাজ যেত দক্ষিণ সুমাত্রারা বিভিন্ন বন্দরে। মশলা দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল না যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এইসব দ্বীপপুঞ্জের লোকরা ভারতীয় কাপড়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। জাভার জাহাজ এই সব ভারতীয় কাপড় নিয়ে মশলা দ্বীপপুঞ্জে যেত। মালাক্কার মশলার বাণিজ্য ছিল জাভার বন্দর গ্রীজ-এর একচেটিয়া। এর মধ্যে কিছু ভারতীয় বণিক ছিল যারা গ্রীজে বসবাস করে এই বাণিজ্য চালাত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বণিকরা ভালোভাবেই ছিল।

পশ্চিমদিকে ভারতীয় বাণিজ্য সমুদ্রের দুটি পথ ধরে চলত। একটি ছিল লোহিত

সাগর দিয়ে কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে আর অন্যটি ছিল পারস্য উপসাগরের মধ্য দিয়ে বসরা ও বাগদাদ পর্যন্ত। লোহিত সাগরের উত্তর দিকের নিয়ন্ত্রণ ছিল সিরিয়া ইজিপ্টের মামলুক সুলতানদের হাতে। ভারতীয় বণিকরা তাদের পণ্য নিয়ে আসত লোহিত সাগরের বিভিন্ন বন্দরে। এর মধ্যে প্রধান ছিল হজ তীর্থযাত্রীদের বাজার যেখান মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন কারাভান এসে পৌঁছত। এখান থেকেই হাত বদল হয়ে ভারতীয় পণ্য যেত ইওরোপের বাজারে। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বন্দর ও শহরে ভারতীয় পণ্য বিক্রি হতো।

লোহিত সাগর ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য চালাত প্রধানত কায়রোর এক বণিক সম্প্রদায় যাদের *কারিম* বলা হতো। এই লোহিত সাগরের বাণিজ্য বাড়ার পিছনে একটা ইতিহাস আছে।

দশম শতাব্দীর শেষ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের দিশা বদলে যেতে থাকে। আব্বাসীয় খালিফাদের পতন এবং ইজিপ্টে ফতিমাইদ বংশের উন্নতির ফলে বাগদাদ ও দামাস্কাস থেকে বাণিজ্য সরে গিয়ে এডেন ও ফুস্তাত (কায়রো)-এ চলে যায়। দিল্লির সুলতানরা চর্তুদশ শতাব্দীর প্রথমে গুজরাট জয় করার ফলে এখানকার সম্পদশালী বন্দরগুলি ইসলামীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে পড়ে। একই সময়ে দেখা যায়, ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ সব মুসলমান ধর্মে আকৃষ্ট হচ্ছে। এর সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের স্পেন থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হচ্ছে ও ভেনিস ও জেনোয়ার উন্নতি হচ্ছে। লোহিত সাগরে ফতিমাইদের নিয়ন্ত্রণ ও বাণিজ্য আসার ফলে আলেকজান্দ্রিয়ার গুরুত্ব বেড়ে যেতে থাকে। পুরোনো কায়রো *আল ফুসতাত* থেকে যে-সব চিঠিপত্র পাওয়া গেছে তার মধ্যে *সেনিজা* কাগজ উল্লেখযোগ্য। এর থেকে আমরা পশ্চিম ভারত মালাবার উপকূল, এডেন ও ফুসতাতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক দেখতে পাই।

এই *গেনিজা* কাগজের মধ্যে *কারিম* শব্দটি বারবার দেখা যায়। এই বণিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ ঈজিপ্টের কাগজপত্রের মধ্যেও পাওয়া যায়। এরা প্রধানত লোহিত সাগর দিয়ে মশলার বাণিজ্য করত। প্রখ্যাত পণ্ডিত এস.ডি. গেয়াতেইন বলেছেন যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে কারিমরা কোনো বণিক গিল্ড নয়- এরা খুব সম্ভবত বাৎসরিক সমুদ্রযাত্রার বড় দল। হাজার খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ইওরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্য বিপুল প্রসার লাভ করে যার ফলে বণিকরা দল বেঁধে সমুদ্রযাত্রায় যেত জলদস্যুদের হাত থেকে নিজেদের জাহাজ বাঁচানোর জন্য। কারিমদের কার্যকলাপ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, জাহাজী ব্যবসাটা প্রধানত আরবদের হাতে ছিল যদিও পণ্ডিত গেয়াতেইনের মতে, এর সঙ্গে ইহুদী, হিন্দু ও মুসলমান বণিকরাও ছিল । প্রধানত মনে করা হয় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা আসার আগেই কারিমদের পতন শুরু হয়েছিল। বোধ হয় ১৪৭০ সালের আগেই কারিমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

পারস্য উপসাগর এলাকায় অবশ্য এই ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

হরমুজের বাণিজ্যিক প্রসার ঠিকই ছিল— মাসকট হয়ে বসোরা পর্যন্ত তার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। গুজরাটিরা পারস্যের বিভিন্ন শহরে বসতি স্থাপন করেছিল যার প্রমাণ আমরা অধুনা প্রকাশিত রুশদেশীয় দলিলগুলি থেকে পাই। কিন্তু পারস্যের অভ্যন্তরে এদের যাতায়াত ছিল না, পশ্চিমের তুলনায় অবশ্য পূর্বদিকে ভারতীয় বণিকদের প্রাধান্য বেশি ছিল।

গুজরাটিরা আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে বসতি শুরু করেছিল। গুজরাটি জাহাজ যেত কিলওয়া মোম্বাসা মালিন্দি ও পাটেতে। কাপড়ের বদলে তারা নিয়ে আসত সোনা ও হাতির দাঁত। ঐ সব আফ্রিকার রাজ্যগলি অধিকাংশই ছিল আরবদের দখলে। পর্তুগিজদের আসার আগে ভারতীয় মহাসাগরে আরব ও ভারতীয়দের একযোগে বাণিজ্য করার উদাহরণ এর থেকে বড় বোধ হয় আর নেই।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে আমরা আরব ও পারসিক বণিকদের বসতি স্থাপন করতে দেখি। অন্তত দশম শতাব্দীর থেকে ঐ বণিকদল খাম্বাজে ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত গুজরাটের সুলতানদের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর ছিল খাম্বাজ। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ থেকে বড় জাহাজগুলি খাম্বাজের বিপরীতে গোগা বন্দরে আসতে থাকে। যদিও বলা হয় যে, পলিমাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাম্বাজ বন্দরের অবনতি শুরু হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। মালিক আয়াজের নেতৃত্বে দিউ বন্দর উঠতে থাকে এবং লোহিত সাগর অভিমুখী বাণিজ্যের প্রধান বন্দর হয়ে ওঠে। সুরাট দিউ-এর ধ্বংস চায় কারণ ঐ বাণিজ্য সে হস্তগত করতে চায়। এছাড়া আহমদনগর ও বিজাপুরের কোঙ্কন এলাকার কয়েকটি বন্দর ছিল যার মধ্যে চাউল, দাভল, গোয়া ও ভাটখল উল্লেখযোগ্য। বিজয়নগরের সাম্রাজ্যের বিশাল চাহিদা ছিল। কালিকট বন্দর থেকে আরব বণিকরা এডেনে যেত।

করমণ্ডল উপকূলে মসুলিপত্তনম তখন সবে শুরু হয়েছে। বাংলায় সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম বন্দর হিসাবে কাজ করছে। পূর্ব বাংলায় শ্রীপুর সোনারগাঁও-এর বন্দর হিসাবে ছিল। সপ্তগ্রাম তখন ধীরে ধীরে পড়ে আসছে বলে বলা হয় যদিও সমকালীন বাংলা সাহিত্য থেকে বোঝা যায় যে, সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী শহর অবধি প্রসারিত হওয়ার ফলে তার বাজার অক্ষুণ্ণ ছিল। সতের শতকের গোড়া অবধি সপ্তগ্রামের বাজার ও শহর প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। হুগলি থেকে পর্তুগিজরা বিতাড়িত হওয়ার পর মুঘলদের শুল্কবিভাগ হুগলিতে চলে যায়। সপ্তগ্রাম এরপর জনশূন্য হয়ে পড়ে। এছাড়া সিন্ধুতে ছিল লাহিড়ী বন্দর। সব মিলিয়ে মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় মহাসাগরে বড় বড় বন্দরের সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছোটো কতকগুলি বন্দর থাকত যেগুলি মালের গুদাম ও পরিবেশক হিসাবে কাজ করত।

সারা মুঘল যুগেই কাপড় ছিল মুঘল ভারতের প্রধান রপ্তানি। এর অধিকাংশই ছিল মোটা কাপড় এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ ও লোহিত সাগরের সাধারণ লোকরাই এই কাপড় পরত। দামী কাপড় খুব বেশি এদিকে বিক্রি হতো না। ওলন্দাজ কোম্পানি

করমণ্ডলের দামী কাপড় মোখায় বিক্রি করতে যেত। গুজরাটি সস্তা কাপড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিন্তু তারা এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হটে যায়। লোহিত সাগর সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, শুধু সস্তা কাপড়ই বেশি বিক্রি হতো তা নয়। অন্যান্য পণ্যের সস্তা সামগ্রীরই চাহিদা ছিল সব থেকে বেশি। তবে বাংলা ও করমণ্ডলের দামী কাপড়ও বিক্রি হতো। কিন্তু আপামর জনসাধারণের কাছে সস্তা কাপড়ের চাহিদা ছিল বেশি।

কাপড় ছাড়া ভারত থেকে রপ্তানি হতো চাল, ডাল ও তেল। উড়িষ্যার ও মালাবারের উত্তরদিকে এগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হতো এবং এই খাদ্যদ্রব্য প্রধানত যেত মালাবার ও সুরাট ছাড়া, মালাক্কা, হরমুজ ও এডেনে। ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের লাভ এমনিতেই কম ছিল। খাদ্যদ্রব্যের বাণিজ্যেও তাই লাভ কমই হতো। এছাড়া ছিল নারকেল ও কয়েক ধরণের মশলা। বাংলা মঙ্গল কাব্যের সওদাগররা যে যে সামগ্রী সিংহলে নিয়ে যেতেন, তার মধ্যে ছিল এগুলিই প্রধান। এর থেকে বলা যায় যে, বেশি সংখ্যক সামগ্রী যা যেত তা অধিকাংশই সস্তা ধরণের এবং এছাড়া জীবনধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের রপ্তানির বিন্যাস সারা মুঘল যুগ ধরে প্রায় একরকম ছিল। বাংলা থেকে কাঁচা রেশম ও চিনি। গুজরাট থেকে তুলো এবং মালাবার থেকে মরিচ রপ্তানি হতো। বাংলা ও গুজরাটের মধ্যে কাঁচা রেশম ও তুলোর বিনিময় ছিল। বাংলা, গুজরাট ও করমণ্ডল থেকে নীল রপ্তানি হতো। এছাড়াও প্রতিটি বন্দর থেকে আরো ছোটোখাটো রপ্তানি হতো। যেমন বাংলা থেকে ছিল লাক্ষা ও মোম এবং করমণ্ডল থেকে চামড়া। সব থেকে বড় পরিবর্তন ভারতীয় মহাসাগরে আসে যখন ভারতীয় বণিকরা মশলার জাহাজী ব্যবসায় মার খায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এর ফলে কাপড়ের বাণিজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ইওরোপীয় জাহাজ আসার পর মরিচ ও নীল রপ্তানির ব্যবসা ভারতীয়দের কাছ থেকে ইওরোপীয়দের হাতে চলে যায়।

ভারতে প্রধানত আসত সোনা, রুপো ও তামার তাল, মশলা এবং ঘোড়া। এছাড়া মালয় থেকে টিন, পূর্ব আফ্রিকা থেকে হাতির দাঁত এবং পারস্য উপসাগর থেকে রঙ করা কাঠ। এছাড়াও বিভিন্ন মন্দরে আসত মদ, গোলাপজল, ফল ও ওষুধ যার পরিমাণ বেশি ছিল না। এই বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এখানে পশ্চিম-এশিয়ার বাজারের অসীম গুরুত্ব রয়েছে। মোখাকে বলা হতো মুঘলদের স্বর্ণভাণ্ডার। পারস্য উপসাগর এলাকা থেকে ভারতীয় বণিক সোনা, রুপো নিয়ে আসত। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করে ভারতের টাকাপয়সা বিশেষ আয় হতো এমন নয়। বরং কোনো কোনো সময়ে নিজের খরচে মশলা কিনতে হতো বিশেষত যখন ওলন্দাজরা ঐ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছিল। ইওরোপ থেকে সরাসরি যে টাকা পয়সা আসছিল সেটাও এমন বেশি কিছু নয়। জাপান থেকে ইওরোপীয়রা তামা আনতে শুরু করলে আমদানি কিছুটা বাড়ে।

সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ভারতীয় মহাসাগরের

বাণিজ্য প্রধানত জাহাজী বণিকদের হাতে থাকে। ইওরোপীয়রা এর মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের জাহাজের মাল নেওয়ার ভাড়া বেশি থাকার ফলে তারা সুবিধা করতে পারে নি। এছাড়া ভারতীয় বণিকরা প্রধানত ভারতীয় জাহাজে মাল পাঠাতে চাইত। তাদের দেশীয় পরম্পরা, নিজেদের ভাষা ইত্যাদির ফলে সুবিধা হতো দেশীয় জাহাজে মাল পাঠানোয়। ভারতীয় জাহাজীরা নিজেদের বিভিন্ন জাহাজের মধ্যে মাল ভাগ করে পাঠানোর ফলে ঝুঁকিও কম ছিল। ইওরোপীয় কোম্পানির জাহাজী আমলারা নিজেদের জন্য আলাদা টাকা ইত্যাদি চাইত যেগুলি সম্বন্ধে ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি অবহিত ছিল না।

ভারতীয় জাহাজের মালিকরা জাহাজে লগ্নি করতে চাইত না কারণ ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিতে এই জাহাজগুলো চলত। যৌথ মালিকানাও অজানা ছিল না কিন্তু তা ছিল খুবই বিরল। সমকালীন জাহাজের দাম পাওয়া যায় না কিন্তু এটা মনে করা যায় যে, জাহাজের পিছনে লগ্নির একটা বড় অংশ চলে যেত। এর মাত্র শতকরা ত্রিশভাগ একবছরে পাওয়া যেত এবং পশ্চিম ভারতীয় মহাসাগরে এর থেকে শতকরা ২০ ভাগ বেশি ছিল। জাহাজের বীমা করার নিদর্শন পাওয়া যায় না, যদিও মালের বীমার প্রচুর নিদর্শন আছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, কেন জাহাজে লগ্নি করার প্রবণতা কম ছিল— সুরাটের মোল্লা পরিবার অবশ্য এর ব্যতিক্রম। সাধারণত ভারতীয় বণিকরা দু-একটার বেশি জাহাজ রাখত না। ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে ইসলামধর্ম আসার ফলে গুজরাট থেকে বাংলার উপকূলের সমুদ্রগামী লোকজন প্রায় সবই ছিল মুসলমান। জাহাজের মালিকরা ও খালাসিরা প্রায় সবাই মুসলমান। হিন্দু বণিকরা প্রধানত দেশের ভেতর থেকে জাহাজের মাল চালান দিত। তবে তাদের বাইরে যাওয়ার দৃষ্টান্তও আছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত ভারতীয় বণিকদের একটা গোষ্ঠীকে দেখা যায়, যারা দামী মাল নিয়ে লোকজন সমেত সমুদ্র যাত্র করত। বাংলা মঙ্গলকাব্যে আমরা সওদাগরের এই ছবিটা পাই। এছাড়া ছিল অন্য ধরণের বণিক যারা প্রধান বণিকের পক্ষে থেকে যাচ্ছে। অনেক সময় ভারতীয় জাহাজে *নাখুদা* বা কাপ্তান এই দুই ধরণের কাজ করত। নিজের জাহাজে নিজের মাল নেওয়া ছাড়া অন্যের মাল নিয়ে যেত। সাধারণ বণিকরা সংখ্যায় ছিল বেশি। এরা অল্প মাল নিয়ে বিভিন্ন বন্দরে বন্দরে ঘুরত।

সম্রাট জাহাঙ্গীর গুজরাটে গিয়ে দেখেছিলেন যে, খাম্বাজ বন্দরে বহুসংখ্যক বণিক, জাহাজ এবং খালাসি আছে। দূরপাল্লার সমুদ্রযাত্রায় দক্ষ লোকের প্রয়োজন। উপকূলের জেলে বা অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে জাহাজী মালিক, খালাসি ইত্যাদিরা স্বতন্ত্র ছিলেন। পঞ্চদশ শতকের শেষে পশ্চিম ভারতে সমুদ্রযাত্রার কলাকৌশল গড়ে উঠেছিল। পর্তুগিজ ঐতিহাসিক টমে পিরেস গুজরাটিদের সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতার ও কৌশলের প্রশংসা করেছেন যদিও আবুল ফজলের মতে, মালাবারীরা সব থেকে ভালো। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক পথের ঠিকানা করমণ্ডল উপকূলের লোকেরা ভালো রাখত। বাংলা

ও উড়িষ্যা থেকেও ভালো খালাসি পাওয়া যেত।

ছোটো বণিকরা সংখ্যায় বেশি যদিও তাদের লাভ কম। কিন্তু ব্যবসা থেকে তাদের হটানো সহজ ছিল না। গুজরাটের সবথেকে বড় বণিক, আবদুল গফুর লোহিত সাগর বাণিজ্যে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে এদের সঙ্গে পেরে ওঠেন নি। ছোটো হলেও তাদের অধিকার খর্ব করা মুঘল যুগে সম্ভব হয় নি। ইংরাজদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করলে তারা ঐ ছোটো বণিকদের হটিয়ে দেয়। ফলে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সমঝোতা ছিল— সংঘর্ষও ছিল।

জাহাজে মাল চালানোর জন্য প্রত্যেক বন্দরে ছিল কিছু বণিক যারা দালালের কাজ করত। বড় বড় বণিকরা এদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এদের মধ্যে আরব, পারসিক বা ইওরোপীয়দের মধ্যে কোনো তফাত নেই। এরাও আবার দেশের ভেতরের মালের জন্য অন্যাদের ওপর নির্ভর করত— যার ফলে আমরা বন্দর থেকে শুরু করে দেশের অভ্যন্তর পর্যন্ত একটা শৃঙ্খল দেখতে পাই।

বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে আমরা স্থানীয় যোগসূত্রও দেখতে পাই। যেমন, বন্দরে টাঁকশালে *শ্রফ* ছিলেন যারা তাল থেকে মুঘল টাকা তৈরি করে দিতেন। কাগজে কলমে মুঘল টাঁকসালে যে কোনো লোকই টাকা তৈরি করাতে পারত। এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন *শ্রফ* যদিও টাঁকশালের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন একজন দারোগা, যিনি টাকা তৈরির খরচ নিতেন শতকরা ৫/৬ ভাগ হিসাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুরাট থেকে প্রাপ্ত সূত্রে পাওয়া যে, শ্রফরা এই সব লোকেদের সঙ্গে আলাদা বন্দোবস্ত করতেন কারণ শ্রফ চাইলে ছয়মাস পর্যন্ত দেরি করিয়ে দিতে পারেন। যেহেতু মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাল আসত সুরাটে অগাস্ট ও সেপ্টেম্বরে, ফলে ঐ সময় টাঁকশালের ওপর চাপ পড়ত খুব বেশি। শ্রফরাও ঐ সময় তাদের দস্তুর বাড়াতেন।

নীল কেনার মধ্যেও ঝুকি ছিল। গুজরাটের ছোটো ছোটো শহরে বারো বছর ধরে দালাল বা বণিকদের মাধ্যমে নীল কিনেছেন, এরকম একজন ইওরোপীয় বণিকের বক্তব্য হলো যে, নীলের মধ্যে কতটা বালু, তেল আর কাঠের গুঁড়ো মেশানো আছে তা ধরা যায় না। সুতরাং বড় বণিক হলেও, বা টাকা থাকলেও এই সব ছোটো ছোটো বণিকের সাহায্য দরকার। এর ফলে ছোটো বণিক বা দালাল আলাদাভাবে কাজ করে এবং ক্রয় বা পরিবেশনের কোনো কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা ছিল না।

রাষ্ট্র এর মধ্যে কদাচিৎ নাক গলাত— তাদের প্রধান কর্তব্য ছিল খাজনা সংগ্রহ করা। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, লোহিত সাগর বা ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের মতো উপকূল রাষ্ট্র ভারতে খুব কমই ছিল। কালিকটের রাজা বাণিজ্য সম্পর্কে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিলেন এবং গুজরাটের সুলতানও এ-ব্যাপারে মাথা ঘামান নি। গোলকুণ্ডা বা মুঘল রাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক বেশি উদাসীন ছিল। এর কারণ অবশ্য এই যে, তাদের রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব ও আনুষঙ্গিক কর। অধ্যাপক পিয়ারসন দেখিয়েছেন যে, গুজরাটের রাজস্বের শতকরা নব্বই ভাগের বেশি আসত ভূমি-রাজস্ব থেকে। অত্যন্ত বিপদের সময় স্থানীয় প্রশাসনই বণিকদের

সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে।

রাষ্ট্রের উদাসীনতা থাকলেও কোনো কোনো অভিজাত প্রচুর বাণিজ্য করতেন বা বাণিজ্যের থেকে লাভও করতেন। গোলকুণ্ডার মীর জুমলা বা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বাংলার সুবাদার আজিম উনশান একচেটিয়া ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এই ধরণের মুঘল অভিজাতরা ব্যবসার মধ্যে এসেছিলেন এ-কথা ফরাসি বণিক মার্তা লিখেছেন। সুরাটে তাদের প্রতিনিধিও ছিল। বাংলায় ঐ সময়ে মুঘল অভিজাতদের প্রচুর জাহাজ ছিল। অষ্টদশ শতকের প্রথমার্ধে ত্রাভাঙ্কোর রাজ্য বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার বসিয়ে এই পরম্পরার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিল। সুতরাং বিদেশীদের লেখায় যে পাওয়া যায়, হিন্দু বাণিয়ারা মুঘল রাষ্ট্রে ভয়ে ভয়ে থাকত, এটা নিছকই গল্প কথা। সুরাটে ১৬৮০ সালের আগে বাণিয়াদের বড় বড় বাড়ি ছিল এবং তারা সপ্তাহান্তে বাগান বাড়িতে যেত— এর প্রচুর উল্লেখ আছে। হিন্দু বাণিয়ারা সাধারণ জীবনযাপন করত। তার থেকে অবশ্য এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, তারা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাত। মুসলমান বণিকরা আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করত এবং স্থানীয় প্রশাসন টাকার প্রয়োজনে জাতিগত বাছবিচার করত এরকম কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি খাম্বাজ শহরের নবাবের অত্যাচারে আরব বণিকরা সপরিবারে মারাঠাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে টাকা আসলেও উপকূলবর্তী শহরগুলিতে টাকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত না। টাকার সুদ জাহাজ আসার ওপরে নির্ভর করত। যে-টাকা আসত সেটাও চলে যেত তাঁতিদের দাদন দিতে ও অন্যান্য কাজ করাতে। মুঘলযুগের ভারতীয় বণিকরা চাইত না, টাকাটা বাইরে চলে যাক। ওলন্দাজরা একবার টাকা বাইরে পাঠাতে গেলে, সুরাটের ভারতীয় বণিকরা আপত্তি করে।

জিনিসের দাম অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল ছিল। বাইরে থেকে টাকা আসা ছাড়াও, কিরকম ফসল হচ্ছে, বাইরের বাজারের কি অবস্থা— এ সবের ফলে ভারতীয় মহাসাগরের বাজারের দর উঠানামা করত। ভারতীয় বণিকরা এ-সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং আগামী মরসুমের বাজার কিরকম হবে এ-সম্বন্ধে সবরকম খবর তারা সংগ্রহ করার চেষ্টা করতেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক খবরও থাকত। কারণ মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিলে জিনিসপত্রের দাম কমে যেত।

দুরকমভাবে মাল কেনার ব্যবস্থা ভারতীয় বন্দরে ছিল। বড় বড় বণিকরা আগাম টাকা দিয়ে মাল ঠিক করে রাখতেন। ছোটো বণিকরা টাকা দিয়ে যা মাল পাওয়া যায় তাই কিনত যদিও এই ছোটো বণিকদের কথা আমরা কদাচ পাই। এদের কেনার ফলে বাজারের চেহারা অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি খাম্বাজ শহরে এই সব ছোটো বণিকদের কথা পাই, যারা শহরের কারিগরদের নিজেদের কাজে লাগিয়েছিল। ফলে ইংরাজদের কারিগর পেতে খুব অসুবিধা হয়েছিল। এ ছাড়াও পাইকাররা ছিল, যারা তৈরি করা মাল বিক্রি করত আর এর ফলে বাজারের অনিশ্চয়তা ছিল বেশি।

ভারতীয় বণিকদের এই ব্যবসা প্রধানত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হুগলির মথুরাদাস, তার ভাই, দুই ছেলে এবং দুজন বন্ধুকে নিয়ে ব্যবসা চালাতেন। হিন্দু ও মুসলমান মিলিতভাবে ব্যবসা করছে এটা পাওয়া যায় কিন্তু এই ধরণের দৃষ্টান্ত বিরল। প্রধানত পরিবার বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসা সীমাবদ্ধ ছিল। এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ব্যাবসায় গোলমাল হলে সেটা সামাজিকভাবে মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। অর্থাৎ ভারতীয় বণিকরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে ব্যবসা করত না। ইংরাজ ও ওলন্দাজরা জয়েন্টস্টকের ধারণা চাপাতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার বণিকরা সেটা মেনে নেয় নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় নতুন ফরাসি কোম্পানি পণ্ডিচেরিতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই ধরণের কোম্পানি গঠন করে যার মধ্যে কোম্পানির লগ্নি ছিল শতকরা ৪৫ ভাগ। প্যারিস থেকে এই ধরণের কোম্পানি গঠন করা বা তার সঙ্গে কাজ করা নিয়ে আপত্তি করলেও পণ্ডিচেরির ফরাসিরা এই কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্য চালাতে থাকে। প্রধানত পণ্ডিচেরি, বাংলা ও ম্যানিলাতে জাহাজ পাঠানো হয়েছিল যার লাভ সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। পণ্ডিচেরির ভারতীয় বণিকরা এতে আপত্তি করে নি। এর নিয়ন্ত্রণ ভার ছিল ফরাসি কোম্পানির ওপর।

১৫১৬-১৭ সালে সিরিয়া ও ইজিপ্ট দখল করে নেন তুর্কি সুলতান সেলিম। ১৫৩৮ সালে তুর্কিরা লোহিত সাগরের মুখে এডেন দখল করে। পরবর্তী সুলতান সুলেমান তুর্কি সাম্রাজ্য আরো সংহত করেন। ১৫৪৬ সালে পারসিক উপসাগরের মুখে বসরা তুর্কিদের হাতে চলে যায়। পারস্যের শাহ-ইসমাইল ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমে পারস্যের সাম্রাজ্য গঠন করেন। গুজরাট ও বাংলা মুঘলদের হাতে চলে গেলে ভারতীয় মহাসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় সফবিদ, আটোমান ও মুঘল শক্তির আবির্ভাব হয়।

বাণিজ্যে এর ফলাফল কি হয়েছিল সেটা বলা শক্ত। ভারতে মুঘল শক্তির বিজয়ের ফলে পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূল ও তাদের পশ্চাদভূমি এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় স্থলপথে বাণিজ্যও ভারতের সঙ্গে জোরদার হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে পারস্যের বন্দরগুলি ও পশ্চাদভূমির সঙ্গে যোগসূত্র সুদৃঢ় হয়। *হিজাজ* -এ তীর্থযাত্রাতে মুঘল ও সফবিদরা উৎসাহ দিতে থাকে। এটা বলা নিষ্প্রোয়জন যে, সুসংহত শাসনব্যবস্থা ও প্রায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি থাকার ফলে মক্কার বাৎসরিক বাজারের জৌলুষ বাড়তে থাকে। ইয়েমেনের কফির চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বাড়তে থাকে এবং ভারতীয়রা যদিও বেশি কফি নিত না তবুও এই বাজারের উঠতি অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে তারা আরো কাপড় বিক্রি করতে থাকে। লোহিত সাগর থেকে কফি এনে সকাল বিকাল সুরাটের বিভিন্ন বাড়িতে কফি বিক্রি করা হতো সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে– এর প্রমাণ মিলছে। বলা যায় যে, লোহিত সাগর এলাকা মুঘল ভারতের প্রধান রপ্তানির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভারতীয় বাণিজ্য লোহিত সাগরের দিকে জোর দেওয়ার আর একটা কারণ ছিল ১৪১১ সালে পর্তুগিজদের মালাক্কা অধিকার। পর্তুগিজদের সঙ্গে পশ্চিম ভারতীয় মহাসাগরে সমৃদ্ধ মুসলমান বণিকদের লড়ায়ের কারণের জন্য ভারতীয় বণিকরা লোহিত সাগরের বাণিজ্যের দিকে মন দেয়। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমে কালিকট বন্দরে বিদেশী মুসলমান বণিকদের বাণিজ্য যে অনেক কমে গিয়েছিল সে কথা বারবাসা বলছেন। বাংলায় নসরৎ শাহের রাজসভায় পর্তুগিজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাণিজ্য করার জন্য আরব বণিক ও আমলাদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। একদিকে মালাক্কা পর্তুগিজদের দখলে, অন্যদিকে পারসিক উপসাগর প্রায় বন্ধ। এরকম সময়ে ভারতীয় বণিকদের কাছে আর বেশি সুযোগ ছিল না। এই সময়ে হজ-এর গুরুত্ব ও ইয়েমেনের কফির চাহিদা বাড়ার ফলে লোহিত সাগরের বাণিজ্যকে ভারতীয় বণিক আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চীনের বাণিজ্য শুরু না হওয়া পর্যন্ত লোহিত সাগরের বাণিজ্যই ভারতীয় বণিকদের প্রধান ছিল।

গুজরাটি মুসলমান বণিকরা পর্তুগিজদের সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে ছিল এবং পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে মালাক্কার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মালাক্কার পতনের পর গুজরাটি বণিকরা আচিনও জোর দেয়। এর ফলে গুজরাটি ও পর্তুগিজরা মশলার বাণিজ্য আধাআধি ভাগ করে দেয়। পর্তুগিজরা লোহিতসাগরের মুখ বন্ধ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলে আচিন থেকে লোহিত সাগরে মশলার বাণিজ্য বেড়ে যায়।

এদিক থেকে দেখতে গেলে পর্তুগিজদের আগমনে ভারতীয় বাণিজ্য খুব চোট খায় নি যদিও ষষ্ঠদশ শতকের প্রথম তিন দশকে গোলমাল হয়েছিল। ভারতীয় বণিকরা পর্তুগিজদের শুল্ক দিতে হলে পর দিউ বন্দরের রাজস্ব বেড়ে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে গোয়ার রাজস্বের এক-ষষ্ঠমাংশ দিউ-র উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে আসছিল। এছাড়া ১৫২৩ সালের এক চুক্তি অনুসারে হরমুজ থেকে পর্তুগিজরা বার্ষিক নব্বই হাজার টাকা পেত। অন্যদিকে মালাক্কায় পর্তুগিজরা ইসলাম-বিরোধী মনোভাব পরিত্যাগ করে মুসলমান বণিকদের আবার মালাক্কায় আসতে প্রলুব্ধ করে। মালাক্কার হিন্দু বণিকরা পর্তুগিজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। গোয়াতে সারস্বত ব্রাহ্মণ ও গুজরাটের বাণিয়াদের আধিপত্য ছিল এবং দিউতে ছিল সৌরাষ্ট্রের *বাপল* বাণিয়ারা। ফলে ভারতীয়-পর্তুগিজ বাণিজ্য এই সব জায়গায় জোরদার হয়ে ওঠে। পর্তুগিজদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে টাকা লগ্নি করত ভারতীয় বণিকরা। এমনকি ঐ সব জাহাজের খালাসিরাও ছিল গুজরাটি মুসলমান। ভারতের বন্দরের সঙ্গে পর্তুগিজদের বাণিজ্য তাদের ইওরোপের বাণিজ্যের জন্যে প্রয়োজনীয় ছিল। ১৬০০ সাল নাগাদ গুজরাট ও গোয়ার বাণিজ্য প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার মতো ছিল। এবং যা মাল কেনা হতো সেগুলো সবই পাঠানো হতো ইওরোপে। ফলে ইওরোপের অন্যান্য বণিকরা ভারতে বাণিজ্য করতে এলে নানারকম বাধার সম্মুখীন হয়।

পর্তুগিজ বাণিজ্য কতটা ছিল সে-হিসাব পাওয়া শক্ত। এর একটা কারণ বোধ হয় ভারতীয় বাণিজ্য পর্তুগিজদের থেকে আলাদা করা যায় না। পর্তুগিজদের থেকে

এশিয়ার অন্যান্য বণিকরা অনেক বেশি বাণিজ্য করত। একথা অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকদের বেলাতেও খাটে— এটা ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড স্বীকার করে গিয়েছেন। মুঘল যুগে ভারতীয় মহাসাগরের বাণিজ্যের প্রধান অংশ ছিল ভারতীয় বণিকদের হাতে।

ইওরোপীয় বণিকদের অর্থ বেশি থাকলেও, ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা পেরে উঠত না। ভারতীয় বণিক অনেক কম আয়ে ব্যবসা করত এবং তারা শুল্ক ও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাড়াতাড়ি কাজ করত। প্রয়োজন হলে মুঘলরাও ভারতীয় বণিকদের পক্ষ নিত এবং মুঘলদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের দুর্দশা শুরু হয়।

পর্তুগিজদের শক্তিতে কালিকট বন্দর তার পুরোনো অবস্থায় আর ফিরে যেতে পারে নি। ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজ শক্তি বন্দরগুলির সঙ্কট এনে দিয়েছিল, কিন্তু করমণ্ডল এলাকায় ভারতীয় বণিকদের ঠেকানো যায় নি। বাংলায় সাতগাঁও থেকে পর্তুগিজরা হুগলিতে ব্যবসা করে কিন্তু ১৬৩২ সালে মুঘলরা পর্তুগিজদের হুগলি থেকে হঠিয়ে দেয়। পর্তুগিজ আমলে মালাক্কা ও হরমুজ তাদের পুরোনো জৌলুষ হারিয়ে ফেলে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে পর্তুগিজরা তাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করলে ভারতীয় বণিকদের কাছে সুযোগ বেশি আসে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে ওলন্দাজরা আমবোয়ানা দখল করলে তারা দেখে যে, এশিয়ার মুসলমান বণিকদের পর্তুগিজরা অধিকার দিয়েছে ঐ দ্বীপ থেকে লবঙ্গ কেনার। ভারত মহাসাগরের অন্য প্রান্তে, পর্তুগিজরা হরমুজে কড়াকড়ি করে নি কারণ তারা তুর্কি ও পারস্যের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে চাইছিল। ১৫৮৩ সালে পর্যটক ফিন হরমুজে হিন্দু ও মুসলমান বণিকদের ব্যবসা করতে দেখতে পান— মশলায় সরকারি একচেটিয়া বাণিজ্যের কথা পর্তুগিজরা আর তখন ভাবছে না।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ইয়েমেনে তুর্কি প্রভাব শেষ হয়ে যায়। তুর্কিদের অধীনে থেকে এডেন বন্দরের কোনো উন্নতি হয় নি। হজের বাজার তখনও রমরমা ছিল কিন্তু নানান অশান্তি ও গোলমালের কথা বারবার উঠতে থাকে। পারসিকরা হরমুজ থেকে পর্তুগিজদের তাড়িয়ে দিলে বন্দর আব্বাস উঠতে থাকে। ১৬৫০ সালে ওমানের ইয়ারুবীরা মাসকাট বন্দর থেকে পর্তুগিজদের হটিয়ে দেয় এবং পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে মোমবাসা ছাড়া পূর্ব আফ্রিকায় পর্তুগিজ আধিপত্য লুপ্ত হয়ে যায়। ভারতের পশ্চিম উপকূলেও পর্তুগিজরা বিপদের সম্মুখীন হয়। ১৬৬১ ও ১৬৬২ সালে বোম্বাই বন্দর দুবার আক্রান্ত হয়। দিউ বন্দর ও বাসেন বন্দরের ওপরও বারবার আক্রমণ চলতে তাকে। ইয়ারুবী সামুদ্রিক নৌবহর বিশাল জলদস্যু দলে পরিণত হয়ে গুজরাটি জাহাজগুলিকে আক্রমণ করতে থাকে। অন্যদিকে চীনের মিঙ বংশের পতনের পর মাঞ্চু বংশ বৈদেশিক বাণিজ্য ১৬৫৫ সালে বন্ধ করে দেয়।

ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানির জাহাজ ভারত মহাসাগরে এলে ভারতীয় বাণিজ্যের চেহারা বদলে যায়। এদের আসার ফলে পর্তুগিজ বাধা-নিষেধ ভারত মহাসাগর

থেকে চলে যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় জিনিসের দাম বাড়তে থাকে। লঙ্কা প্রায় পাঁচগুণ বাড়ে। কিন্তু ওলন্দাজরা পর্তুগিজদের পথ অনুকরণ করলে বাজার আবার মন্দা হয়ে আসে। মশলার বাণিজ্য ওলন্দাজরা একচেটিয়াভাবে শুরু করে। করমণ্ডলের ভারতীয় বণিকরা কোনোরকমে আচিন-এ টিকে থাকে যদিও গুজরাটি বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াত প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ফলে গুজরাটিদের কাছে কেবল লোহিত সাগর ও পারসিক উপসাগরের বাজার খোলা ছিল। এই জন্য ১৬২০-র দশকে যখন ইংরাজরা সুরাট ও মোখা-র বাণিজ্যে ভাগ বসাতে গিয়েছিল, তখন তাদের শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও মশলার অভাবে লোহিত সাগরের বাণিজ্য ক্রমশ কাপড়ের দিকে ঝুঁকছিল। সারা সপ্তদশ শতাব্দী ধরে লোহিত সাগরে গুজরাটি বাণিজ্য অবাধে চলেছিল যেটা ইংরাজ বা ওলন্দাজরা ঠেকাতে পারে নি। শতাব্দীর শেষদিকে গুজরাটি বাণিজ্য চূড়ায় উঠে যায়। ঐ সময় চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় জাহাজ যেতে শুরু করে। ১৬৯০ সাল নাগাদ ভারতীয় জাহাজ ম্যানিলায় যায় প্রধানত সুরাট ও দক্ষিণ করমণ্ডল থেকে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর করমণ্ডলে বাণিজ্যিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ থেকে মসুলিপত্তনম গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর হয়ে দাঁড়াতে থাকে। ১৫৯০ থেকে হায়দ্রাবাদ হীরক ব্যবসায়ের প্রধান হয়ে দাঁড়ায় যার ফলে মসুলিপত্তনমের উন্নতি শুরু হয়। পর্তুগিজ হরমুজের পতন এবং বন্দর আব্বাসের উন্নতির ফলে পারসিক উপসাগর করমণ্ডলের বণিকদের কাছে খুলে যায়। গুজরাটের ১৬৩০-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ করমণ্ডল উপকূলে বাণিজ্যের সুযোগ বেশি করে এনে দেয়। ১৬৪০ ও ১৬৫০ সালে মীরজুমলা মসুলিপত্তনম থেকে পারসিক উপসাগরে বিস্তৃত বাণিজ্য চালাতে থাকেন। ওলন্দাজরাও উত্তর করমণ্ডলের বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে চিন্তিত ছিল।

শিয়া বণিকরা হুগলি ও মসুলিপত্তনমকে তাদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু এতে লোহিত সাগরে গুজরাটি বাণিজ্যের ক্ষতি হয় নি। হুগলি, মসুলিপত্তনম, বালাসোর, পুলিকট ইত্যাদি বন্দরগুলি প্রধানত বঙ্গেপসাগরেই বাণিজ্য করত। এখানকার জাহাজগুলি পেগু, আরাকান, টেনাসরিম, আচিন ইত্যাদি বন্দরে যেত। পর্তুগিজ ব্যক্তিগত বাণিজ্য কিছু ছিল মাসকাট বন্দরের সঙ্গে।

সবদিক থেকে বিবেচনা করলে, সপ্তদশ শতাব্দীকে মুঘল ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু এই যুগ বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই অবনতি শুরু হয় যার মূলে রয়েছে মুঘল ভারত ও পারস্যের রাজনৈতিক অবক্ষয়। এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ। হুগলি ও বালাসোরে ওলন্দাজ তথ্য থেকে বলা যায় যে, ভারতীয় জাহাজী ব্যবসার অবক্ষয় শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক অবক্ষয়ের আগে। ১৬৭০ সালের পর বাংলার জাহাজী ব্যবসায়ে মন্দা আসে। তেনাসরিম ও আচিন অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ এখনো খুব পরিষ্কার নয়। উল্লেখযোগ্য যে, মুঘল

ভারতের আমলারা এই সময় থেকে তাদের লগ্নি সরিয়ে নিতে শুরু করে।

গুজরাটের সামুদ্রিক বাণিজ্যের অবক্ষয় আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকেই দেখতে পাই। ১৬৯৮ থেকে ১৭১০ এর মধ্যে গুজরাটিদের বাণিজ্যে বিশেষ লাভ হয় নি কারণ প্রচুর মাল লোহিত সাগর ও অন্যান্য বাজারে জমে ছিল। এর একটা কারণ ছিল হয়ত, ঐ সময় ভারতীয় মহাসাগরে বারবার জলদস্যুদের আক্রমণ। ভারতীয় বণিকরা এর জন্য ইংরাজদের দায়ী করে এবং মুঘল সম্রাট ইওরোপীয়দের সুরাটে ও বাংলায় বাণিজ্য সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেন। ইওরোপে ফরাসিদের সঙ্গে ওলন্দাজদের ও ইংরেজদের যুদ্ধ চলার ফলেও বহির্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। ওলন্দাজ ও ইংরাজরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করলেও সুরাট বন্দর কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে মুঘল-ইংরাজ সংঘর্ষের ফলেও সুরাটের বাণিজ্য বেশ কিছুকাল বন্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আবার বাণিজ্য শুরু হলেও জমা মাল সরতে বেশ সময় নেয়। ইওরোপীয় যুদ্ধের ফলে ফরাসি বাণিজ্য মার খায়। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে গুজরাটের উৎপাদন ব্যহত হয়। ১৭২১ সালে সুরাটের রাজস্ব কমে সাত লাখ টাকায় দাঁড়ায়। ১৭১৪ সালে বারোচ-এর রাজস্ব ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। ১৭১৬ সালে এটা কমে গিয়ে ত্রিশ হাজারে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে এটা বাড়লেও আগের মতো অবস্থায় পৌঁছায় নি। এর ওপরে ইয়েমেনি গৃহযুদ্ধে গুজরাটি বণিকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করা হতে থাকে। কিন্তু গুজরাটিরা লোহিত সাগরের বাজার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয় নি।

সুরাট বন্দরে জাহাজের সংখ্যাও কমে যায়। ১৭০১ সালে যেখানে ১১২ টা জাহাজ ছিল, ১৭৫০ সালে সেখানে মাত্র ১২টি হয়ে যায়। এর জায়গা অনেকখানি পূরণ করে ইংরাজ কোম্পানির বাণিজ্য যার মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য কম ছিল না। পরবর্তীকালে ইংরাজ চীনদেশে বাণিজ্য শুরু করলে ভারত মহাসাগরের ছবিটা অনেকখানি বদলে যায়। দক্ষিণে মাদ্রাজের অভ্যুদয় মসুলিপত্তনমকে ম্লান করে দেয়। ম্যানিলা থেকে ইংরাজরা ভারতে রুপো আনতে থাকে আর্মেনিয়ানদের সাহায্যে। কলকাতার শুরু ঐসবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ১৭১৯ সাল থেকে নতুন ফরাসি কোম্পানি তৈরি হলে ফরাসিরা করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলে নতুনভাবে বাণিজ্য শুরু করে। পণ্ডিচেরি, কালিকট, মসুলিপত্তনম, মাহে ও কালিকটে তারা আবার বাণিজ্যকুঠি তৈরি করে ম্যানিলা ও মোখা এবং ইওরোপের সঙ্গে বাণিজ্য চালাতে থাকে। ইংরাজদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হয়ে যায়। ফলে পণ্ডিচেরির উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত ফরাসি বাণিজ্যও ঐসব জায়গায় চলতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশক ফরাসি বাণিজ্যে জোয়ার এনে দেয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে মুঘল ভারতের অর্থনীতি কিভাবে জড়িয়ে ছিল সেটা অধ্যাপিকা শিরিন্ মুস্‌ভি আমাদের জানিয়েছেন, যদিও তাঁর বক্তব্যকে সবাই মেনে নেবেন না। তিনি দেখাচ্ছেন যে, ১৫৮৬ থেকে ১৬০৫ সালের মধ্যে দেড় কোটি

টাকার ওপরে রুপো মুঘল ভারতে এসেছিল। ১৫৯৫-৯৬ সালে সোনার আমদানি হয়েছিল এক কোটি ৩৭ লাখ টাকার ওপরে। এছাড়া মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে ঘোড়া আমদানি হতো। পর্যটক পেলসার্ট সম্রাটের আস্তাবলে ১২ হাজার ঘোড়ার কথা বলেছেন, যার মধ্যে পারসিক ঘোড়া ছিল ৩২০০ ও তুর্কি ঘোড়া ছিল ৫৯৭০। মনসব্দারদেরও পারসিক ও তুর্কি ঘোড়া রাখতে হতো। এছাড়া সাধারণ অশ্বারোহী সৈন্যরাও ঘোড়া রাখত। সমকালীন হিসাব অনুযায়ী এই ধরণের ঘোড়ার সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজারের ওপরে। এর মধ্যে তুর্কি ঘোড়ার সংখ্যা ছিল বেশি। এর ফলে ক্রমাগত ঘোড়া আমদানি করতে হতো। অধ্যাপিকা মুস্‌ভি হিসাব করেছেন যে, প্রতি বছর ১৬ হাজার তুর্কি ঘোড়ার প্রয়োজন ছিল।

এছাড়াও জমিদাররাও ঘোড়া রাখতেন যদিও তাদের ঘোড়া এরকম উচ্চ মানের ছিল না। আবুল ফজল লিখছেন যে, জমিদারদের ঘোড়ার সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ চুরাশি হাজারের ওপরে। মুস্‌ভির হিসাবে জমিদারদের জন্য বাৎসরিক ঘোড়া লাগত ৩৮৪৬। এছাড়াও দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যে ঘোড়ার প্রয়োজন ছিল। অধিকাংশ ঘোড়াই আনা হতো হরমুজ বন্দর থেকে ও কিছু আনা হতো স্থলপথে মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে। সব মিলিয়ে বলা যায় যে, প্রতি বছর এক হাজার পারসিক ও একুশ হাজার তুর্কি ঘোড়া আমদানি করা হতো আকবরের সময়ে। বার্নিয়ার বলছেন যে, প্রতি বছর পঁচিশ হাজার উজবেকী ঘোড়া আনা হতো। মুস্‌ভি এই ঘোড়া আনার খরচ হিসাব কষে বলেছেন, ২৮,৪৭,৪৬০ টাকা। সুতরাং সোনা, রূপা, তামার তাল ও ঘোড়ারই মুঘল ভারতের আমদানির প্রধান অংশ ছিল। এছাড়াও অন্য আমদানি ছিল যার মধ্যে টিন, পারদ, সিঁদূর, রাশিয়ার চামড়া, মুক্তো, দামী উল ও রেশমের কাপড়, মশলা, কফি, হাতির দাঁত, শুকনো ফল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সব মিলিয়ে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৬০,০০,০০০ টাকা। এর মধ্যে কিছু আবার বাইরে যেত, কারণ ঘোড়া কিনতে রূপার প্রয়োজন ছিল। এত টাকা আনার ফলে মুঘল ভারতে জিনিসের দাম বাড়ছিল কিন্তু ঐ সঙ্গে বিভিন্ন শহরে কারিগরি শিল্প, বিশেষত কাপড়ের শিল্পও বাড়ছিল। কিন্তু কতটা জমা টাকা সত্যিকারের কাজে লাগছিল তা বিবেচনা করার বিষয়।

আমরা আগেই দেখেছি, সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতে বণিকরা বিভিন্ন জাত ও ধর্মের ছিল যার দিকে ঐতিহাসিক অরসরত্নম তাঁর সাম্প্রতিক বইয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতীয় বণিকরা পরম্পরা অনুযায়ী বাণিজ্যিক জাতির মধ্যে পড়ে এবং বহুদিন ধরে এই কাজ করে আসছিল। দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে তাদের পুরোনো কাজ ছেড়ে, নতুন বণিক গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে কারণ তাদের পুরোনো কাজে বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। করমণ্ডল উপকূলে তাঁতিরা বাণি[illegible] চলে আসে। এরা বিভিন্ন বন্দরে বসতি স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায়। এদের মধ্যে আরবরা রয়েছে যারা অষ্টম শতাব্দী থেকে ভারতে আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে দেখা যায় যে, আরবরা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এছাড়াও অন্যান্য মুসলমান গোষ্ঠী

ছিল যাদের মধ্যে পারসিক ও তুর্কিদের ধরা যায়। অল্প সংখ্যক ইহুদি ও আর্মেনিয়ানরাও ছিল।

সমুদ্রের বণিকদের মূল স্তম্ভ ছিল জাহাজের মালিকরা আর জাহাজী ব্যবসায়ীরা— যারা প্রধানত দূর পাল্লার ও উপকূলবর্তী এলাকার বাণিজ্য করত। এদের মধ্যে অবশ্য বিরাট তফাত রয়েছে। একদিকে ছিল বড় বড় বণিকরা যাদের বহু জাহাজ ছিল। এরা প্রধানত একটি বন্দর, যেমন সুরাট বা মসুলিপত্তনম থেকেই বাণিজ্য করত। কখনো কখনো এদের ছোটো ছোটে কয়েকটি বন্দরে দেখা পাওয়া যেত। মধ্য ও দক্ষিণ করমণ্ডলেও এদের দেখা পাওয়া যায়।

এদের মধ্যে বড় মাপের বণিক ছিলেন সুরাটের আবদুল গফুর বা মসুলিপত্তনমের মীর কমলুদ্দিন ও পালিয়াকোটের আস্ট্রাপা চেট্টি। আবদুল গফুর কোনো এক সময়ে প্রায় বিশটি জাহাজ চালাতেন এবং সবগুলিই তাঁর নিজের। অন্য দুজনের ছিল পাঁচ থেকে দশটি জাহাজ।

এদের তলায় ছিল অনেকগুলি ছোটো বণিক যাদের নিজেদের জাহাজ ছিল। কারোর কারোর একটা জাহাজ ছিল, যেটা নিয়মিত বিদেশেও যেত। কিন্তু এই সব জাহাজের মালিকরা অন্যান্য ব্যবসা করত না এমন নয়। বড় বড় এরকম ব্যবসার মাথা ছিলেন পরিবারের কর্তা যিনি মূলত কোনো বড় একটা বন্দর থেকে কাজকর্ম চালাতেন। তার সঙ্গে ছিল তার পরিবারের অন্যান্যরা এবং অধীনস্থ কর্মচারীরা যারা বিভিন্ন বন্দরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এছাড়া বড় বড় বাজার-শহরে নিজস্ব প্রতিনিধি থাকত— যারা জাহাজের মাল সরবরাহ করত এবং খবরের জোগান দিত। অনেক সময়ে এই ধরণের বণিকদের প্রতিনিধি থাকত বন্দর আব্বাস, বসোরা, মোখা, সিরিয়াম, আচে, বান্টাম ইত্যাদি বন্দরে। একটা মাত্র জাহাজের মালিক সাধারণত নিজেই জাহাজে যেতেন।

সপ্তদশ শতকের বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ বণিকই জাহাজের মালিক ছিলেন না। এরা অন্যদের জাহাজ ভাড়া করে মাল পাঠাতেন। এদের ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে বড় জাহাজ, এমনকি হাজার টনের জাহাজও তৈরি হতে শুরু হয়। সাধারণত জাহাজে বহু বণিকের মাল থাকে— কোনো কোনো জাহাজে প্রায় পাঁচশো বণিকের মাল থাকে যে-সব মাল কোনো প্রতিনিধি বা পরিবারের কোনো লোকের জিম্মায় থাকে।

তৃতীয় ধরণের বৈদেশিক বণিক হচ্ছে রাজা, যুবরাজ বা রাজপরিবারের অন্যান্য লোকেরা। এরা ছাড়াও রয়েছে সামরিক নেতারা, অভিজাতবর্গ ও আমলারা। সতের শতকে এদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। সম্রাটের পরিবারের লোকজন, সুবার সুবাদার, দেওয়ান ফৌজদার, বন্দরের শাহবন্দর ইত্যাদি। মুঘলরা ছাড়াও বিজাপুর গোলকুণ্ডার আমলা ও দক্ষিণের হিন্দুরাজাদের প্রতিনিধিরাও ছিল। এর মধ্যে মালাবারকে ধরা যায় না কারণ তাদের রাজারা বংশানুক্রমিকভাবে ব্যবসা করেছে। এরা জাহাজ তৈরির ব্যবসাতেও লগ্নি করত। মুঘলদের ক্ষেত্রে তারা জাহাজ ভাড়া দিত বা জাহাজে মাল

নিত। বিদেশী রাজাদের প্রতিনিধিরাও ছিলেন যার মধ্যে আয়ুযিয়া, আরাকান, আচে, জোহোর ও ব্যান্টানের রাজারাও পড়েন। ভারতীয় বণিকরা এদের সাহায্য করতেন।

এছাড়া ছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন বা *নাখোদা* যারা ক্রমশ বৈদেশিক বাণিজ্যে বড় ভূমিকা নিতে শুরু করেছিল সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। এর আগে নাখোদা ছিল প্রধানত জাহাজ চালানোর কর্তা, যে বাণিজ্য নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি। মনে হয়, যে-বণিকরা নিজেরা মাল নিয়ে যেতে পারত না তারা নাখোদার কাছে মাল জমা ও বিক্রি করার ভার দেয়। বিক্রির একটা অংশ তখন তার প্রাপ্য হয়। এই ধরণের লোক ছাড়া ভারতের বিভিন্ন বন্দরে ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর বণিকরা যাদের ক্ষেত্র বন্দরের পশ্চাদভূমি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। জাহাজ এসে পৌঁছালে পাইকারী ব্যবসায়ীরা বিশেষ বিশেষ পণ্য কিনতেন। জাহাজ থেকেই বিরাট সংখ্যায় এই পণ্য কেনা হতো। এমন কি জাহাজের সব পণ্য কিনে গুদামজাত করা হতো। পশ্চাদভূমিতে এদের প্রতিনিধি ছিল যারা এই পণ্য বিক্রি করার ব্যবস্থা করত। ইওরোপীয় কাগজপত্রে এদের দেখা পাওয়া যায়— এরা একবারে মশলা, তামা, টিন, কাপড়, সীসা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ কিনছে।

এই ধরণের ব্যবসায়ীদের রপ্তানিদ্রব্য সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে। কাপড়, গোলমরিচ সোরা এবং আফিম এরা পশ্চাদভূমি থেকে সংগ্রহ করে বন্দরে জাহাজ ধরার জন্য নিয়ে আসত। ইংরাজ ও ওলন্দাজরা হাতে টাকা থাকায় মাল কিনে গুদামজাত করত। কিন্তু ফরাসি বণিকদের হাতে সব সময় অত টাকা না থাকায় তারা জাহাজে টাকা এলে বন্দর থেকেই মাল কিনত। কিন্তু এই ব্যবসায়ীরা যে শুধু এই ধরণের কাজ করতে তা নয়, এরা নিজেরা মাল রপ্তানিও করত— কোনো কোনো ব্যবসায়ীর নিজের জাহাজ ছিল। এরা বিশেষ বিশেষ পণ্য বেশি মাত্রায় কিনে বাজার দখল করত, যার ফলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করাও এদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। ইওরোপীয় বাণিজ্য বেড়ে যাবার ফলে এদের ক্ষমতা ও ব্যবসা বাড়ে এবং ইওরোপীয়রাও এদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এদের বাইরে ছিল— যদিও কাজ করত এদের সঙ্গে— দালাল ও শ্রফরা, যাদের কথা আগেই বলা হয়েছে। দালালদের হাতে সে-রকম টাকা না থাকায় এরা অন্যদের কাছ থেকে টাকা আগাম নিয়ে ভেতরের গ্রামাঞ্চলে মাল সংগ্রহের জন্য যেত। এদের দেখা পাওয়া যায় প্রধানত কাপড়ের ব্যবসায়ে। ক্রমশ এরা কিছু টাকা অর্জন করে স্বাধীন বণিক হিসাবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। শ্রফরা গুজরাটে ছিল হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বী। এরা বিভিন্ন ধরণের কাজে টাকা খাটাত যেমন বণিকদের ঋণ দেওয়া, এক জায়গা থেকে টাকা আর এক জায়গায় পাঠানো ইত্যাদি। এছাড়া টাকার ওজন বা মূল্যমান ঠিক আছে কিনা দেখা ও বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা বদল করা এদের কাজ ছিল। ইওরোপীয় বাণিজ্য বাড়ার পর সোনা-রুপোর তাল কেনা-বেচার কাজ এদের মধ্যে বেড়ে যায়।

ভারতীয় বণিকরা বিদেশে বসবাস করে বাণিজ্য করছে এর প্রমাণ পাওয়া যায়

যদিও ভারতীয় বণিকরা বিশাল সংখ্যায় দেশত্যাগ করেছে এরকম কোনো তথ্য নেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গুজরাটি বণিকদের সংখ্যা সতের শতকে কমে আসতে থাকে। একটা কারণ বোধ হয় এই যে, পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরে গুজরাটি বাণিজ্য নতুনভাবে শুরু হওয়ায় ঐ অঞ্চলে গুজরাটি বণিকরা বসবাস করতে থাকে। এরা পারস্য সাম্রাজ্যে, দক্ষিণ আরবীয় বন্দরে ও পূর্ব আফ্রিকায় বসতি স্থাপন করে। গোলকুণ্ডার মুসলমানরা বর্মা দক্ষিণ সায়াম ও আয়ুযিয়ায় নতুন করে বসতি স্থাপন করে। এদের অনেকেই ঐ সব জায়গায় শাসনযন্ত্রের উচ্চপদে নিয়োজিত হয়। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সব থেকে বেশি পাওয়া যায় চুলিয়া মুসলমানদের। সুরেন্দ্র গোপাল দেখাচ্ছেন যে, পারস্য সাম্রাজ্যে ও রাশিয়ার বিশেষ বিশেষ জায়গায় গুজরাটি বণিকরা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বসতি স্থাপন করেছিল, যে-ধারা অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

আর্মেনীয় বণিকরা ভারতের বিভিন্ন বন্দরে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রথমে তারা পারস্যে আসে এবং সেখান থেকে সুরাট, হুগলি ও মসুলিপত্তনমে যায়। পরবর্তীকালে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতার পত্তন হলে তারা সেখানেও যায় যদিও ১৫৩৮ সালে কলকাতার কাছে আর্মেনীয় কবর পাওয়া গেছে। সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর্মেনীয় বণিক জোহানেস মার্কারা হুগলির গির্জা করার জন্য টাকা দেন। এই বণিকরা প্রধানত বৈদেশিক বাণিজ্য করত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাহাজের মালিকও ছিল। মনে হয় আমদানি রপ্তানির কাজ করার ফলে এরা অভ্যন্তরে যাতায়াত করত। এছাড়া টাকা ঋণ দেওয়া ও টাকা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানোর কাজও এরা করত। সতের শতকের শেষদিকের ফরাসি দলিল থেকে দেখা যায় যে, সুরাটের আর্মেনীয় বণিক খোজা মিনাস্-এর জাহাজ ছিল। তিনি ফরাসিদের সঙ্গে বাণিজ্য করতেন। ভারতীয় ও ইওরোপীয় বণিকদের মধ্যেকার কাজ এরাই চালাত এবং অনেকসময় দালালের কাজও করত। সুরাটে ফরাসি কোম্পানি কুঠি খোলার পর তাদের প্রধান বণিক ছিল আর্মেনীয় স্যাম্পসন। এছাড়া ছিল কোচিন বন্দরের ইহুদিরা ও মালাবারের সিরীয় খ্রিস্টানরা যারা প্রধানত ইওরোপীয় বণিকদের পক্ষে কাজ করেছে।

সতের শতকে ইওরোপীয় ও ভারতীয় বণিকরা সমঝোতা ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে একে অন্যের কাছে এসেছে। প্রথম দিকে দুটি গোষ্ঠীই একে অন্যের প্রতি সন্দেহ পোষণ করত। ইংরাজ ও ওলন্দাজদের ভারতীয় বন্দরে ঘাঁটি গাড়ার বিরুদ্ধে ছিল ভারতীয় বণিকরা। এর মূল কারণ ছিল অবশ্য বিদেশী রপ্তানিতে আরো বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসবে— এই ভয়। আরো ভয় ছিল, যেটা ইওরোপীয় কোম্পানিরাও অন্য ইওরোপীয় কোম্পানি সম্বন্ধে ভাবত-এর ফলে মাল কম পাওয়া যাবে ও মালের দাম বেড়ে যাবে। গুজরাট বন্দরের আমলাদের মাধ্যমে ভারতীয় বণিকরা ইংরাজ ও ওলন্দাজদের ঢোকার পথ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। মসুলিপত্তনমেও ঐ একই ধরণের ছবি পাওয়া যায়। আরো একটা কারণ ছিল। ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে

পর্তুগিজদের সমঝোতা হওয়ার পর, ভারতীয়রা ঐ সমঝোতা ভাঙতে চায় নি।

কিন্তু ভারতীয়রা খুব সহজেই বুঝে গেল যে, নবাগতদের হাতে টাকা পয়সা ও সামরিক শক্তি পর্তুগিজদের থেকে বেশি। এটা আরো স্পষ্ট হলো যখন তারা দেখল যে, তাদের শাসনকর্তারা বা পর্তুগিজরা নবাগতদের দোষ-গুণ বুঝতে পারল। এর ফলে ইওরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে যেটা প্রায় এক শতক ধরে অটুট ছিল। এই নতুন সম্পর্কে ভারতীয়রা ইওরোপীয়দের বাণিজ্য বাড়াতে সাহায্য করেছে এবং বহুসময় ভারতীয় শাসকদের ও ইওরোপীয়দের মধ্যে সেতু তৈরি করেছে।

ইওরোপীয়রা কুঠি তৈরি করতে, লোক নিয়োগ করতে ও জীবনযাত্রা চালাতে বিশেষ অসুবিধায় পড়ে নি। এর ফলে ইওরোপীয়দের আমদানি-রপ্তানিতে ভারতীয় বণিকরা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চলে আসে। ইওরোপীয়রা বড় বড় বণিকদের সঙ্গে এই সম্পর্ক তৈরি করে। সুরাটের বিরজী বোহরা হুগলির খেমচাঁদ ইত্যাদিরা ছিল ইংরাজদের সঙ্গে, কিন্তু এসত্ত্বেও ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কমে নি। সতের শতকের শেষদিকে ভারতীয় বণিকরা ইওরোপীয়দের কয়েকটি জায়গা থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এই কাজে তারা অনেক সময় ইওরোপীয়দেরও সাহায্য নিয়েছে। অনেক ভারতীয় জাহাজী মালিক ইওরোপীয় গোলন্দাজদের নিয়োগ করেছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ইওরোপীয়দের ভারতীয় মহাসাগরে আসার ফলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় বণিকদের কর্মকুশলতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। আঠের শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অবশ্য চিত্রটা বদলে যায়। ইওরোপীয়রা সে-সময় সমসাময়িক শক্তির জোরে স্থানীয় শাসকদের পরাজিত করে ভারতীয় বণিকদের বিপন্ন করে তোলে। কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেও ইওরোপীয়দের শক্তি বাড়তে থাকে, যার ফলে ভারতীয় বণিকরা আগের অবস্থায় আর আসতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত থেকে এটা সহজেই বোঝা যায়।

সতের শতকে ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানি নমুনা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করার জন্য বড় বড় বণিকদের সঙ্গে চুক্তি করে। ভারতীয় বণিকরা এসব চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারত না বা কোম্পানিগুলোও ঠিক সময়ে মাল এলেও টাকা শোধ করতে পারত না। ফরাসিদের টাকার যোগান ঠিকমতো না আসায় এটা প্রায়ই ঘটত। এরকমও হয়েছে যে, ফরাসি কোম্পানি বড় বণিকের সঙ্গে চুক্তি করেছে, তার কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়ে। এ-পর্যন্ত এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে বেশি কিছু গোলমাল হয় নি। কোম্পানিগুলো চাইত শর্ত পূরণ না হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। সতের শতকে তারা এই শর্ত চুক্তির মধ্যে রাখতে পারে নি। আঠের শতক থেকে এই ধরণের শর্ত চুক্তির মধ্যে আসতে আরম্ভ করল। ভারতীয় বণিকরা কিন্তু এর প্রতিরোধ করতে পারল না।

আসলে ইওরোপীয় বাণিজ্যিক প্রথাগুলি ভারতে চালনো যায় নি বা ভারতীয়

প্রথা প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সতের শতকে একদল বণিককে নিয়ে 'জয়েন্টস্টক' গঠন করার চেষ্টা করে ইওরোপীয়রা সফল হয় নি। আঠের শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে ফরাসিরা পণ্ডিচেরিতে এই ধরণের প্রথা চালু করতে সক্ষম হয় যদিও সেটা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ফলে ইওরোপীয়রা ভারতীয় বাণিজ্যিক প্রথাগুলিই গ্রহণ করতে বাধ্য হয় যদিও সেগুলি তাদের প্রথার মধ্যে ছিল না। যেমন বণিকরা টাকা আগাম নিয়ে জামিন দিতে অস্বীকার করে যেটা তাদের প্রথাবিরুদ্ধ এবং তাদের মর্যাদার পক্ষেও হানিকর। এখানে ভারতীয় বণিক ব্যক্তি হিসাবে এলেও সে একটা সমাজভূক্ত যার নিজস্ব প্রথা পরম্পরা অনুযায়ী চলে আসছে। ইওরোপীয়রা এই সামাজিক প্রথা ও পরম্পরাকে স্বীকার না করে সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব দিচ্ছে ব্যক্তির ওপর— ইওরোপীয় প্রথা অনুযায়ী। আবার ভারতীয়রা চাইছে যে, মাল পরে দিলেও টাকা বর্তমানে দিতে, যেটা ইসলামীয় আইনসম্মত কিন্তু ইওরোপীয় প্রথার বিপরীত।

ভারতে ইওরোপীয়রা যখন মাল নিয়ে আসছে তার পাইকারি বিক্রির মধ্যে এই গোলমাল ছিল। বিক্রির সময় ইওরোপীয়দের একটা ছাড় বিক্রেতাকে দিতে হতো। সুরাটে এই ছাড় গোনা হতো সমগ্র বিক্রির মূল্যের ওপর মাসিক শতকরা তিন চতুর্থাংশ হারে চার মাসের সুদ হিসেব করে। এই নিয়ম ভারতীয়দের কাছে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ফলে ইওরোপীয়রাও এই প্রথা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, যদিও ভারতীয়দের মধ্যে এই ছাড় ছিল অনেক বেশি— পাঁচ থেকে সাত মাসের সুদের সমান। এই ছাড় না দিলে, ক্রেতা মূল্য আরো কমিয়ে দেবে। ফলে ইওরোপীয়রা এই প্রস্তাব মানতে বাধ্য হয়। এর মূলে অবশ্য রয়েছে পাইকাররা কারণ খুচরোভাবে মাল বেচতে অনেক সময় লাগত। সুতরাং তাদের টাকাটা আটকে থাকবে ও মাল গুদামে রাখতে হবে। নগদ টাকায় মাল বিক্রি হতো এবং মাল নেবার সময় এই ছাড় নেওয়া যেত।

সতের শতক ধরে বণিক ও তাঁতিদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল কিন্তু এই শিল্প বণিকদের কব্জায় আসে নি। বন্দরের কাছাকাছি গ্রামগুলিতে কিছু বণিকের একচেটিয়া অধিকার হয়ত ছিল, কিন্তু এমন কোনো তথ্য নেই যার থেকে বলা যায় যে, বণিকরা তাঁতিদের তাদের শ্রমিকে রূপান্তরিত করেছে। ফলে প্রায় শতাব্দী কাল ধরে সম্পর্ক থাকে পণ্য বিনিময়ের, বিশেষত যেখানে তাঁতিদের স্বাধীনতা আছে। এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দেওয়া শক্ত হয়ে পড়ছিল। রপ্তানি বাজারের জন্য বণিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল যেটা ইওরোপীয়রা আসার পর আরো বেড়ে যায়। জাত-পাত অধ্যুষিত এক এলাকার সকল তাঁতিদের গ্রামে বণিকরা যেতে সাহায্য নিত দালালদের যারা আবার সাহায্য নিত জাতের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে। এর ফলে টাকা আগাম দিলেও বণিকরা শাস্তিমূলক কাজ করতে গেলে স্থানীয় শাসনকর্তার সাহায্য নিতে হতো। কোনো কোনো বণিক আবার ইজারাও নিয়েছিল। যেমন হুগলির বল্লভদাস, কিন্তু তারাও বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি।

ভারতীয় বণিকরা উৎপাদন প্রথা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে নি, এমনকি বস্ত্রশিল্পের

কাঁচামাল একচেটিয়া করার চেষ্টাও করে নি। বলা যেতে পারে, উৎপাদন, পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে তারা কোনো উৎসাহই দেখায় নি। আঠার শতকে ইংরাজ ও ওলন্দাজরা উৎপাদন পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। এই সময় ফরাসিরাও তাদের বিশেষ মাপের কাপড়ের জন্য তাঁত বদলানোর চেষ্টা করে। অবশ্য খুব অল্প জায়গায় তারা সাফল্য লাভ করেছিল। বণিক টাকা আগাম দিয়েই সন্তুষ্ট থাকত; কাঁচা মাল, রং ইত্যাদি কেনার দায়িত্ব ছিল তাঁতিদের। স্বাভাবিক সময়ে কোনো অসুবিধা ছিল না মাল আনার। রাজনৈতিক বা সামরিক গোলমাল কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে বণিকের লোকসান হতো খুব বেশি। গুজরাটে এবং অন্য জায়গায়, রাজনৈতিক কারণে কাপড় উৎপাদন কমে যায় ফলে বণিকরা মাল যোগন দিতে পারে না ঠিক সময়ে।

ঐতিহাসিক মোরল্যান্ডের মতে, মুঘল ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় ছিল কর বৃদ্ধি। কিন্তু কৃষির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, বাণিজ্যের ওপর কর অনেক কম। বন্দরের শুল্ক কোনো সময়েই শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি হয় নি। পক্ষান্তরে কৃষিতে কৃষকের উদ্বৃত্ত অনেক বেশি মাত্রায় নিয়ে নেওয়া হতো। অন্যান্য কর ধরলেও বাণিজ্যের কর কখনই শতকরা দশভাগের বেশি নয়। এর একটা কারণ হতে পারে যে, মুঘলরা কৃষিকেই প্রধান আয়ের উৎস হিসাবে ধরেছিলেন। ভারতীয় বণিকরা এরই মধ্যে ঐ কর ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছিল এবং ইওরোপীয় নিশানে তাদের মাল পাঠানো ছিল চিরাচরিত কাজ।

এটাও বলা যায় যে, সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যেত না এবং শাসকরা বিভিন্ন ছুতোয় সম্পত্তি নিয়ে নিত। এটাই *এসটিট* আইন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সাধারণত উত্তরাধিকার না থাকলে এটা প্রয়োগ করা যেত এবং তাও এর প্রয়োগ হতো অভিজাতদের সম্পর্কে। বণিকদের সম্পর্কে এই আইন আওরংজেব একবারই ইংরাজ কোম্পানির প্রেসিডেন্ট মারা গেলে প্রয়োগ করেছিলেন যদিও পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। হিন্দু ও মুসলমান বণিকদের নিজ নিজ আইন বলেই উত্তরাধিকার পাওয়া যেত। বহু পরিবার একই ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর সম্পদ আহরণ করেছিলেন পরম্পরাগতভাবে, তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। তবে সতের শতকের শেষদিক থেকে বণিকদের ওপর চাপ আসে টাকার জন্য। আঠের শতকের গোড়ায় যুবরাজ আজিমুদ্দিন ও মুর্শিদকুলি খান এই ধরণের চাপ দিয়েছিলেন।

অরসরত্নম বলেছেন যে, ভারতীয় বণিকরা সুরাট বন্দরে বড় বাড়ি তৈরি করে নি— তারা আরো ভেতরে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিল। সতের শতকের সাতের দশকে সুরাটের হিন্দু ও জৈন বাণিয়াদের এ-রকম বড় বাড়ি তৈরি করে ওখানে বসবাস করতে দেখা যেত। সমকালীন সুরাটের ছবিতেও ঐ ধরণের বাড়ির কথা পাওয়া যায় যেগুলি তেতলার সমান। এরা বাগানবাড়ি রাখত এবং সপ্তাহান্তে সেখানে যেত। সুতরাং এই বণিকরা শহরের লোক ছিল না বলে তিনি যা বলেছেন, সমকালীন সাক্ষ্য তার থেকে অন্যরকম কথা বলে।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সুরাটে ও তার আশেপাশে প্রচুর সংখ্যায় বিভিন্ন জাতির বণিকের সমাবেশ ছিল। খাম্বাজ, র‍্যাদের, গ্যাণ্ডভী, দিউ ইত্যাদি বন্দরে প্রচুর বণিক ছিল। এর ফলে সুরাটের শাসনব্যবস্থায় বণিকদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। মুঘল সম্রাট ও তার পরিবারের অনেকেই সুরাটের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য করতেন। কাফি খান সুরাটে গিয়েছিলেন একজন বড় অভিজাতের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি হিসাবে। ফরাসি বণিক মার্তাঁ লিখছেন যে, সুরাট বন্দরে অভিজাতদের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি থাকত। ফলে সুরাটের শাসনব্যবস্থায় বণিকদের হস্তক্ষেপ হবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই সব বড় বড় বণিকদের মুঘল দরবারে প্রতিনিধি ছিল যারা কেন্দ্রীয় আমলাদের নানারকম উপঢৌকন দিত। সংকটের সময়ে এদের আর্জি সম্রাটের কাছে পৌঁছাতে দেরি হতো না। পর্তুগিজরা সুরাটে জাহাজ দখল করলে সম্রাট তখনই ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ করেন। ১৬১৮-১৯ সালে টমাস রো সুরাটের জাহাজ জোর করে ধরবার পরিকল্পনা করলে, বণিকদের আর্জি সম্রাটের কাছে পৌঁছে যায়। ১৬৪৮-৪৯ সালে ওলন্দাজরা আচে বন্দরে সুরাটের জাহাজ আসা বন্ধ করে ও মালাক্কায় তাদের শুল্ক বাড়িয়ে দেয়। সম্রাটকে জানানো মাত্র ওলন্দাজরা তাদের নীতি প্রত্যাহার করে। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সুরাটের জাহাজ বারবার জলদস্যুদের হাতে আক্রান্ত হলে, সম্রাট ইওরোপীয়দের বাণিজ্য বন্ধ করে দেন। ফলে ইওরোপীয় জাহাজ ভারতীয় জাহাজের সঙ্গে তাদের জাহাজ পাঠানোর ব্যবস্থা করে। ইঙ্গ-মুঘল যুদ্ধের পর ইংরাজরা সুরাটের বণিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করে; যদিও অর্ধেক টাকার বেশি আর তারা দেয় নি।

সতের শতকে গুজরাটি বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য কমিয়ে পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব উপকূলের বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গুজরাটি বণিকদের বসতি কমতে থাকে। সতের শতকের প্রথমদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো কোনো বন্দরে গুজরাটি বণিকরা বন্দরের কর্তার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। শতাব্দীর শেষদিকে আর এ-ধরণের নাম পাওয়া যায় না। এই সময় থেকে সুরাট বন্দরের বাণিজ্যে সংকট বাড়তে থাকে। শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা সুরাটে ১৮ থেকে ৭২-এ পৌঁছে যায়। ঐ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুরাটের আয় ছিল বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা যার মধ্যে সুরাট সংলগ্ন জমির খাজনাও ছিল। অশীন দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, আঠের শতকের প্রথমার্ধে এই খাজনা কত কমে যায় এবং জাহাজের সংখ্যাও কমে যায়। তবে তার জন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকখানি দায়ী।

করমণ্ডলের বণিক সম্প্রদায় পশ্চিম উপকূলের তুলনায় অনেক বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল দীর্ঘ উপকূলের বহু বন্দরের মধ্যে। সুরাটের মতো কোনো কেন্দ্রীভূত বন্দর এখানে ছিল না। ফলে বণিকরা ক্রমাগতই উত্তর থেকে দক্ষিণে যাতায়াত করত। কয়েকজন ছাড়া করমণ্ডলের বণিকদের শিকড় ছিল সমাজের গভীরে এবং অধিকাংশই এসেছিল এমন সব গোষ্ঠী থেকে যারা বংশ-পরম্পরায় বাণিজ্য করছে। অন্যান্য

জাতের লোকেরাও বাণিজ্যে এসেছে। এর প্রধান কারণ, এই সময় বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয় যার ফলে বণিকদের সামনে উন্নতির দরজা খুলে যায়।

বাণিজ্যে এখানে ছিল প্রধানত হিন্দুরা যদিও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মুসলমানরা ছিল প্রধান। সতের শতকের গোড়ার দিকে দূরপাল্লার বাণিজ্য ছিল হিন্দুদের হাতে। কিন্তু মসুলিপত্তনম বন্দর থেকে মুসলমান বণিকরা তাদের যাত্রা শুরু করে। হিন্দুদের মধ্যে চেট্টিদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। গুজরাটের বাণিয়াদের মতো তারা বিভিন্ন জাতে বিভক্ত ছিল যারা বাণিজ্যের বিশেষ বিশেষ দিকগুলি দেখত। চেট্টিদের মধ্যে তামিল ও তেলেগু চেট্টিরাও ছিল। তেলেগুরা এসেছিল কৃষ্ণা-গোদাবরী উপকূল ও তার পশ্চাদভূমি থেকে এবং পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে কোমাটিরা কানাড়া ও মালাবারে ছড়িয়ে যায়। তেলেগু চেট্টিদের মধ্যে জাতের বিভাজন দেখা যায়— বালিজা, বেরী এবং কোমাটি। তামিল চেট্টিরা প্রধানত দক্ষিণ করমণ্ডল ও মাদুরাই উপকূলে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এরা একই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও মহাজনী কারবারও গড়ে তোলে। ফলে তেলেগুদের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্যে তারা পিছিয়ে ছিল।

করমণ্ডলে মুসলমানরা ছিল বিভিন্ন ধরণের। ষোল শতক থেকে গোলকুণ্ডা রাজ্যের পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করলে মসুলিপত্তনম বন্দরের উন্নতি শুরু হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে মুসলমানরা এসে এই বন্দরে বসতি গড়তে শুরু করতে থাকে। গোলকুণ্ডা রাজ্যের এক শতক পার হওয়ার পর দেখা যায়, পূর্ব অন্ধ্রে এই মুসলমানরা বসবাস করছে। এদেরই গোলকুণ্ডার মুসলমান বলা হয়। ষোল শতকের শেষে পারস্য থেকেও মুসলমানরা গোলকুণ্ডায় আসতে থাকে। গোলকুণ্ডার সুলতান শিয়া সম্প্রদায়ের হওয়ার ফলে তাদের বসতি করা আরো সহজ হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ শাসনব্যবস্থার মধ্যে কাজ নেন ও কালক্রমে বাণিজ্যে আসেন। মসুলিপত্তনমের ওপর নির্ভর করে এরা নিজেদের জাহাজ চালায় পারস্য উপসাগরে, বর্মা, সিয়াম ও আচেতে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যান্টাম ও ম্যাকাসারে এদের গতিবিধি অবাধ ছিল। মসুলিপত্তনম বন্দরে এরা ছাড়াও আফগান ও আরবরা ছিল।

সমকালীন দলিলে *চুলিয়া* মুসলমান বলে এক বণিক গোষ্ঠীর কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এরা তামিল মুসলমান এবং আগেকার আরব আক্রমণকারীদের বংশধর যারা ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করছিল। এরা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যায় এবং করমণ্ডলের বিভিন্ন বন্দরে ছড়িয়ে যায়। এদের সঙ্গে অন্যান্য তামিল হিন্দু রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক ভালোই ছিল। এদের মধ্যে মারাইক্কর গোষ্ঠীকে প্রধান ধরা যেতে পারে যাদের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ট ছিল। এছাড়া এরা বাংলা, অন্ধ্র, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপেও বাণিজ্য করে। আরেকটা ছোট গোষ্ঠী ছিল— *শাব্বাই,* যাদের সঙ্গেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্ক ছিল।

করমণ্ডল উপকূলে কয়েকটি বড় বড় বণিকের দেখা পাওয়া যায় যাদের মধ্যে মীর কমলুদ্দিনকে অগ্রগণ্য ধরা যেতে পারে। সতের শতকের চার দশক ধরে ইনি নিজের জাহাজ চালাতেন মসুলিপত্তনমকে নির্ভর করে। এই শতকের শেষদিকে ছিলেন

আবদুল কাদির (মারইক্কার গোষ্ঠী) এবং অস্ট্রাপ্লাই চেট্টি। তিন চারটে জাহাজ আছে এরকম কিছু হিন্দু ও মুসলমান বণিক ছিল। এছাড়া একটা জাহাজের মালিকও ছিল। অধিকাংশ বণিকই অবশ্য জাহাজী মালিক ছিল না এবং জাহাজে জায়গা ভাড়া করে মাল পাঠাত। ইওরোপীয়রা এই উপকূলে বন্দর তৈরি করলে পর এরা ঐ বন্দরগুলি ব্যবহার করতে শুরু করে। এরা ইওরোপীয় জাহাজেও মাল পাঠাত।

করমণ্ডলের হিন্দু বণিকরা প্রধানত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য করতেন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের যোগান দিতেন। এরা বিভিন্ন ধরণের পণ্যের ব্যবসা করত যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে তাঁতের কাপড় যেটা এই অঞ্চলের প্রধান রপ্তানি ছিল। হিন্দু চেট্টি বণিকরা প্রধানত এই ব্যবসা করত। এরা বড় বণিকের দালাল হিসাবে কাজ করত এবং ইওরোপীয়রা আসার পর তাদেরকে মালের জোগান দিত।

শাসনকর্তারা বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ নিতে কুণ্ঠিত হতেন না এবং গোলকুণ্ডার সুলতান, উপকূলবর্তী এলাকার শাসনকর্তারা, বন্দরের হাবিলদার ও সামরিক নেতারা বাণিজ্যে লগ্নি করতেন। কম হলেও পূর্ব কর্নাটকে বিজাপুরী আমলারাও একই কাজ করেছে। এদের মধ্যে সতের শতকের মাঝামাঝি ছিল মীর মহম্মদ সৈয়দ। ইনি ছিলেন সামরিক নেতা ও *সরসমত* এবং তাকে *মীরজুমলা* উপাধি দেওয়া হয়। মসুলিপত্তনমে এর ১২টি জাহাজ ছিল এবং এর বাণিজ্য ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, মালদ্বীপ ও সুরাট। এ-কাজে মীরজুমলা তার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। বিজয়নগরের পতনের পর হিন্দু বণিকরা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মুসলমান অভিজাতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাণিজ্য করতে সঙ্কোচ করেন নি। এই ধরণের সহযোগিতা থাকার ফলে ইওরোপীয়দের গোলমালের সময়ে বণিকরা রাষ্ট্রের সাহায্য পেয়েছে। ১৬৭৪ সালে মসুলিপত্তনমে ফরাসি ও গোলকুণ্ডার আমলাদের গোলমাল হলে বণিকরা ফরাসিদের পক্ষ নিয়ে গোলমাল মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলে।

সতের শতকের শেষ দশকে করমণ্ডলের বণিক সম্প্রদায়ের সামনে কঠিন সমস্যা আসে। ১৬৮৫-৮৭ সালে মুঘলরা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখল করে নিলে বণিকদের জগৎটা বদলে যায়। বণিকদের সঙ্গে রাষ্ট্র যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল সেটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ঐ দুই জায়গায় শাসনতন্ত্র কায়েম করতে মুঘলদের কিছু সময় লাগছিল। উৎপাদন কেন্দ্রগুলি মূলত বণিকদের ইজারা নেওয়া ছিল— এখন মুঘলরা সেখানে নতুন নিয়ম চালু করাতে লাগল। তাছাড়া নতুন অমালাদের সঙ্গে বণিকদের সমঝোতা করারও প্রয়োজন ছিল। হায়দ্রাবাদ ও আর্কটে নতুন ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে উঠলেও একই পন্থা অবলম্বন করতে থাকে।

বাংলার বাণিজ্যের বিস্তার স্বাভাবিকভাবেই হচ্ছিল। মুঘল বিজয়ের আগে বণিকরা পর্তুগিজদের সঙ্গে সমঝোতা করেছিল কিন্তু মোহনায় আরাকানী ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণের ফলে স্বাভাবিক বিকাশ হয় নি। ১৬৩২ সালে হুগলি থেকে মুঘলরা পর্তুগিজদের হঠিয়ে দিলে পর বাণিজ্যের প্রসার হতে শুরু হয়। হুগলি, বালেশ্বর

ও পিপলী বন্দরের কাজকর্ম চলতে থাকে। একটা অন্তরায় অবশ্য বরাবরই ছিল— নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং ভাগীরথীতে চরের ওঠানামা। তার ফলে বড় ইওরোপীয় জাহাজ সাধারণত বালেশ্বরে নোঙর ফেলে ছোটো জাহাজে করে হুগলিতে মাল পাঠাত। পাইলটের সাহায্য নিয়ে অবশ্য ইওরোপীয় বড় জাহাজ সময় সময় ভাগীরথীর ভেতরে তাদের এলাকার কাছে নিয়ে আসতে পেরেছিল।

পূর্ববর্তী যুগে বাঙালি বণিক বৈদেশিক বাণিজ্যে ছিল কিনা এ-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ১৫৯৪ সালে লিখিত মুকুন্দরামের কবিতা থেকে জানা যায় যে, সপ্তগ্রামের বণিক বাইরে যাচ্ছে না। যে কয়েকজন হিন্দু বণিকদের নাম তিনি করেছেন, সবাই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত। ফলে গুজরাট বা করমণ্ডলের মতো জাতিগত বণিকের অভ্যুত্থান বাংলায় দেখি না। যে-সব হিন্দু বণিক বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় সবাই গুজরাট থেকে আগত। খেমচাঁদ শাহ বা চিন্তামন-এর মতো বণিকের জাহাজ ছিল। বালেশ্বর বন্দর থেকে জাহাজী মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় যারা দুরপাল্লার বাণিজ্য করছে। হিন্দু বণিকরা প্রধানত অভ্যন্তর থেকে মাল কিনে এনে রপ্তানি বাজারের চাহিদা পূরণ করত। এরা আবার ইওরোপীয়দের আনা মালও কিনত পাইকারি হারে।

টাঁকশাল থেকে টাকা তৈরি করানো, ঋণ দেওয়া টাকা বিভিন্ন প্রদেশে চালানো ও বিভিন্ন প্রদেশের মুদ্রা বদল করা ইত্যাদি কাজে দক্ষ ছিল কিছু গুজরাটি বানিয়া ও প্রধানত মাড়ওয়ার থেকে আসা বণিকরা। বাণিজ্য বাড়ার এবং বৈদেশিক মুদ্রা বেশি করে আসার সঙ্গে এদের বিশেষ ধরণের কাজও বৃদ্ধি পায়। টাকার চাহিদাও বাড়ে। কোম্পানিগুলি টাকা আনলেও ঋণ নিত। মুঘল আমলে খাজনা ব্যবস্থা প্রধানত নগদ টাকায় নেওয়ার ফলে টাকার লেনদেন ও টাকা উত্তর ভারতে পাঠানোর চাহিদা বাড়তে থাকে। কয়েকটি পরিবার যারা মুঘলশ্রেণীর কাছের ছিল তারা এই কাজে এগিয়ে আসে। সতের শতকের শেষে আমরা মানিকচাঁদের পরিবারকে পাই যারা এই কাজ প্রায় একচেটিয়া করে ফেলেছে। আঠের শতকের প্রথমদিকে সম্রাট ফারুকনিয়ার এদের 'জগৎ শেঠ' উপাধি দেন। তবে এরা ইজারার মধ্যে যায় নি। অন্য বণিকরা, যেমন বল্লভদাস, ইজারা নিয়ে টাকা ঠিকমতো না দেবার জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

সতের শতকের বাংলার মুসলমান বণিকদের বৈদেশিক বাণিজ্যে উত্থান শুরু হয়। এরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, সুরাট ও পশ্চিম এশিয়ায় বাণিজ্য করত। মনে হয় এদের পূর্বপুরুষরা সুলতানী যুগে বাংলায় এসেছিলেন। মুঘল বিজয়ের পর গুজরাট থেকে কয়েকটি বণিক পরিবার বাংলায় বসতি স্থাপন করে। এদের বাণিজ্য বৃদ্ধির মূলে রয়েছে মুঘল আমলাদের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ। ১৬৪০ সালের পর বাংলার উচ্চপদস্থ আমলারা বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যে লগ্নি করতে শুরু করে। যুবরাজ মহম্মদ সুজা বাংলার সুবাদার হওয়ার পর ঐ বাণিজ্য শুরু করেন। এঁর পরবর্তী সুবাদার মীরজুমলাও বাণিজ্যে আসেন। পরবর্তীকালে শায়েস্তা খান হুগলি

বন্দরের খাজনা জায়গীর হিসাবে পান ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। সতের শতকের শেষ যুবরাজ আজিমুদ্দিন বাণিজ্যে একচেটিয়া কারবার শুরু করলে সম্রাটের আদেশে সেটা বন্ধ রাখতে হয়।

সুবাদাররা ছাড়াও অন্যান্য অমালারাও জাহাজী মালিক ছিলেন। ঢাকা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ও দেওয়ানরা বাণিজ্য করতে থাকেন। এমকি হুগলি, বালেশ্বর ও পিপলীর ফৌজদাররাও এই বাণিজ্যে যোগ দেন। এদের কারোর কারোর, যেমন হুগলির ফৌজদার নুরুল্লা খানের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ছিল। ওমপ্রকাশের মতে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যরত বহু জাহাজের মালিক ছিল এই ধরণের আমলারা।

কিভাবে এই সব আমলারা এত টাকা লগ্নি করতে পারতেন বলা যায় না। অনুমান করা হয় যে, এরা একদল মুসলমান বণিকের সহযোগিতায় এই বাণিজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এই সব বণিকরা ওদের হয়ে বাণিজ্য করতেন, না শুধু তাদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতেন সে-কথা বলা শক্ত।

১৬৯০-এর দশক থেকে অভিজাত ও আমলাদের বাণিজ্যে আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে বাংলার বন্দরগুলির বাণিজ্য অনেক কমে যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের যোগসূত্র কমে আসতে থাকে। এর ফলে গুজরাটি বণিকরা ধীরে ধীরে এই জায়গা দখল করার চেষ্টা করে। এরা প্রধানত গুজরাট-বাংলার বাণিজ্য দখল করে। সতের শতকের শেষে এরকম একজন ছিলেন মহম্মদ ঘৌস যিনি তাঁর জাহাজে ফরাসিদের মাল নিয়ে হুগলি-সুরাট যাতায়াত করতেন। কিছু গুজরাটি বানিয়ারা অবশ্য বৈদেশিক বাণিজ্যে তখনো ছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্যে অভিজাত ও আমলারা এমন সময় এসেছিল যখন পর্তুগিজরা চলে যাবার ফলে জায়গা খালি হয়ে গেছে। মুঘল নীতির মধ্যে উপকূল রক্ষা করার দায়িত্ব তারা নিয়েছিল। আবুল ফজল নৌ-বহর তৈরি করার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৬৬৪ সালে মুঘলরা চট্টগ্রাম দখল করলে বণিকরা কিছুটা স্বস্তি পায়। সতের শতকের মাঝামাঝি থেকে বড় বড় জাহাজ তৈরি হতে থাকে যার ফলে ভারত মহাসাগরে বাংলার বাণিজ্য বাড়তে থাকে। চাল, চিনি, ভোজ্য তেল এবং সোরা বাংলা থেকে রপ্তানি হতে থাকে। অভিজাতরা হাতি কেনার জন্য জহাজ পাঠাত আচে ও শ্রীলঙ্কায়।

বাংলার আমলাদের সঙ্গে ইওরোপীয়দের সম্পর্ক নরম-গরম দুই-ই ছিল। ওলন্দাজরা ১৬৪০-এর দশকে বাংলার বণিকদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো কোনো বন্দরে যাতায়াত বন্ধ করে দিলে মুঘলরা বাংলায় ওলন্দাজদের কুঠিগুলি অবরোধ করে। দিনেমারদের সঙ্গে এই রকম গোলমালের ফলে বাংলা থেকে দিনেমাররা বিতাড়িত হয়। ইঙ্গ-মুঘল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজরা হুগলি ছেড়ে সুতানটিতে চলে আসে কিন্তু তারপর তারা ক্রমশ সমঝোতায়ও আসে।

বাংলার বণিকদের সঙ্গে ইওরোপীয়দের সম্পর্ক কাছাকাছি আসে সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। ঐ সময় থেকেই বাংলার বণিকরা বেশিমাত্রায় সুযোগ গ্রহণ করতে থাকে। রেশম, তাঁত, সোরা ও আফিম নিয়ে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্য চলতে

থাকে। খেমচাঁদ ও মথুরাদাস নিজেদের টাকায় ঐসব মাল যোগাতে আরম্ভ করলেও, পরবর্তীকালে বাণিজ্য বাড়লে কোম্পানির কাছ থেকে আগাম নিত। ইওরোপীয়রাও বাইরে থেকে মশলা, টিন, তামা, সীসা ও কাপড় নিয়ে এলে এরা সেগুলি পাইকারি হারে কিনে নেয়।

ইংরাজ কোম্পানির সহায়তায় বাংলার বণিকরা মুঘল শুল্ক ফাঁকি দিত বলে গোলমাল বাঁধে আঠের শতকে। পরবর্তীকালে এই গোলযোগ যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। ইংরাজ কোম্পানির আমলারাও কম বা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধা ক্রমশ নিতে থাকে। নানা ধরণের দালাল এই ধরণের কাজে সাহায্য করতে থাকে।

সুতরাং, বণিকরা মুঘল যুগের ভারতের সমাজ থেকে আলাদা কোনো জগতে বাস করত না। রাজনৈতিক জগতেও তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না একথাও এখন আর বলা যাবে না। নানা জাত ও ধর্মের লোক নিয়ে গঠিত বণিক গোষ্ঠী বা সংঘ যথেষ্ট গতিশীল ছিল। বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সহযোগিতা বাড়তে থাকে যার মধ্যে ইওরোপীয়রা এসে পড়লে নতুন অবস্থার উদ্ভব হয়। কিন্তু সতের শতকের শেষ দিকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, ভারতীয় বণিকের প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল, যেটা সমুদ্রে খুব বেশি পরিষ্কার হয়ে আসছিল। স্থলেও তার প্রমাণ কিছু কিছু আসছিল। কিন্তু বণিকের মানদণ্ড যে রাজদণ্ড হয়ে দেখা দেবে এ হিসাব তখন বোধহয় কেউ করে নি।

মুঘল রাষ্ট্র এই বণিক ও বাণিজ্য জগৎ থেকে আলাদা ছিল না এটাই আমরা দেখেছি। কিন্তু এই বন্দর ও তার পশ্চাদ্‌ভূমি যে অনেক কাছাকাছি ছিল তার প্রমাণ দেবার প্রয়োজন নেই এবং তার মধ্যেকার সম্পর্ক, পরম্পরায় ঠিক হয়ে এসেছে। বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন বন্দরের আমলাতন্ত্র ও সুবার দেওয়ানী বিভাগ সচেতন হয়ে উঠেছে তেমনি বন্দরের পশ্চাদভূমিও বাড়ছে। এই বর্ধিত বাণিজ্যের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ খুবই কম এবং বণিকের জগৎ রাষ্ট্র থেকে এই অর্থে স্বাধীন। পরম্পরাগত একটা সম্পর্ক চলে আসছে যেটা রাষ্ট্র ও বণিকপক্ষ থেকে মেনে চলেছিল। আঠের শতক থেকে এই সম্পর্কে চিড় ধরে নানা কারণে।

প্রধান মুঘল বন্দরগুলি ছিল সরাসরি মুঘল শাসনের অধীনে এবং বন্দরগুলির সংলগ্ন জমি ছিল যার খাজনা বন্দরের খাজনার সঙ্গে যোগ হতো। অরসরত্নম এগুলিকে খালসা জমি বলছেন। কিন্তু হুগলি ও সুরাটে (এবং একটা বড় সময় ধরে খাম্বাজ) *তন্‌খা* জায়গীর ছিল, তার প্রমাণ আছে। বন্দরের খাজনা ছিল সরকারের এবং শুল্কনীতি নির্ভর করত কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর যাঁরা বন্দরের আমলাদের নিয়োগ করতেন। বন্দরের উন্নতির জন্য কেউ চেষ্টা করেছেন এরকম কোনো প্রমাণ নেই। তবে বন্দরের নদীর সামনে ছিল শুল্ক বিভাগ, গুদাম ও দপ্তর। সুরাট বন্দরের কেল্লা ছিল যার কিল্লাদার বন্দরের কর্তৃপক্ষের থেকে আলাদা ছিল। এদের কাজের সীমারেখা নিয়ে যে গোলমাল উপস্থিত হয়, সেটা শিবাজীর সুরাট আক্রমণের সময়ে স্পষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই বিরোধ কতদূর যেতে পারে অশীন দাশগুপ্তের

লেখা থেকে তা আমরা জানতে পারছি। বন্দরের পেছনের অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা রাখার দায়িত্ব ছিল ফৌজদার ও সুবেদারের। কিন্তু মারাঠা আক্রমণের সময় বোঝা যায় যে, এই প্রতিরক্ষা ছিল কত ঠুনকো। কেন্দ্রীয় শাসন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লে বন্দরের কাজকর্ম কত সহজেই শিথিল হতে পারে, সেটাও বোঝা যায়। সুতরাং কেন্দ্রীয় শাসনের প্রভাব বন্দরের কাজকর্ম ও বাণিজ্যের একটা স্তরের ওপর পড়তে বাধ্য।

রাষ্ট্রের আর্থিক নীতির প্রভাব এখানে খুব পরিষ্কার। মুঘল বন্দরে শুল্কর হার ছিল শতকরা তিন থেকে পাঁচ, যদিও হিন্দু ও মুসলমান বণিকের ওপর সেটা নির্ভর করত। মালাবার ও কানাড়ায় ছিল অনেক বেশি— শতকরা সাত থেকে দশ। এছাড়া বন্দরে নোঙরের জন্য কিছু দিতে হতো। সোনা বা রুপোর তালের ওপর ছিল আলাদা শুল্ক হার এবং টাঁকশাল থেকে বর্তমান মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে গেলে আরও একদফা দিতে হতো।

এছাড়া বন্দর থেকে মাল ভেতরে নিতে গেলে বা ভেতরে আনতে গেলে রাহাদারী (পয়ের কর) ছাড়াও শুল্ক দিতে হতো। বাজারে মাল বিক্রি করতে গেলেও একটা কর বহু জায়গায় দিতে হতো।

বিদেশী কোম্পানিগুলির বাণিজ্যে মুঘল রাষ্ট্র লাভবান হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রচুর পরিমাণে সোনা, রুপো ও তামার তাল আনার ফলে মুঘল মুদ্রা নির্দিষ্ট মানে ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী বেশি সংখ্যায় তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। এছাড়া, ঐতিহাসিক মোরল্যান্ডের মতে, মুঘল অভিজাতরা খেলনা ও বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র (যেমন বন্দুক), নানা ধরণের ইওরোপীয় কাপড় ও মদ পছন্দ করত। বাণিজ্য বাড়ার ফলে শুল্কও বেড়ে যায়। ফলে মুঘলরা ইওরোপীয় বাণিজ্য দেশের পক্ষে লাভজনক মনে করলেও, তাদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিল। ফলে বহুকাল পর্যন্ত তাদের কুঠি শক্তিশালী করার আদেশ দেয় নি। সতের শতকের শেষে বাংলায় শোভা সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহের ফলে ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা তাদের কুঠিগুলি শক্তিশালী করে তোলে। ১৬৯০-এর দশকে সুরাটে যে সংকট উপস্থিত হয়, তার মূলে ছিল ক্রমাগত জলদস্যুদের আক্রমণ। আর এটাও স্পষ্ট যে, এই আক্রমণের মোকাবিলা করার শক্তি মুঘলদের ছিল না।

কিন্তু ততদিন পর্যন্ত মুঘল রাষ্ট্র তাদের নিজেদের নীতি অনুসরণ করে বিদেশী কোম্পানিদের জন্য বাণিজ্যের দরজা খুলে দিয়েছে যতদিন মুঘলরা 'বাণিজ্যদ্বার সকলের জন্য' খুলে রেখেছে। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাও ঐ একই নীতি গ্রহণ করেছিল। ইওরোপীয় বন্দরগুলিতেও ঐ একই নীতি অন্তত প্রথমদিকে ছিল।

ভারতীয় রাজন্যবর্গদের মধ্যে শিবাজীই প্রথম ও প্রধান যিনি সমুদ্রের সমস্যাগুলি বুঝেছিলেন। তিনি বিজাপুরের কয়েকটি বন্দর দখল করে নিলে, মারাঠারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে উপকূল এলাকায়। যার জন্য শিবাজী যত্ন সহকারে নৌশক্তি গড়ে তুলেছিলেন। বাংলায় এ-ধরণের নৌশক্তি আকবর ও জাহাঙ্গীর করলেও পরবর্তীকালে তা আর

বাড়ে নি। শিবাজী উপকূল এলাকা সংরক্ষণের জন্য উপকূলে শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তোলেন যার ফলে তাঁর সঙ্গে মুঘল নৌশক্তির লড়াই হয়। জাঞ্জিরার সিদ্দীরা তখন মুঘল নৌশক্তির হয়ে কাজ করছিলেন। তাঁর বন্দরগুলি থেকে শিবাজী পশ্চিম এশিয়ার মোখা, এডেন, মাস্কাট ও বসেরার সঙ্গে বাণিজ্য চালাতেন যদিও মনে হয় এই বাণিজ্য প্রধানত করত কোঙ্কন, বিজাপুর ও গুজরাটের বণিকরা। পরবর্তীকালের মারাঠা নেতারা দেশের অভ্যন্তরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে শিবাজীর সামুদ্রিক নীতি আর অনুসৃত হয় নি।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ভারত ভূখণ্ডে রাষ্ট্র বাণিজ্যকে রক্ষা করার দিকে সচেষ্ট ছিল। এই একই সঙ্গে জাহাজ চালানোর স্বাধীনতার প্রতিও রাষ্ট্র সজাগ ছিল। কিন্তু সমকালীন সাহিত্যে রাষ্ট্র কখনো কখনো বণিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে এটা পাওয়া যায়। বাংলায় যুবরাজ আজিমউদ্দিনের এই চেষ্টা মুঘল সম্রাট সমর্থন না করলে বন্ধ করে দেওয়া হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে কিছু পণ্ডিত বলেছেন যে, রাষ্ট্র অনেকগুলি পণ্যের একচেটিয়া অধিকারে রেখেছিল এবং বাণিজ্য করত। কখনো কখনো কোনো কোনো অভিজাতকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল তাদের খুশি রাখার জন্য। সতের শতকের আয়ুবিয়া, আচে, আরাকান ও পেগুতে এই ধরণের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য দেখা যায়। ভারতীয় মহাসাগরে পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাস বন্দর আব্বাসে বাণিজ্য সরিয়ে আনেন এবং রেশম বাণিজ্য একচেটিয়া অধিকারে রাখেন। পরবর্তীকালে এই অধিকার শিথিল করা হলেও রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্য চলতে থাকে।

মুঘলরা কখনো কখনো কোনো কোনো পণ্যের এই ধরণের অধিকার প্রয়োগ করেছিল কিন্তু সম্পূর্ণ বাণিজ্যের ওপর কখনই করে নি। ১৬১৯ এবং ১৬৩২ সালে গুজরাট সরকার ইংরাজ ও ওলন্দাজদের ব্রোচ ও বরোদা থেকে কাপড় কেনা নিষিদ্ধ করে। এর কারণ এই ছিল যে, ভারতীয় বণিকরা যাতে রপ্তানি করার মাল পায়। ১৬৪১ সালে আমদাবাদেও একই আদেশ দেওয়া হয়। সম্রাটের আদেশে ওখানে তখন কাপড় কেনা হচ্ছিল রপ্তানির জন্য। এ-আদেশগুলি অবশ্য সাময়িক।

সুরাট থেকে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে মাল পাঠানোর ব্যাপারে একই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি আসার পর এই পথে মাল পাঠানোর ক্ষেত্রে ক্রমশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় ১৬৫১-৫২ ও ১৬৫৪ সালে গুজরাট সরকার আদেশ দেয় যতক্ষণ না পর্যন্ত সম্রাটের জাহাজে মাল তোলা হচ্ছে ততক্ষণ বিদেশী কোম্পানিগুলির জাহাজে গুজরাটের বণিকদের মাল তোলা যাবে না। ভারতীয় বণিকেরা ইওরোপীয়দের জাহাজে মাল পাঠাতে চাইত। তার কারণ ইওরোপীয় জাহাজগুলিতে অনেক বেশি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ১৬৬০ সালের পর মুঘল রাজ পরিবার এই বাণিজ্য থেকে চলে গেলে পর আবার মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়।

মুঘল আমলারা অনেক সময়ে ইওরোপীয় কোম্পানিগুলিকে তাদের কাছ থেকে মাল কিনতে বাধ্য করত। ওলন্দাজ কোম্পানি গোলকুণ্ডাতে আসার পর মসুলিপত্তনমের

হাবিলদার জোর করে মাল কিনতে বাধ্য করান। মুঘলরা বাংলা ও গুজরাটের নীলের ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করার চেষ্টা করেছিল। ১৬৩৩ সালে গুজরাট ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে নীল সরকারি করা হয় এবং এক গুজরাটি বাণিয়াকে এই অধিকার দেওয়া হয়। ঐ বাণিয়া নীলের বিক্রির দর বাড়ায় এবং ইওরোপীয়রা এ-কারণে নীল কেনা বন্ধ করে দেয়। ফলে ১৬৩৬ সালে নীল আবার মুক্ত বাণিজ্যের মধ্যে চলে আসে।

বাংলায় যুবরাজ আজিমউদ্দিনের *সওদা-ই খাস* ইত্যাদির কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ওঁর আগে মীরজুমলা বাংলায় এসে একচেটিয়া কারবার করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একাই ইংরাজদের সোরা সরবরাহ করবেন এরকম চেষ্টাও করেছিলেন। শায়েস্তা খান এসেও একচেটিয়া কারবার করার চেষ্টা করেছিলেন যেমন লবণ, মোম ও সোনা কেনার ব্যাপারে। আমরা আগেই দেখেছি যে, ফৌজদাররাও বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন।

সমকালীন ইওরোপীয় দলিলপত্র থেকে মনে হয় এবং কেউ কেউ (যেমন মোরল্যান্ড) মনে করেছেন যে, সরকার সমস্ত সময় বণিকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করছে। এটাতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কেউ কেউ বা বিশেষ কোনো সময়ে বণিকদের ওপর জোর করা হতো— এ-ঘটনা আমরা অনেক বেশি দেখতে পাই আঠের শতকে— যখন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে আসছে। এমন কি আওরংজেবের জীবদ্দশায় আঠের শতকের গোড়ার দিকেও বাংলার সুবাদার যুবরাজ আজিমুদ্দিন ও দেওয়ান মুর্শীদকুলি খান বণিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল আসন্ন গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি ও দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের জন্য টাকা সরবরাহ করা। বণিকদের সম্পত্তি বিনা কারণে সরাসরি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এরকম কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কৃষির তুলনায় বাণিজ্যের ওপর কর অনেক কম ছিল।

ভারতীয় শাসকবর্গ ও ইওরোপীয়দের গোলমালের একটা প্রধান কারণ হলো বন্দরের বাইরের ও ভেতরের কর ছাড় এবং বন্দরে মালের মূল্যায়ন করা, যার ভিত্তিতে ঐ কর দিতে হবে। কোম্পানিগুলি কুঠি করার অনুমতির সঙ্গে করের কিছু ছাড় পেয়ে যেত। এর একটা কারণ হলো রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য মাল আনলে আভ্যন্তরীণ শুল্ক থেকে ছাড় পাওয়া বা মাল বিদেশ থেকে এনে ভেতরে পাঠালে আবার আভ্যন্তরীণ কর না দেওয়া। কেন্দ্রীয় শাসক ছাড় দিলেও বিভিন্ন স্থানীয় কর্তারা ঐ ছাড় দিতে রাজি নয়। সুরাট থেকে মসুলিপত্তনম যাবার পথে ফরাসি বণিক মার্তাকে এই ধরণের কর আদায়কারীদের মুখোমুখি হতে হয় এবং তাঁকে ছোটোখাটো লড়াই পর্যন্ত করতে হয়েছিল।

ইওরোপীয় দলিল থেকে আরো মনে হতে পারে যে, ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে ইওরোপীয়দের ক্রমাগত লড়াই চলেছে— এটা কখনই সত্য নয়। ইওরোপীয় ও স্থানীয় কর্তারা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে নানারকম আলোচনার মাধ্যমে।

১৬৯০-এর পর সুরাট বন্দরের সংকট সমাধান করার জন্য সুরাটের মুৎসুদ্দী একাধিকবার বণিকসভা ডাকেন যেখানে ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির প্রতিনিধি ছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ মুৎসুদ্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি ইংরাজদের পক্ষ নিয়ে কাজ করছেন। ইওরোপীয়রা অবশ্য কখনো কখনো ভয় দেখিয়েছে, জাহাজ দিয়ে বন্দর অবরোধ করেছে, বন্দর ছেড়ে সমুদ্র পাড়ে বা জাহাজে চলে গিয়েছে, কিন্তু পরে আবার সমঝোতা হয়েছে যাতে স্থানীয় বণিকদের বড় ভূমিকা আছে। কারণ বণিকদের কাছে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইওরোপীয়রা চলে গেলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হবে বেশি। এই বণিকরা তখনও বোঝে নি যে, ইওরোপীয়রা তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার জন্য আসে নি। ফলে স্থানীয় বণিক, আমলা, সাধারণ লোক ঐ স্বর্ণমুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে আছে কখন সেই জাহাজ আসবে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় মুঘল শাসন এই স্বর্ণমুহূর্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল কিনা বলা যায় না। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা বিদ্রোহ শুরু হলে, সেটা ক্রমশ উপকূল ছেড়ে অভ্যন্তরে চলে যায়। এমনকি বিজাপুর-গোলকুণ্ডা জয়ের পরেও মুঘলরা অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল উত্তর ভারত ও রাজপুতানাকে। শেষোক্ত এই দুটি অঞ্চল নিয়ে তারা অনেক বেশি ব্যস্ত ছিল। এর পর সমুদ্রের দীর্ঘ উপকূলের হাতছানি ক্রমশই দূরে সরে যেতে থাকে।

৭

মুদ্রা ও মূল্য

মুঘল সাম্রাজ্যে তিনটি ধাতুর যে-সব মুদ্রা বের হয়েছিল তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। নিখাদ ধাতু ও একই ধরণের মুদ্রার জন্য এগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রুপোর মুদ্রাই ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের মূল মুদ্রা।

শেরশাহর আগে পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানদের প্রধান মুদ্রা ছিল *সিকান্দরী*। এটি প্রধানত তামার মুদ্রা। তবে এর মধ্যে কিছুটা রুপোও মেশানো হতো। প্রথমে এটা ছিল রুপোর তঙ্কা কিন্তু খাদ হতে হতে ঐ অবস্থায় দাঁড়ায়। মালবের *মুজঃফরী* এবং গুজরাটের *মহিমুদী* ছিল রুপোর; যদিও এগুলো সবই ছিল মোটা দাগের। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ছিল সোনার মুদ্রা যাকে *প্যাগোডা* বলা হতো। দক্ষিণ ভারতের অন্য রাজ্যগুলি এমনকি গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বংশও এই সোনার মুদ্রা ব্যবহার করতে থাকে।

শেরশাহ একটি নিখাদ মুদ্রা বের করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রুপোর *রুপিয়া* এবং স্বর্ণ ও তামার মুদ্রা থেকে এই ধারণা হয়। কিন্তু আকবরই প্রথম, যিনি এই ধরণের মুদ্রা-প্রথার প্রচলন করেন।

রুপিয়াতে শতকরা চারভাগ খাদ মেশানো থাকত এবং এর ওজন ছিল ১৭৮ গ্রেন (ট্রয়)। আকবরের পরবর্তী সম্রাটরা এই ধরণের মুদ্রা বের করেন। জাহাঙ্গীর আরো ভারী মুদ্রা চালু করার চেষ্টা করেন। আওরংজেব ১৮০ গ্রেন ওজনের মুদ্রা বের করেন। মনে হয়, এটা কেবলমাত্র জমানো হতো। রুপিয়া তাড়াতাড়ি ব্যবসা-বাণিজ্যে ও খাজনা দেবার কাজে ব্যবহৃত হতে লাগল। মুঘলরা এরপর সোনার মুদ্রা বের করে যাকে *মোহর* বা *আশরফি* বলা হতো। এর ওজন ছিল ১৬৯ গ্রেন। এটিও প্রধানত জামানোর জন্য বের করা হয়। এর মধ্যে কোনো খাদ ছিল না বলা চলে। ছোটোখাটো ব্যবহারের জন্য মুঘলরা তামার মুদ্রা চালু করেছিল যেগুলোকে *দাম* বলা হতো। এর ওজন ৩২৩ গ্রেন। ১৬৬৪-৬৫ সালে মুদ্রার সংকট হলে আওরংজেব হাল্কা তামার মুদ্রা বের করেন যার ওজন আগেকার *দামের* থেকে দুই-তৃতীয়াংশ কম।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন টাঁকশাল থেকে মুঘলরা মুদ্রা বের করত। ১৬৯১ সালে বিয়াল্লিশটা টাঁকশাল থেকে তামার মুদ্রা বের হতো। সোনার মোহর বেরত চারটি থেকে এবং রূপার মুদ্রা চোদ্দটি থেকে। সাম্রাজ্য বেড়ে গেলে আরো কয়েকটি টাঁকশাল থেকে মুদ্রা বের হতে থাকে। আওরংজেবের শেষদিকে চল্লিশটি টাঁকশাল থেকে রুপোর টাকা বের হতে থাকে। এটা মুঘল শাসনের গর্ব যে, যে-কোনো টাঁকশাল

থেকে মুদ্রা বের হোক না কেন তার খাদ ও চেহারা একই রকম থাকে।

মুঘল টাঁকশালগুলি মুক্ত টাঁকশাল হিসাবে কাজ করে। যে কোনো লোক ঐ ধাতু নিয়ে গেলে মুদ্রা করে নিতে পারত। কিন্তু তাকে কিছু টাঁকশালের খরচ ইত্যাদি দিতে হতো। সাধারণত মুদ্রার মূল্যর শতকরা ৫/৬ ভাগ দিতে হতো। যখন কোষাগার থেকে কাউকে টাকা দিত, তখন তারা *দোদমী* বলে এই খরচ কেটে নিত। তামা ও সোনার রুপোর বেলাতেও এই একই খরচ ছিল।

মুঘল মুদ্রায় টাঁকশালের নাম ও রাজত্বের যে বছরে বের হচ্ছে সে-বছরের উল্লেখ থাকত। ঐ বছরের বা বিগত বছরের মুদ্রার মুল্যের কোনো পরিবর্তন হয় নি (*তাজা সিক্কা*)। বেশি চলত সাধারণত পুরানো মুদ্রা (*চালানী*) যেগুলি ক্ষয়ে যাবার ফলে মুল্য কমে যেত। বিগত রাজার রাজত্বে যে-মুদ্রা বেরিয়েছিল (*খাজনা*) সেগুলির মূল্য আরো কম ছিল। যেগুলির ওজন অনেক কমে গিয়েছিল সেগুলি ধাতুর ওজনে বিক্রি হতো।

এই তিন মুদ্রার নিজেদের মূল্য সম্পর্ক উঠা নামা করত। সাধারণত চল্লিশ দাম-এ এক রুপি ছিল কিন্তু আকবরের মৃত্যুর পরে এই সম্পর্ক বদলে যায়। এর ফলে আগেকার মানের সম্পর্কটা কেবল কাগজে থেকে যায়, বাস্তব সম্পর্কটা বদলে যায়। এছাড়া ছোটো ছোটো রুপোর মুদ্রা বা *আনা* বের করা হতে থাকে যার মূল্য ছিল *রুপীর* এক-ষষ্ঠদশ শতাংশ। শাহজাহানের সময়েই *আনা* চালু হয়ে যায়।

আকবরের রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই, প্রধানত মুদ্রা ছিল তামার *তঙ্কা* (*দাম* এর দ্বিগুণ) এবং *দাম* । আবুল ফজল *আইন-ই আকবরী* তে সবকিছুর মূল্য *দাম* -এর হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে এই মূল্য রুপোর টাকায় দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন ধরণের দলিল দস্তাবেজে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৫৯২-৯৩ সালে প্রথম রুপোর তঙ্কার কথা দলিলে পাওয়া যায়। এরপর থেকে অবশ্য এটা অতি সাধারণ হয়ে যায়।

গুজরাটের বিভিন্ন বন্দরে মাহমুদি রুপোর তঙ্কার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে যদিও ১৬০০ সালের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যে রুপোর তঙ্কা প্রধান জায়গা করে নেয়। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়ের পর রুপোর তঙ্কা দক্ষিণ ভারতের *হুন* এর পরিবর্তে জায়গা করে নেয়।

তামার মুদ্রা প্রধানত ব্যবহার করা হতো ছোটো ছোটো খরচের জন্য। আরো ছোটো কাজের জন্য মালদ্বীপ থেকে আসত কড়ি। বাংলা ও উড়িষ্যায় এই কড়ি খুব চলত। সাধারণত আড়াই হাজার কড়িতে এক তঙ্কা হতো।

মুঘল ভারতে *হুণ্ডির* প্রচলন ছিল বড় বড় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। ফারসিতে একে বলা হতো *সুরফা* । এটি একটি কাগজ যেখানে অন্য জায়গায় টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। নগদ টাকার বদলে হুণ্ডির ব্যবহার ছিল এবং একজনের হুণ্ডি আরেকজনকে দেওয়া যেতে পারত। এর থেকে একটা অংশ কেটে নেওয়া হতো। গুজরাটে যাকে বলত *অনৎ* । ১৬৫১ সালে আগ্রার *অনৎ* ছিল শতকরা একভাগ।

১৭১৫ সালে আহমেদাবাদে শরফরা এটাকে বিশভাগ বাড়ালে, বণিকরা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে। এর ফলে *অনৃথ* আবার কমে যায়।

শরফরা সুদের বিনিময়ে টাকা জমা নিত এবং সুদের বিনিময়ে টাকা ধার দিত। দুটো কাজই আধুনিক ব্যাঙ্কের মতো। কখনও কখনও মুঘল যুগে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যেত। ইংরাজরা প্রথমদিকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল কিন্তু পরের দিকে আর করে নি। বহু সরকারি আমলা এই সব জায়গায় খাজনা জমা রেখে সুদ ভোগ করতেন। শরফরা আরো চড়া সুদে টাকা ধার নিতেন এবং দুই সুদের ফারাকই তাদের আয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। শরফদের মধ্যে জাতের আধিপত্য বিশেষ ছিল না।

শরফ ছাড়া বণিকরাও টাকা ধার দিতেন। পরবর্তী যুগে পাঞ্জাবের বণিক ও বাংলার সন্ন্যাসীরাও এই ধরণের ধার দিতেন। এছাড়াও মহাজন ও সাহুকাররা টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা করতেন। শরফরা প্রধানত ব্যবসার জন্য টাকা ধার দিতেন ও অল্পদিনের জন্য ধার দিতেন। মহাজনরা প্রধানত টাকা জমা রাখতেন এবং টাকা বদল করতেন। ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ার বলেছেন যে, প্রায় প্রতিটি গ্রামেই একজন করে মহাজন ছিলেন। বাংলার কবি মুকুন্দরাম তাঁদের গ্রামে এই রকম এক পোদ্দারের কথা বলেছেন। নতুন গ্রাম বসানোর জন্য মণ্ডল ঋণ দিচ্ছে একথাও মুকুন্দরাম বলেছেন। কিন্তু লম্বা সময়ের জন্য লগ্নি কম ছিল বলে টাকা বাণিজ্যের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নি, যদিও আঠের শতকে ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির টাকা ধার করা মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে পড়েছিল। সতের শতকের শেষদিকে ফরাসি কোম্পানির অবস্থা খারাপ হলে পর সুরাট ও বাংলার শরফরা টাকা ধার দিতে অস্বীকার করে। ফরাসিদের থেকে টাকা না আসার ফলে সুরাটের ফরাসিদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। আঠের শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ পর্যন্ত ফরাসিরা সুরাটে টাকা ধার পায় নি। শরফরা বীমা করত মাল চলাচলের জন্য। জাহাজে পাঠানো মালের বীমাও করত। বাড়ির বীমা বা জীবন বীমা ছিল না। সাধারণত দুরকমভাবে মালের ওপর বীমা করা হতো। প্রথমত বীমাকারী মাল নিয়ে নিজেই মাল পাঠনোর ব্যবস্থা করত। ১৬৬২ সালের ইংরাজদের কাগজে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত বীমাকারী মাল নিজের হেফাজতে রাখছে না যদিও বীমা করছে। ঐ সময়কার অবস্থা অনুযায়ী বীমার খরচ অত্যন্ত কম ছিল। যেহেতু এই ধরণের বীমা খুবই প্রচলিত ছিল। তাই ঝুঁকি কম ছিল। স্থলপথে বীমার খরচ ছিল কম। ১৬৫৫ সালে মসুলিপত্তনম থেকে সুরাটের বীমার খরচ ছিল মালের মূল্যে শতকরা একভাগ। মাল ছিল নগদ টাকা। সে তুলনায় ১৬৬০ সালে সুরাট থেকে কালিকটে জলপথে নগদ টাকা পাঠানোর বীমা ছিল মালের মূল্যের শতকরা ৪.৫ ভাগ। ১৬৪৯ সালে সুরাট থেকে চিনি পাঠানো হয়— বীমার খরচ ছিল মূল্যের শতকরা ২.৭৫ ভাগ। আঠের শতকের প্রথমার্ধে খাম্বাজ থেকে ইংরাজরা জলপথে সুরাটে কাপড় পাঠাত। বীমার খরচ ছিল মালের মূল্যের শতকরা একভাগ এবং খাম্বাজেই বীমা করা যেত। দ্বিতীয়ার্ধে খাম্বাজের অবস্থা খারাপ

হলে আর বীমা করা যেত না। ফলে ঐ সব মালের সুরাট থেকে বীমা করা হতো যার খরচ ছিল প্রায় দ্বিগুণ। দুই জায়গার রাজনৈতিক অবস্থা ও পথের অবস্থার ওপর বীমার খরচ নির্ভর করত। ঝুঁকি বেশি হলে বীমার খরচ বেশি হবে সব জায়গায় এটা খাটে না। অবশ্য এটা হতে পারে যে, আঠের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খাম্বাজ থেকে বড় বড় শরফ ও মহাজন চলে যাবার ফলে বীমাকারী পাওয়া শক্ত হয়ে ওঠে।

মুঘল ভারতে রুপো আমদানি বেড়ে যায় ষোল ও সতের শতকে যখন দক্ষিণ আমেরিকার খনি থেকে প্রচুর পরিমাণে রুপো পাওয়া যেতে থাকে। মুঘল টাঁকশাল থেকে কতগুলি রুপোর মুদ্রা বের হয়েছিল তার একটা ধারণা করা যেতে পারে। আজিজা হাসান ভারতের মিউজিয়মগুলির তালিকা থেকে কত মুদ্রা বের হয়েছিল তার একটা তালিকা তৈরি করেছেন যদিও ঐ তালিকাটি প্রধানত উত্তর ভারতের নানা মিউজিয়াম থেকে নেওয়া। তিনি মিউজিয়মগুলির তালিকা আলোচনা করে দেখান যে, কয়েক বছর অন্তর মুদ্রার সংখ্যা কমছে বা বাড়ছে। ঐ আলোচনা থেকে হাসান দেখান যে, স্পেনে যতটা সময়ের ফাঁকে রুপো আসছে মুঘল ভারতের টাঁকশাল থেকে ততটা সময়ের ফাঁকেই মুদ্রা বের করা হয়েছিল। এর থেকে বলা যেতে পারে যে, দক্ষিণ আমেরিকার ধাতু স্পেন থেকে মুঘল ভারতে আসে এবং মুদ্রা হয়ে মুঘল টাঁকশাল থেকে বের হয়। কি পরিমাণ রুপোর মুদ্রা চলত তার একটা চেহারা হাসান দিয়েছেন। তিনি দেখাচ্ছেন যে, ১৫৯১ সালের পর থেকে রুপোর মুদ্রা ১৬৩৯ সালের মধ্যে প্রায় তিনগুণ বেশি চলত। ১৬৩৯ সালে এটা কম চলে এবং ১৬৮৪ সালে এটা ১৫৯১ সালের থেকে দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৬৮৪ সালের পর রুপোর মুদ্রা আবার বেশি চলতে থাকে। ১৭০০ সালের পর এটা আবার ১৫৯১ সালের থেকে তিনগুণ হয়ে যায়।

এর থেকে খুব স্পষ্ট যে, রুপোর মুদ্রার বেশি চলাচল নির্ভর করেছিল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনা রুপোর ওপর। বিভিন্ন সূত্র থেকে এটা পরিষ্কার যে, আমদানি করা সব রুপোই মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়েছিল। উত্তর ভারতের ও গুজরাটের টাঁকশালগুলি দেশের ভেতরকার টাঁকশালগুলির তুলনায় অনেক বেশি মুদ্রা বের করেছিল যার থেকে আমদানির সঙ্গে এর সম্পর্ক সহজ করে ধরা যায়। এ-তুলনায় সোনা মাটির তলায় জমানো হতো বা পর্যটক তাভারনিয়ারের মতে, অলঙ্কার করে রাখা হতো। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, সমস্ত রুপোর অলঙ্কারই মুদ্রায় পরিণত করা হয়েছিল কিন্তু এটা বলা যায় যে, রুপো জমানো ক্রমশ কমে আসছিল। সুতরাং এটা বলা যায় না যে, রুপো তিনগুণ চলা মানে দেশে তিনগুণ রুপো বেড়ে গেছে। অর্থাৎ রুপোর চল বেড়েছিল ঠিকই কিন্তু ঐ পরিমাণে রুপো বাড়ে নি। অধ্যাপক ইরফান হবিব ধরেছেন যে, দুই-তৃতীয়াংশ বেড়েছিল।

সারা মুঘল যুগ থেকেই টাকার তাল বা বিভিন্ন ধরণের টাকা যে কেবল মাত্র ইওরোপ থেকেই ভারতে এসেছিল এটা বলা ঠিক হবে না। অবশ্য ক্যাডিজ বন্দর

থেকেই প্রধানত এই টাকার তাল বা মুদ্রা কোনো সময় সরাসরি ভারতে আসত। কোনো সময় মধ্যপ্রাচ্য হয়ে কাপড় বা মশলার বিনিময়ে ভারতে আসত। আঠের শতকের প্রথম থেকে মেক্সিকোর খনিগুলি প্রধান হয়ে ওঠে এবং স্পেনীয় বণিক এই তাল সরকারি ও বেসরকারিভাবে ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে আনতে থাকে। ইংরাজ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ ও ফরাসি কোম্পানি ও কোনো কোনো সময়ে করমণ্ডল উপকূলের বণিকরা ম্যানিলা যেতে শুরু করে ও ঐ টাকার তাল বিভিন্ন ভারতীয় মালের বিনিময়ে ভারতে আনতে থাকে। যদিও সরাসরি ইওরোপ থেকে টাকার তাল আনা কোনো সময় বন্ধ হয় নি। ফলে একদিকে ইওরোপ ও মক্কা বা বন্দর আব্বাস কি বসোরাতে ভারত থেকে মাল যাচ্ছে। অন্যদিকে চীন, ম্যানিলা, কিছু পরিমাণে আচিন-এও মাল যাচ্ছে। সব জায়গা থেকেই টাকার তাল বা পিয়াস্ত্রা আসছে ভারতে। এর ফলে ভারতের পূর্ব-উপকুল সমৃদ্ধশালী হতে শুরু করে।

এই পরিমাণ টাকার আমদানি ও চলন বাড়লে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে বাধ্য, যদি না উৎপাদন বাড়ে। আগে আমরা দেখেছি যে, মুঘল শাসনযন্ত্র ভূমি-রাজস্ব নগদ টাকায় নিতে চাইছিল। ফলে কৃষকরা উৎপাদন বাজারে বিক্রি করে নগদ টাকায় ভূমি-রাজস্ব দিত। শহরগুলি বেড়ে যাবার ফলে এই ধারা আরো জোরদার হয়। এর থেকে মনে হয় যে, দেশের সার্বিক আয় থেকে উৎপাদন বেশি হারে বাড়ছিল যদিও কোনোটাই সঠিকভাবে বলার মতো কোনো তথ্য নেই। এটুকু শুধু বলা যায় যে, বাজার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুপোর যে বাড়তি চলন হয়েছিল সেটি ঐ বাড়তি উৎপাদন ও বর্দ্ধিত বাজার খেয়ে নেয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও ষোল ও সতের শতকে যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

সমকালীন ইওরোপের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, মুঘল ভারতে সোনার মূল্য রুপোর টাকায় ষোল শতকের শেষে কম ছিল। সতের শতকের তৃতীয় দশকে মুঘল ভারতের মূল্য ইওরোপের সমান হয়ে যায়। পরবর্তীকালে কিছুটা বাড়লেও এটা আবার কমতে শুরু করে। ১৬৭৫ সালের আগে মুঘল ভারতে সোনার মূল্য রুপোর টাকায় প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বেড়ে যায় কিন্তু সতের শতকের শেষে এটা কমে শতকরা পঞ্চাশভাগ হয়ে যায়। প্রচুর পরিমাণে সোনা মুঘল ভারতে আসা সত্ত্বেও এই বৃদ্ধি হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে স্পেন হয়ে এই সোনা আসে। কিছু আসে আফ্রিকা থেকে এবং ১৬৫০ সালের পর জাপান থেকে। নদীর বালু থেকেও কিছু সোনা পাওয়া যায়। ষোল শতকে কত সোনা ও রুপো এসেছিল তার হিসাব কেবল ১৫৮৩ সালের পরের থেকে পাওয়া যায়। এটা হয়ত বলা যায় যে, ১৫৯৫ সাল থেকে ১৬৬৬ সালের মধ্যে সোনার আমদানি অন্তত শতকরা দশ ভাগ বেড়ে যায়। যেহেতু রুপোর টাকায় সোনার মূল্য প্রায় শতকরা সাতাত্তর ভাগ বাড়ে, সেহেতু বলা যায় যে, রুপোর মূল্য প্রায় শতকরা দশভাগ কমে যায়। এর ফলে ঐ সময়ে রুপোর টাকার দ্বিগুণ মূল্য বৃদ্ধি হয়।

১৬৭৫ সালের পর সোনার মূল্য রুপোর টাকায় দুবার নামে। দুবারই আমদানি

বেশি হবার ফলে এরকম হয়। ১৬৭৬ সালে আওরংজেব মজুত সোনা বাজারে ছাড়েন, এ-জন্য সঙ্কট হয় নি। এটা হয়েছিল জাপান থেকে সোনা আমদানির জন্য। ১৭১১ সাল থেকে ১৭১৪ সালের মধ্যে ব্রেজিলের সোনা উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার এই ঘটনা ঘটে। ১৭৫০ সালের মধ্যে এটা আবার প্রাক ১৭১১ সালের অবস্থায় ফিরে যায়। সুতরাং এটা বলা যায় যে, প্রচুর সোনা আমদানির ফলে রুপোর ক্রয়ক্ষমতা আঠের শতকের প্রথমে প্রচুর কমে যায়।

রুপোর মূল্য তামায় ১৬১৪ সাল থেকে বাড়তে শুরু করে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত। এর পর ১৫৯৫ সাল থেকে এর মূল্য প্রায় আড়াই গুণ বেড়ে যায়। ১৬৬২ সাল থেকে ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং সতের শতকের শেষে এটা ১৫৯৫ সালের দ্বিগুণে এসে দাঁড়ায়। আঠের শতকের প্রথমার্ধে এটা আবার বাড়তে শুরু করে। ইওরোপে ১৫২০ সাল থেকে ১৬২০ পর্যন্ত এটা বাড়তে থাকে এবং ১৭৬০ সাল নাগাদ এটা ১৬২০ সালের মূল্যে স্থির হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইওরোপে তামার মূল্য ভারতের আগেই বাড়তে থাকে এবং এই বৃদ্ধি ভারতের প্রায় চল্লিশ বছর আগে বন্ধ হয়ে যায়।

তামার উৎপাদন ইওরোপ, জাপান বা মুঘল ভারতে চাহিদার সঙ্গে বেড়েছে এবং এর ফলে উৎপাদন প্রতি এককের খরচও বেড়েছিল। চাহিদা প্রধানত বাড়ে ব্রোঞ্জের কামানের ব্যবহার করার জন্য। ১৬৫০ সাল নাগাদ ইওরোপে ব্রোঞ্জের কামানের পরিবর্তে লোহার কামান ব্যবহার করা হতে থাকে যদিও ভারতে ঐ পরিবর্তন আসে নি। এছাড়া গরীবদের গয়না ও তামার বাসনের ব্যবহার চলতেই থাকে। এর ফলে ভারতে তামার দাম আর্ন্তজাতিক দামের ওপরে চলে যায়। কিন্তু এ সত্ত্বেও বলা যায় যে, তামার দাম ১৫৯৪ সাল থেকে আড়াইগুণ বাড়লেও, জিনিসপত্রের মূল্যমান ঐ হারে বাড়ে নি। ১৬৬০ সালে তামার দাম ঐ মূল্যমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিল।

৮

মুঘল শহর ও জনসংখ্যা

এ-পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের কাছে শহরের ইতিহাস উপযুক্ত গুরুত্ব পায় নি যদিও নানান ধরণের উৎস বিভিন্ন জায়গায় জড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই সবের মধ্যে সমকালীন ইওরোপীয় লেখকদের লেখায় মুঘল শহরের উপাদান নিহিত আছে যার থেকে বিভিন্ন ধরণের গবেষণার কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। সমকালীন ফরাসি লেখায় শহরের উল্লেখ থাকলেও তার বিশদ বর্ণনা নেই। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক মেহতা— সুরাট, খাম্বাজ ও আরো কয়েকটি শহরের কাঠামোর বিবর্তন ধরার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে অবশ্য এ-প্রচেষ্টা বেশিদূর এগোয় নি।

ইওরোপীয়দের লেখা থেকে প্রধানত তিন ধরণের শহরের কথা পাওয়া যায় যার বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন যদিও ঐ-ধরণের বিভাজন করা বাস্তবে হয়ত যায় না। প্রায় সকলেই সুরাট বন্দর-শহরের কথা বলেছেন। সেখান থেকে মাল আমদানি রপ্তানি হতো এবং সেখানে গ্রামাঞ্চল থেকে কাঁচা পণ্য এসে জমা হবার পর ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন হচ্ছে। এ-ধরণের মধ্যে খাম্বাজ, সুরাট, মসুলিপত্তনম ও হুগলিকে ফেলা যেতে পারে। দ্বিতীয় ধরণের শহরের মধ্যে পড়ে সেইসব শহরগুলি যেগুলি রাজাশ্রিত— রাজধানী (প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয়) শহর। কিন্তু এখানেও পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির বড় বাজার রয়েছে এবং রাজা বা সম্রাটের বাসস্থানের সময় এইসব বাজার দ্বিগুণ হয়ে যায়। বাজার ছাড়া শুধু শাসনতান্ত্রিক শহর মুঘলযুগে বিরল। কারণ সহজেই অনুমেয়। রাজা বা সম্রাটের সঙ্গে তাঁর আমলা, অনুচর, অভিজাত ও সৈন্যদের উপস্থিতির ফলে ভোগ্যপণ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে স্থানীয় বাজার ও তার পশ্চাদভূমির উৎপাদনব্যবস্থা অন্য দিকে মোড় নেয়। তৃতীয় ধরণের শহরের মধ্যে রয়েছে বাজার শহর, যেখানে কোনো শাসনতান্ত্রিক আমলা উপস্থিত থাকলেও বাজারই এর প্রধান ভূমিকা। দ্বিতীয় ধরণের শহর যেমন দেখা যায় দিল্লী, আগ্রা, আমেদাবাদ, লাহোর ইত্যাদি, এর থেকে তৃতীয় ধরণের শহরের সংখ্যা অনেক বেশি। অনেক সময় আবার তৃতীয় শহর বড় হয়ে উঠলে, রাজানুগ্রহে দ্বিতীয় ধরণের শহরে রূপান্তরিত হয়। দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুর এই ধরণের শহরের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। বাংলার মুখসুদাবাদ এইভাবেই মুর্শিদাবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল যদিও কাশিমবাজার বা মালদা দ্বিতীয় ধরণেরই রয়ে গেল। গুজরাটেও এই ধরণের শহর আছে। সুরাট ও খাম্বাজ প্রথম ধরণের শহর হিসাবে থেকে যায়; এদের পতন দীর্ঘায়িত হলেও এদের চরিত্র বদলায় নি। এছাড়াও আর এক ধরণের শহরের কথা বলা যায়, যার সঙ্গে ধর্ম বা তীর্থ জুড়ে আছে। বারাণসী বা এলাহাবাদ এই

ধরণের শহর। যদিও আকবরের তৈরি এলাহাবাদ দুর্গ একে এক অনন্যরূপ দিয়েছিল। মালদার কাছে পাণ্ডুয়া একসময় রাজধানী হলেও, পরবর্তীকালে হজরৎ পাণ্ডুয়া হিসাবে টিকে থাকে। আজমীর হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই তীর্থক্ষেত্র হিস্যবে দর্শনীয় ছিল।

সতের শতকের সাতের দশকে ফরাসি নাবিক ও ভ্রমণকারী ফ্রঁসোয়া মার্তাঁ সুরাট থেকে মুসলিপত্তনম যাবার পথে বিভিন্ন ধরনের শহরের বর্ণণা দিয়েছেন যার সঙ্গে আমাদের বিভাজন মেলে না। বড় শহর, ছোটো শহর, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শহর, বাজার-শহর, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাজার শহর ইত্যাদির কথা বলেছেন তিনি। এই চোখে দেখা বর্ণনায় কিসের ভিত্তিতে তিনি বিভাজন করলেন, সেটা বলা সম্ভব নয়। মনে হয়, প্রধানত শহরের আকৃতি, জনসংখ্যা ও শহরের প্রধান চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে এই বিভাজন করেছেন যদিও জনসংখ্যার কোনো উল্লেখ করেন নি। জনসংখ্যার কথায় আমরা পরে আসব।

তের শতক থেকেই ভারতে শহর তৈরির নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা ধরেছেন। ষোল শতকের মাঝামাঝি থেকে অর্থাৎ মুঘল যুগের গোড়া থেকেই আঠের শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ধরণের প্রচেষ্টা আবার নতুন করে শুরু হয়। কেউ কেউ এই যুগকে শহর তৈরির স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন যদিও মুঘল সাম্রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় পনের শতকের শেষ থেকেই এই প্রচেষ্টা কার্যকর হতে শুরু করেছিল। সুলতানী শাসনের ক্ষমতা কমে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শহরের উত্থান লক্ষ্য করা যায় যদিও ঐসব শহরের স্থায়িত্ব গড়ে ৭৫ বছরের বেশি ছিল না। ১৪০০ সালে বাহমনি রাজা তাজউদ্দিন ফিরোজ ভীমা নদীর ওপর ফিরোজাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চাশ বছর পরে এটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। গুজরাটের সুলতান মহম্মদ বেগারা আহমেদাবাদে ২৫ মাইল দূরে মহম্মদাবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময়ে তিনি চম্বানীর শহর বরোদার অদূরে স্থাপন করেন। রাজস্থানেও ঐ সময়ে বিভিন্ন শহর প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়। মাণ্ডু শহরের উত্থানের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয় ও প্রাদেশিক শক্তির উত্থান লক্ষ্য করা যায়। দিলওয়ার খান ঘোরী ১৪০১ সালে শহর শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আলপ খান হোসাঙ শাহ্ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন ও মাণ্ডুতে রাজধানী সরিয়ে আনেন। পরবর্তী শাসক মাহমুদ শাহ্র সময়ে ঐ শহর তৈরি চলতে থাকে। পর্যটক আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার যে, বিজয়নগর প্রায় এক শতক ধরে তৈরি হচ্ছিল এবং পনের শতকের মাঝামাঝি মধ্যগগনে পৌঁছয়। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঐ সময় যে বাজার শহর হচ্ছিল তার তালিকা ঐতিহাসিক লাকতি দিয়েছেন। বাংলাতে পনের শতকের মাঝামাঝি গৌড় শহর তৈরি হতে শুরু করেছে যার পরিধি ষোল শতকের প্রথমে বারো মাইল বিস্তৃত ছিল– সমকালীন পর্তুগিজ ভ্রমণকারীরা সে-কথা বলেছেন। ঐ সময়েই ছোটো ছোটো বাজার শহরের কথা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় যার মধ্যে সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর উল্লেখযোগ্য। এই

সব কেন্দ্রগুলিকে শহর বলা যায় শুধু আকৃতিগত কারণ বা জনসংখ্যার জন্য নয়। এই সব শহরের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাজারের ঘনিষ্ট যোগ ছিল। অধ্যাপক বি.ডি. চট্টোপাধ্যায় যে ধরণের যোগাযোগ থাকলে শহর বলে ধরা যেতে পারে বলেছেন, সেগুলি এর মধ্যে ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, এই সব শহরে যে ধরণের ধর্মমতের জোয়ার আসে, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বা মুসলমান ধর্মমত থেকে ভিন্ন এবং অধিকাংশ ধর্মমতের প্রবক্তা ছিলেন নিম্নশ্রেণীর মানুষ যাঁরা সব মতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিশদ গবেষণার অভাবে এই ধরণের যোগাযোগ সম্বন্ধে বলা মুশকিল। শুধু এইটুকু বলা চলে যে, মুঘল যুগের আগে থেকেই উৎপাদন ও বাজার বিভিন্ন জায়গায় বাড়তে থাকে ও প্রাদেশিক শক্তির উৎসাহে নতুন কেন্দ্র তৈরি হতে থাকে। অতএব মুঘলরা আসার সঙ্গে সঙ্গে যে শহর তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল মুঘল শক্তির উৎসাহে বা নতুন উৎপাদনের তাগিদে এটা সব সময় মেনে নেওয়া যায় না। অন্তত বাংলায় দেখা যায় যে, গৌড়ের পতনের পর (১৫৭৫ সাল) রাজমহল বা তাণ্ডায় রাজধানী সরিয়ে নিলেও, পূর্ববাংলায় মুঘল শক্তির বাইরে ছোটো বাজার শহর গড়ে উঠছে যেগুলি গৌড়, সপ্তগ্রাম বা রাজমহল থেকে আলাদা। এই সব বাজার-শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যশোর, বাকলা, শ্রীপুর, সোনারগাঁও ইত্যাদি। প্রতিটিতেই চাল ও কাপড়ের আড়ৎ এবং কোনো কোনো জায়গায় প্রচুর পরিমাণে দেশী ও বিদেশী বণিক আছে। কোথাও কোথাও পুরুষ ও মহিলারা হাতির দাঁতের ও সোনা-রুপোর গহনা পরছে যেগুলি প্রধানত বিদেশী বাণিজ্যের সহায়তায় আসছে। শহরের প্রধান রাস্তার দুপাশে বাড়ি ও গুদাম। কোনো শহরেই কোনো পাঁচিল নেই, ফলে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে শহরের অবাধ সম্পর্কের একটা ইঙ্গিত মেলে। সমকালীন পাদরিরা নদীর একধারে বন্য জন্তু ও অন্যধারে আখের চাষের কথা বলেছেন। সুতরাং মুঘল যুগের প্রারম্ভে শহরাঞ্চল যে আরো পূর্বদিকে সরে আসছিল সেটা পরিষ্কার। যদিও জমিদারদের উদ্যোগই ছিল এর প্রধান উৎসাহ। ফলে মুঘলরা যে ঢাকায় তাদের রাজধানী বসাবে এটা সহজেই অনুমেয়। একদিকে বারভূঁইয়াদের ও অন্যদিকে মগ ও আরাকানী আক্রমণ ঠেকানোর জন্য এখানে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলা চলে। রাজনৈতিক কার্যকারণ নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে বা প্রতিষ্ঠিত শহরের অবলুপ্তি এগিয়ে আনে সেটা আজ আর অজানা নয়।

বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে কোনো কোনো পণ্ডিত মুঘল যুগে শহরাঞ্চল বদলে যাওয়ার কথা বলেছেন। সুলতানী যুগের প্রথমদিকে ইক্তার রকম থেকে বলা যায় যে, যমুনা ও সাটলেজের মধ্যবর্তী জায়গা ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের মধ্যবর্তী অঞ্চল উন্নত হয়েছিল। মুঘলযুগেও গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চলের উন্নতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু সতের শতক থেকে উত্তর প্রদেশের একটা অংশে শহর তৈরি হতে থাকে। এর মধ্যে অযোধ্যা উল্লেখযোগ্য। পনের শতকের শেষে জৌনপুরের অবনতির পর প্রথমে ফৈজাবাদ ও পরে লক্ষ্ণৌ-এর উন্নতি লক্ষ্য করা যায় যদিও এই দুই শহরের পিছনে রয়েছে নবাব ওয়াজিরদের বলিষ্ঠ অবদান। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সুরাট

ও খাম্বাজের অবনতির পরও গুজরাটে পুনা ও বরোদার উত্থান মারাঠাদের ছত্রছায়ায় হয়েছিল। হুগলির পতনের পর কলকাতা ও মসুলিপত্তনমের পত্তনের ফলে মাদ্রাজের উন্নতি দেখা যায়। পশ্চিমে সুরাটের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই বন্দরও উঠতে থাকে। সুতরাং শুধু বাণিজ্যিক বা ভৌগোলিক কারণে বন্দরের পতন বা উত্থান হয় এরকম নয়। রাজনৈতিক কারণ ও তার পিছনের পশ্চাদভূমির অবদান যথেষ্ট আছে। সুরাটের অবনতির সম্পর্কে বলা যেতে পারে, তার সঙ্গে পশ্চাদ্‌ভূমির বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু খাম্বাজের বেলায় তা বলা চলে না। মাঝে মাঝে মারাঠাদের আক্রমণ হলেও সুরাটের মতো লাগাতার আক্রমণ খাম্বাজের ছিল না। ফলে ১৭৪২ সালের পর মারাঠা অধিকার সম্পূর্ণ হলে পশ্চাদ্‌ভূমির উৎপাদনবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় যার সুযোগ ইংরাজরা বাণিজ্যিকভাবে নিতে দ্বিধা করে নি। ফলে বলা যায় যে, শহরের উত্থান পতনের মধ্যে জটিল কার্যকারণ নিহিত আছে— একই এলাকায় এক এক ধরণের কার্যকারণ কাজ করছে। অন্যদিকে উত্তর ভারতের শহরাঞ্চলের অবনতির পিছনে অবক্ষয়মান ও অন্তর্দ্বন্দ্বেভরা মুঘল সাম্রাজ্যের অবস্থা যে অনেকখানি দায়ী সেটা সহজেই বলা যায়। পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলের শহরতলি অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীর্ণ হতে থাকে। অযোধ্যাকেই কেবলমাত্র এর ব্যতিক্রম বলা যায়।

ষোল ও সতের শতকের অধিকাংশ শহরই মুসলমান ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল বলে ধরা হয়। যেহেতু মুসলমানরা সংখ্যায় কম ছিল সেহেতু ঐ-ধরণের নামকরণ বাস্তবানুগ নয়। বাগদাদ, কায়রো, বা বোখারার মতো চেহারা আগ্রা বা দিল্লীর ছিল না এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কিন্তু মুসলমান শাসক ও অধিকসংখ্যক মুসলমান অভিজাতবর্গ থাকার ফলে বড় বড় শহরের কাঠামোর মধ্যে একটা ছন্দ পাওয়া যায়, যাকে অন্তত ষোল শতকের ইওরোপীয় পরিব্রাজকরা 'মুরশহর' বলে অভিহিত করেছেন। বড় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা (যদিও দক্ষিণের হিন্দু মন্দির শহরগুলিতে বড় পাঁচিল ছিল), ভেতরে অসংখ্য স্নানাগার বা হাম্মাম (সুরাট শহরে একাধিক স্নানাগার ছিল), প্রায় প্রতিটি মহল্লাতেই একটি মসজিদ, জামী মসজিদ ও পাশে চক বা বাজার, অভিজাতবর্গের বাগান ও ফোয়ারা দেওয়া বাড়ি বিভিন্ন ধরণের বাজার— সব মিলিয়ে জীবনযাত্রার ছন্দ প্রায় সব শহরেই একই ধরণের। অবশ্য বাড়ির চেহারা সব জায়গায় এক ধরণের নয়। বাংলা ও গুজরাটের স্থাপত্যশিল্পের চেহারা আলাদা, অন্তত উত্তরের থেকে যেখানে তুর্কি ও ইরাণী প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় ছিল। বাংলা ও গুজরাটে মিশ্রিত, ফলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনেক বেশি। এই ধরণের আঞ্চলিক ছাপ রাজস্থানের প্রাসাদগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়।

ষোল শতকে বাংলার গৌড় শহরের বিশালতা সমকালীন পর্তুগিজ ভ্রমণকারীরা লক্ষ্য করেছেন। ১৫২১ সালে আগত পর্তুগিজ আন্টনি ব্রিটোর দোভাষীর লেখা থেকে জানা যায় যে, গৌড় শহর প্রায় ১২ মাইল লম্বা গঙ্গার ধারে ও প্রস্থে চার মাইল। উল্লেখযোগ্য যে, সুলতানী শাসক গিয়াসউদ্দিন ফিরোজ শাহ্‌র তৈরি বড়

বাঁধই তিনদিকে পাঁচিলের কাজ করছে। এর মধ্যেই শহরটি বাড়ছে এবং শহরতলিতে নতুন বাসা তৈরি হচ্ছে।

ষোল শতকের শেষে গৌড় পরিত্যক্ত হয়ে গেলেও, সতের শতকে উত্তর ভারতের শহরগুলি বাড়তে থাকে। আগ্রার পর্যটক জন জুরদাঁ সতের শতকের প্রথমে আগ্রার শহরতলি তার পাঁচিল থেকে শুরু হয়েছে এ-কথা বলেছেন। অন্যান্য শহরেও ঐ একই ধরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর সহজ কারণ হয়ত ছিল যে, মুঘল অভিজাতরা পাঁচিলের বাইরে বাগান বাড়ি তৈরি করতেন যার চারপাশ ঘিরে জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। বাণিজ্যিক শহর সুরাটেও বণিকরা এই ধরণের বাগানবাড়ি শহরের পাঁচিলের বাইরে রাখতেন যার কথা সমকালীন ইওরোপীয় বণিকদের লেখায় পাওয়া যায়। পীর, ফকির বা সাধুসন্তদের শহরের বাইরের আস্তানা জনপ্রিয় হলে, শহরও ঐদিকে বাড়তে থাকে। দিল্লীর বাইরে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার আস্তানা ও পরবর্তীকালে তাঁর সমাধি, এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

শহরের ভিতরে ও বাইরে অভিজাতদের প্রাসাদোপম সৌধ ইওরোপীয় পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, আপামর জনসাধারণের দরিদ্র কুটির তাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। খড়ে ছাওয়া পর্ণকুটির। বাঁশ দিয়ে ঘেরা, প্রায় আসবাবশূন্য দরিদ্রদের বাসস্থানের কথা প্রায় সব পর্যটকই লিখে গিয়েছেন। মুঘল প্রশাসনের এই ছন্দোময় ছবি থেকে ফরাসি পর্যটক ফ্রাঁসোয় বার্নিয়ার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যে মধ্যবর্তী শ্রেণী নেই। অধ্যাপক ইকতাদার আলম খান এই উক্তির ভ্রান্তি আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন। সমকালীন বাংলা সাহিত্য থেকে ষোল শতকের নবদ্বীপের চেহারা দেখলে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ও তার বাড়ি সহজেই খুঁজে পাব।

মুঘল যুগে শান্তি শৃঙ্খলা, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তার ও ফলক্রমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার সঙ্গে শহরাঞ্চলের বর্ধিষ্ণুতা অনেক ঐতিহাসিকই লক্ষ্য করেছেন। কাঁচামাল গ্রাম থেকে শহরে এনে তার থেকে বাণিজ্যিক পসরা তৈরি হতো যার ফলে শহরের লোকসমাগম বৃদ্ধি পায়। তাদের সকলেই যে শহরে থাকত এমন কথা নেই। বার্নিয়ার এক জায়গায় বলেছেন যে, গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষকরা অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হয়ে শহরে আশ্রয় নিত। মারাঠা আক্রমণের ফলে সুরাটের আশেপাশের কৃষক ও কারিগর যে সুরাট শহরে এসেছিলেন (তাদের গরুবাছুর ইত্যাদি নিয়ে) সেকথা ফরাসি বণিকদের চিঠিতে পাওয়া যায়। আবার অন্য ধরণের কথা বার্নিয়ার আর এক জায়গায় বলেছেন। দিল্লীর কারখানা প্রসঙ্গে বলছেন যে, কারিগররা বাইরে থেকে সূর্যোদয়ের সময়ে আসে ও সূর্যাস্তের পরে চলে যায়। দিল্লী, আগ্রা বা লাহোর কোনো না কোনো সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী হলেও, তার কারিগরি উৎপাদন ও বাজারের প্রভাব শহরগুলিকে বাড়তে সাহায্য করেছে। আঠের শতকের শেষ দিকে ফরাসি পর্যটক মোদাভ আগ্রা শহরের অবক্ষয়ের কথা লক্ষ্য করে কারিগরি শিল্প ও বাজারের অবনতির কথা বলেছেন। এর জন্য তিনি দায়ী করেন প্রধানত আগ্রা অঞ্চল থেকে মনসবদারদের চলে যাওয়া ও দিল্লীতে পাকাপাকিভাবে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা।

মুঘল যুগে দিল্লী শহরের ভেতরকার স্তরবিন্যাস ও তার অবক্ষয় সম্পর্কে প্রয়াত অধ্যাপক সৈয়দ নুরুল হাসান মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন। সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে অভিজাতবর্গের প্রচেষ্টায় যে শহর বেড়ে উঠেছিল তার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং আঠের শতকের শেষ থেকে সামন্তপ্রভুদের অবক্ষয়ের ফলে শহরের অবনতি শুরু হয়েছিল এ-কথাও বলেছেন। ইংরাজদের আগমনের ফলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা— যা শহরে শুরু হয়েছিল সেটিও রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অধ্যাপক হাসানের মতে, শহরের নিজস্ব কাঠামো-রীতি আছে। দিল্লী শহরের কাঠামো আলোচনায় অধ্যাপক হাসান বিভিন্ন স্তরভেদ নিয়ে আসেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মুঘল ভারতে গরীব ও বড়লোকদের থাকার এলাকা আলাদা ছিল না এবং বাসস্থানের এলাকার সঙ্গে বাণিজ্যিক এলাকার প্রভেদও ছিল না। বহু জায়গায় একই জাতি বাস করত যদিও বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যাতায়াত ছিল। নানান উৎসব বিভিন্ন সম্প্রদায় একসঙ্গে পালন করত। বসন্ত পঞ্চমীতে যেমন মুসলমানরা যোগ দিত, নাসিরুদ্দিনের চিরাগ-ই দিল্লীতে তেমন হিন্দুরাও যোগ দিত।

শাহজাহানাবাদ শহর প্রধানত গড়ে উঠে দুর্গ ও জামী মসজিদের পাশে। চাঁদনি চককে শহরের মধ্যস্থল বা বাণিজ্যিক এলাকা বলে অভিহিত করা যায়। ছোটো রাস্তাকে বলা হতো *কুচা* (যেমন কুচাই বুলাকী বেগম)। এগুলিকে এখন গলি বলা হয়। পথ দুপাশে ভাগ হয়ে গেলে বলা হতো *সিরাহা* এবং এলাকাকে বলা হতে *মহল্লা*। অনেকসময় কারিগরদের কাজের ভিত্তিতে এলাকার নামকরণ হতো যেমন মহল্লা ধোবীওয়ালা। মহল্লার মধ্যে বাজার ছিল। সব থেকে বড় বাজারকে *চক* বলা হতো। সাদাতল্লা খানের নামে *চক* ছিল। সাধারণত পথের দুপাশে সারিবদ্ধ দোকানঘর ও তার ওপরে বা পিছনে ছিল বণিকদের থাকার বাড়ি। বাজারের নামকরণ অনেকসময় কারিগরের কাজের ভিত্তিতে ছিল— যেমন জুহুরী বাজার। এছাড়াও ছিল পাইকারী বাজার যেগুলি *গঞ্জ* নামে পরিচিত ছিল— যেমন দরিয়াগঞ্জ, পাহাড়গঞ্জ ইতাদি। *মণ্ডি* বলা হতো প্রধানত বড় পাইকারী বাজারকে— যেমন সবজিমন্ডি। বাজারের যে অংশে ওপরে ছাউনি রয়েছে, তাকে বলা হতো *ছাট্টা*। এখানে বিশেষ ধরণের কারিগররা কাজ করত ও ঐখানেই থাকত। কাটরা ছিল চতুষ্কোণ ছোটো বাজার এবং প্রধানত জিনিসের জন্যই নামকরণ ঐরকম ছিল— যেমন কাটরা নীল, ঘি কা কাটরা ইত্যাদি।

এলাকাগুলির নামকরণ ঐ সময়ে হয়েছিল প্রথমে যিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন তার নামের ভিত্তিতে— যেমন হাভেলি ইব্রাহিম খান, হাভেলি আজম খান ইত্যাদি। এর ব্যতিক্রমও ছিল। হাভেলি বলতে থাকার বাসা ও তার আশপাশ সংলগ্ন অন্যান্য বাড়ি বোঝায়। যেমন হাভেলিতে ঢুকবার মুখে ছিল সারিবদ্ধ কতকগুলি ঘর (অনেক সময় দোতালা) যাকে বলা হতো *দেউড়ি*। এর পরে থাকত উঠোন (বলা হতো *সাহন*) এবং তারপরে *মহাল সরা* বা থাকার জায়গা। দোতলা বা তেতলা বাড়ি ছিল যার কথা বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে গোয়ালিয়র সম্বন্ধে বলেছেন। দোতলাকে

বলা হতো *বালাখানা*। *দিওয়ানখানা* ছিল অভিজাতদের কাজের ঘর। এছাড়া ছিল *বুর্জ* বা মিনার ও সংলগ্ন ঘর।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই ধরণের হাভেলি প্রধানত উত্তর ভারতের বৈশিষ্ট্য, যার ছায়া আমরা হায়দ্রাবাদ বা গোলকুণ্ডাতেও পাই। সমকালীন ইওরোপীয় পর্যটকদের বর্ণনা ও চিত্র দেখে বোঝা যায় সুরাটেও এই ধরণের দোতলা বা তেতলা বাড়ি ছিল তবে তার ছাদ অনেকসময় ছিল সমান। ছাদে মহিলারা বাগান করতেন ও অবসর বিনোদন করতেন। ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির জানালা ছিল অনেক সময় কাঁচের বা কুমীরের চামড়ার, যার ফলে রোদের তাপ কম হতো। হিন্দু বা জৈন ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির ভেতরেই অনেকসময় মন্দির ও বাগান ছিল। শিবাজীর আক্রমণের ফলে ১৬৬৮ সালের পর সুরাটে পাঁচিল দেওয়া হয় কিন্তু তার শহরতলী বেড়ে যাবার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে আবার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়।

শাহজাহানাবাদে ১৬৫০ সাল নাগাদ একটা পাঁচিল দেওয়া হয়েছিল যেটি পরপর কয়েকটি বর্ষায় ভেঙে যায়। ১৬৫১ থেকে ১৬৫৮ সালের মধ্যে প্রায় চার মাইল লম্বা ১২ ফুট ঘন ও ২৭ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে শহরটি ঘেরা হয়। এর ২৭টি বুর্জ ছিল ও বহু দরওয়াজা ছিল, যার মধ্যে অনেকগুলিরই অস্তিত্ব এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকগুলো ছোটো দরওয়াজা দিয়ে সহজে ঢোকা বা বেরোনো যেত।

অধ্যাপক স্টিফেন ব্লেক মনে করেন যে, হিন্দু শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী শাহজাহানাবাদের ছক করা হয়েছিল। একটি মানচিত্র করে তিনি দেখাচ্ছেন যে, করমূকা ছকই ছিল শাহজাহনাবাদের মূলে। উত্তর-দক্ষিণ পথ আকবর বাদী ও কাশ্মীরী দরওয়াজাকে সংযোগ করে ধনুকের ছিলার মতো হয়েছে। দক্ষিণ থেকে পুবের রাস্তা যেটা তুর্কমান দরওয়াজার সঙ্গে আজমিরি ও লাহোরী দরওয়াজার সংযোগ ঘটিয়েছে, সেটি ছিল ধনুকের প্রধান বাঁকা অংশ। এই ধরণের ছকে প্রধান দুটি পথের সংযোগে ছিল সম্রাটের দুর্গ, চাঁদনি চক ও ফৈজ বাজার। অবশ্য এই ছিলা ধরণের শহরের চেহারা আমরা সুরাট শহরেও দেখি যেটি অধ্যাপক মেহতার মতে, গড়ে উঠেছিল ভৌগোলিক ও বাণিজ্যিক কারণে।

শহরে জলের অভাব দূর করার জন্য শাহজাহান ৭৮ মাইল দূর থেকে খাল কেটে জল আনিয়েছিলেন যাকে বলা হতো *নহর-ই বিস্ত*। ২৫ ফিট চওড়া ও ২৫ ফিট গভীর এই খাল কাবুলী দরওয়াজা দিয়ে শহরে ঢুকেছিল, যার একটি অংশ চাঁদনি চকের দিকে গিয়ে ফৈজ বাজারে মেশে। অন্যটি জাহানারা বেগমের বাগান দিয়ে দুর্গে যায় এর উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে শাহবুর্জের মধ্যে। পূর্বদিকের মার্বেল পাথরের নর্দমা দিয়ে এই জল প্রাসাদের বাগানে গিয়েছিল।

বড় ও মাঝারি ধরণের শহরের বৈশিষ্ট্য ছিল শহরের উপকণ্ঠে বা মাঝে ছোটো বড় সরাইখানা যেখানে বণিক ও পর্যটকরা রাতের আশ্রয় নিতে পারতেন। ফরাসি পর্যটক মাঁর্তা সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা যাবার পথে এ-ধরণের কয়েকটি সরাই

পেয়েছিলেন। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সরাইগুলি ছিল সুরক্ষিত। ভেতরে ঘরের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ ছিল– মধ্যবিত্ত ও বড়লোকদের জন্য থাকার ঘড় ছিল বড়। ভেতরে ছোটো কাটরা ও বাগান ছিল। অভিজাতরা ও মুঘল পরিবারের লোকেরা এই সব সরাই নিজ ব্যয়ে তৈরি করেন। বড় সরাইতে প্রায় আটশ থেকে হাজার লোক রাত্রিবাস করতে পারত। সরাই-এর ভেতরে দর্জি, ধোপা, নাপিত, হাকিম-বৈদ্য, নাচনেওয়ালী, গায়ক ইত্যাদি থাকত। চাঁদনি চকে নবাব ফতেপুরী বেগম এই রকম একটা সরাই তৈরি করেন। উল্লেখযোগ্য যে, চাঁদনি চকে তাঁর বাগানে ঢুকবার মুখে জাহানারা বেগম এরকম একটা সরাই তৈরি করেন। বার্নিয়ার এই সরাইটিকে দিল্লীর বড় একটা দ্রষ্টব্য বস্তু বলেছেন। দোতলা এই সরাইটিতে নব্বইটি ঘর ছিল– প্রতিটি ঘরের ভেতরই চিত্রবিচিত্র করা। অত্যন্ত ধনী পারসিক ও উজবেক বণিকরাই এই সরাইতে থাকার অনুমতি পেত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের একটি প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, পাঁচিলের মধ্যে ৪১০টি সৌধ রয়েছে যার মধ্যে ৩৭৮ টি দুর্গ-প্রাসাদের বাইরে। এর মধ্যে ২০২ টি ছোটো বড় মসজিদ আছে। এই সব সৌধের মধ্যে দুর্গটি ১৬০৯ থেকে ১৮৫৭-এর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। ১৬৩৯ থেকে ১৭৩৯ সালের মধ্যে একশটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে অধ্যাপক ব্লেক মনে করছেন। এদের মধ্যে ছোটো টিলার ওপরে নির্মিত হয়েছিল ভারতের সর্ববৃহৎ মসজিদ– জামী মসজিদ, যার ভিত্তিপ্রস্তর গাঁথা হয় ৬ অক্টোবর ১৬৫০ সালে।

শাহজাহানাবাদের বাড়িগুলিকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন অধ্যাপক নুরুল হাসান। এগুলিকে তিনি *মকান* বলে অভিহিত করেছেন। *মঞ্জিল* শব্দটি ব্যবহৃত হতে হতে উর্দুতে এসে গেছে– যেমন মঞ্জিল জাহান-আরা বেগম। এছাড়া ছোটো বাড়িকে কোঠি বলা হতো যেখানে অনেকসময় বিভিন্ন ধরণের কারিগরি কাজ হতো। সেই অর্থে কারখানা বাড়িকে *কোঠি* বলা যেতে পারে। বাংলো শব্দটি বাংলা থেকে এলেও ইংরাজরা এর বহুল প্রচার করে। *বাংলো* বলতে প্রধানত বোঝানো হতো আলাদা বাড়ি। কয়েকটি বড় বড় হাভেলির কথা অধ্যাপক ব্লেক বলেছেন, যার মধ্যে কামার-আমদিন খানের হাভেলি উল্লেখযোগ্য। সমকালীন ঐতিহাসিক মহম্মদ সালি এই ধরণের বড় হাভেলির কথায় বলেছেন যে, এদের উঠোনে শহর খালি হয়ে যেতে পারে। ১৭৩৯-এ নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণের আগে দিল্লী শহর যে জনসমাগমে পরিপূর্ণ ছিল এবং নিঃসন্দেহে সমকালীন যে কোনো শহরের থেকে জাঁকজমকপূর্ণ ছিল সেকথা তৎকালীন বিদেশী পর্যটকরা বলে গিয়েছেন।

প্রাক্ মুঘল যুগের সুলতানরা পুরোনো হিন্দু শহরগুলিকে নিজেদের মতো করে নিয়েছেলেন। এর ফলে হিন্দু শহরের সঙ্গে মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণ হয় যার প্রমাণ আমরা দিল্লী, লাক্ষ্ণৌ, গৌড়, বিদর, বিজাপুর ও অন্যান্য জায়গায় দেখি। কখনো কখনো মুসলমান শাসকরা নতুন শহর তৈরি করেছেন যার প্রমাণ ফিরোজাবাদ, আহমেদাবাদ বা চম্পানীরে পাওয়া যায়। মুঘলরা তাদের পুর্বসূরীদের পথ অনুসরণ

করেন ও পুরোনো শাসনকেন্দ্রেই তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র রাখেন। এর ফলে দিল্লী, লাহোর, আগ্রা বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু কখনো কখনো মুঘল সম্রাটরাও নতুন শহর স্থাপন করেছেন। আকবরের ফতেপুর সিক্রী ও শাহজাহানের শাহজাহানাবাদ এদের মধ্যে পড়ে। মুঘল সাম্রাজ্যের বাইরেও এই ধরণের শহর গড়ার ঝোঁক দেখা যায়– যেমন মহম্মদ কুলি কুতুব শাহের হায়দ্রাবাদ শহর তৈরি। অবশ্য শুধু রাজানুগ্রহ ছাড়াও অন্য কারণ ছিল। পুরোনো গোলকুণ্ডা শহরের লোকবৃদ্ধির ফলে নতুন শহরের প্রয়োজন ছিল। ১৫৯১ সাল থেকেই নতুন শহর *গিরিডন* ছক অনুযায়ী গড়ে উঠতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই হায়দ্রাবাদ ও গোলকুণ্ডা যমজ শহরের মতো গড়ে উঠতে থাকে।

ফতেপুর সিক্রী তৈরির পিছনে ছিল বোধ হয় তৈমুর বংশের সার্বভৌমতার প্রকাশ। আকবর যে নতুন আদর্শবাদ নিয়ে আসছিলেন যেখানে সম্রাট জগদীশ্বরের ছায়া, যার মধ্যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা প্রচেষ্টা আছে। ফতেপুর সিক্রীতে সেটিই পরিস্ফুটিত হয়েছে। আল মনসুরের বাগদাদ বা গোলাকার আকৃতি করে সাম্রাজ্যের চেহারা দেওয়াও হয়ত লক্ষ্য ছিল। সেখ সলিম চিস্তি ও অন্যান্য শেখদের সঙ্গলাভে এর একটা ধার্মিক চেহারা হয়ত এসেছিল যেটা শাহজাহানের শাহজাহানাবাদে এত পরিষ্কার নয়। তবুও বলা যায় যে, কাছাকাছি নিজামুদ্দিনের বা অন্যান্যদের সমাধি থাকায় ধার্মিক যোগাযোগ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় নি।

বহু শতকের সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রে শাহজাহান ফিরলেও পুরোনো দিল্লী ও নতুন শাহজাহানাবাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাব বজায় রেখেছিলেন। শেরশাহর শহর থেকে শাহজাহান দূরে ছিলেন যদিও হুমায়ূন ও আকবর কিছু সময় ঐ শহরে (পুরোনো কিল্লার উত্তরে) বাস করেছিলেন। ফিরোজ তুঘলকের ফিরোজাবাদ থেকেও এটি দূরে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফরাসি পর্যটক তাভারনিয়ার-এর লেখা থেকে এই দূরত্ব পরিষ্কার হয়ে আসে যদিও পুরোনো দিল্লীর ভেঙে পড়া ইমারৎ নিয়ে ফরাসি পর্যটক দুঃখ করছেন। অবশ্য এটা মনে রাখা দরকার যে, সম্রাট যেখানেই থাকেন, সেটিই তখন রাজধানী হয়। ফলে ১৬৮১ সালে আওরংজেব দাক্ষিণাত্যে চলে গেলে শাহজাহানাবাদের পতন শুরু হয়। ১৭১২ সালে সম্রাট বাহাদুর শাহ আবার দিল্লীকে পুরোনো গরিমায় নিয়ে আসেন। বাবর, হুমায়ূন ও আকবরের অধিকাংশ সময় রাজধানী ছিল আগ্রা। জাহাঙ্গীরের সময়ও আগ্রার আধিপত্য বজায় থাকে। শাহজাহানের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত আগ্রা রাজধানী থাকে। শাহজাহানাবাদ তৈরির পরিকল্পনার সময় থেকেই আগ্রার মান নামতে থাকে, যদিও ১৭১৯ সাল পর্যন্ত রাজকীয় কোষাগারের একটা অংশ আগ্রায় ছিল। আওরংজেব প্রথমদিকে আগ্রাকেই পছন্দ করতেন তার কারণ হয়ত ওখানে শাহজাহান বন্দী ছিলেন বলে।

উত্তর আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের শহরগুলির মধ্যে বিভিন্ন মিউনিসিপালটির কাজকর্ম ছিল কি-না এনিয়ে বিতর্ক রয়েছে। হুরানি ও স্টার্ন সম্পাদিত মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার শহর সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বইতে ইসলামিক শহরের সংখ্যা ও বিভিন্ন দিক

সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মতামত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে। একথাও বলা হয়েছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের শহর কতকগুলি গ্রামের সংযোগমাত্র ; ফলে সবাই সমান ও শরিয়তী আইনের ওপর নির্ভরশীল। কোনো করপোরেশন বা মিউনিসিপালিটি দেখা যাচ্ছে না। ফলে কেউ কেউ বলছেন যে, মুঘল ভারতের শহরেও ঐ একই ছবি দেখা যায় যেখানে নাগরিক বলে কেউ নেই এবং তার কোনো ক্ষমতা বা অধিকার নেই। আরও বলা হচ্ছে যে, মুঘল শহরগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। শহরকে সম্পূর্ণ নির্ভর বলা হয়ত বেশি বলা হবে। কিন্তু এটা বলা যায় যে, শহরের বিভিন্ন মহল্লা-গুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এসব মহল্লার নিজস্ব প্রধান অর্থনৈতিক কাজ ছিল যার ফলে একই জাত বা সম্প্রদায় একত্রে একটা মহল্লায় থাকতে চাইত। অন্তত কয়েকটি শহরে নগরশেঠের কথা পাওয়া (যেমন আহমেদাবাদে) যারা শহরের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতেন। এলাকার বয়স্ক লোকেরা মিলেমিশে ঝগড়া-বিবাদ থামাচ্ছেন এরকম উদাহরণও আছে। খাম্বাজ শহরে বা আহমেদাবাদে যে *গিল্ড* ছিল আজ আর তা অজানা নয়। কিন্তু শহর পরিষ্কার রাখা বা নিয়ম কানুন মেনে চলার কাজ দেখতেন কর্তৃপক্ষ যার জন্য বিশেষ আমলা (মহতাসিব ও কোতোয়াল) নিযুক্ত করতেন। মুঘলরা শহরের শাসনের জন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত না করলেও কিল্লাদারই ছিলেন প্রধান কর্তা। বন্দর শহর যেমন সুরাট, কিল্লাদার ছাড়া মুৎসুদ্দী ছিলেন যিনি শহরের শাসনতান্ত্রিক কাজ চালাতেন যার ফলে কিল্লাদারের ক্ষমতা কিল্লার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। খাম্বাজে মুৎসুদ্দী ও ফৌজদার একজনই ছিলেন।

ছোটো ছোটো শহরে মনে হয় কাজীই ছিলেন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি। নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের আক্রমণ তাঁর ওপরই হয়েছিল– অন্য কোনো আমলার নাম পাওয়া যায় না। অবশ্য বড় শহরে প্রধান ছিলেন কোতোয়াল, যার কথা সুলতানী যুগের গোড়ার দিক থেকে পাওয়া যায়। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়াও, কোতোয়াল শহরের কর আদায় করতেন যদিও প্রধান করগুলি ছিল মাল ভেতরে আনা ও বাইরে নিয়ে যাবার জন্য। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে খাম্বাজ শহরের নবাব কাপড়ের জামা করার ওপর কর বসিয়েছিলেন। মনে হয়, কর সংগ্রহ করার আলাদা লোক ছিল। ঐ শহরেই আঠের শতকের তৃতীয় দশকে বাড়ির ওপর কর বসানো হয়। এই কর সংগ্রাহক কোতোয়াল কিনা জানা নেই। এর ফলে কোতোয়াল ও মহতাসিব- এর কাজ প্রায় এক ধরণের হতে বাধ্য। পারস্যের সফাবিদ বংশের রাজত্বকালে দারুগা ও মহতাসিবের মধ্যে ঐ একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোতোয়ালের প্রধান কাজ ছিল আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যার জন্য বিভিন্ন মহল্লার গুপ্তচর নিয়োগ করা হতো। শহরের দরওয়াজার দায়িত্বও ছিল কোতোয়ালের হাতে। বিভিন্ন মহল্লার খবরাখবর ও কর সংগ্রহ করার জন্য প্রতিটি মহল্লায় মীর-ই মহল্লা নিয়োগ হতো বলে মনে করা হয়। বাজার থেকে কর সংগ্রহ করার জন্য অন্য লোক ছিল বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে মহতাসিব-এর কিছু দায়িত্ব ছিল। সমকালীন ইওরোপীয় পর্যটকরা শহরজীবনে কোতোয়ালের ক্ষমতার কথা

বলেছেন। সতের শতকে মুঘল শহরগুলিতে বড়রকমের গোলমালের কথা পাওয়া যায় না। ১৬৮৬ সালের পর থেকে সুরাটে গোলমালের কথা পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলি প্রধানত মুৎসুদ্দীর অত্যাচারের ফল। মারাঠা যুদ্ধের ফলে আশেপাশের গ্রাম থেকে সতের শতকের শেষ দশকে গ্রামবাসীরা সুরাটে জড়ো হলে ভয়াবহ মহামারী দেখা দেয়। আঠের শতকে অবশ্য এ-ধরণের অবস্থা বিরল নয়।

অধ্যাপিকা শিরিন মুসভি আকবরের সময়ের শহরের জনসংখ্যা ধরতে চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড ও অর্থনীতিবিদ অশোক দেশাই-এর বিভিন্ন মত পর্যালোচনা করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে আসছেন যে, ১৫৯৫-৯৬ সালে আকবরের সাম্রাজ্যের খান্দেশ ও বেরার বাদ দিয়ে জনসংখ্যা সাড়ে নয়কোটির ওপর, যার শতকরা ১৫ ভাগ শহরাঞ্চলে বাস করতেন। এর মধ্যে মুসভি পাঁচিলের বাইরে, শহরতলীর জনসংখ্যা ধরেছেন কিনা বলা শক্ত। তাহলে শহরের জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় দেড় কোটির কাছে। এ-ছাড়াও শহরাঞ্চলের করের আলোচনা করে তিনি দেখাচ্ছেন যে, আগ্রা সব থেকে জনসমৃদ্ধ শহর। ইরফান হবিব ফতেপুর সিক্রীর জনসংখ্যা ধরেছেন দু-লাখ কুড়ি হাজার। অন্যদিকে গুজরাটে করের ভিত্তিতে আহমেদাবাদকে সবথেকে বেশি জনবহুল বলা যায়। আগ্রা সুবা ছাড়া গুজরাটের মধ্যেই শহরের সংখ্যা সব থেকে বেশি। শহরের সংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় সুবা লাহোর যেখানে বারোটি শহরের কথা ঐসময়ে জানা যায়, যদিও লাহোর শহর থেকে করের পরিমাণ বেশি নয়। মোরল্যাণ্ডের মত মানলে লাহোর আগ্রা বা দিল্লীর থেকে বড় ছিল বলা উচিত। করের ওপর ভিত্তি করে শহরের আয়তন মাপার অসুবিধা হলো যে, বিভিন্ন এলাকার দাম উঁচু নিচু থাকায় সমানভাবে তুলনা করা অসুবিধাজনক। মোট জমার ভিত্তিতে বলা যায় যে, গুজরাটের শহরাঞ্চলের কর থেকে আয় অনেক বেশি— প্রায় শতকরা উনিশভাগ। এর থেকে পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, অন্যান্য বাণিজ্যিক ভিত্তি অনেক সুদৃঢ় যদি আমরা দেখি যে, অন্যান্য সুবার থেকে শহরাঞ্চলের করের আয় মোট জমার শতকরা পাঁচ ভাগের কাছাকাছি।

আকবরের রাজস্বের প্রথম দিকে বাংলায় বড় শহর ছিল গৌড়। পর্তুগিজদের রচনা থেকে জানা যায় প্রায় দু-লক্ষের কাছে জনসংখ্যা ছিল যা সমসাময়িক আগ্রা বা ফতেপুর সিক্রীর সমান। ফরাসি পর্যটক পর্তুগিজদের মতোই বলছেন যে, গৌড়ে চল্লিশ হাজার চুল্লি ছিল যার থেকে সহজেই দু-লক্ষ জনসংখ্যা ধরা যায়। যদিও এই সংখ্যা সুরাটের সতের শতকের শেষের সমান। আবুল ফজলের হিসাব মতো, খাজনা থেকে বাংলার শহরের একটা ধারণা সবা সামিউদ্দিন তার অপ্রকাশিত গবেষণাপত্রে দিয়েছেন। বাংলার বিভিন্ন সরকারের জমার হিসাব দেখলে দেখা যাবে যে, গৌড় শহরে জমা সব থেকে বেশি। এর তুলনায় যশোরের জমা এক চতুর্থাংশ এবং সোনারগাঁও-এর জমা যশোহরের এক-চতুর্থাংশ। সমকালীন ইওরোপীয় পাদ্রীরা বাকলা, শ্রীপুর, চ্যাণ্ডিকান (প্রতাপাদিত্যর রাজধানী) ইত্যাদির কথা বললেও আগ্রা বা দিল্লীর সমকক্ষ একমাত্র গৌড় শহরই ছিল। মুঘল যুগে যখন জমা বাড়ার প্রবণতা

শুরু হয়েছে তার কিছু আগেই গৌড় শহর মহামারীর ফলে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ফলে আগ্রা বা দিল্লীর যে প্রবহমান ধারা পাওয়া যায় প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ না হবার ফলে গৌড় শহর সম্বন্ধে সে-ধরণের তথ্য বিরল।

১৬০০ সাল নাগাদ সমকালীন পৃথিবীর তিনটে শহরের জনসংখ্যা দু-লাখের ওপরে ছিল। এগুলি হলো ইস্তাম্বুল, লণ্ডন ও প্যারিস। এছাড়া আরো নয়টা শহর ছিল যার জনসংখ্যা এক লাখের ওপরে। এর তুলনায় মধ্যযুগের ভারতীয় শহরের জনসংখ্যা ভালো ছিল বলা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিকোলো কণ্ঠি বিজয়নগরের জনসংখ্যা ধরেছেন প্রায় একলাখের কাছে। আগ্রায় যখন সম্রাট উপস্থিত ছিলেন, তখনকার জনসংখ্যা পাঁচ লাখ বলে পাদরী জেভিয়ার বলেছেন। ১৬৪০ সাল মানরিক আগ্রার জনসংখ্যাকে ছয় লাখ বলেছেন বিদেশীদের বাদ দিয়ে। সুতরাং জনসংখ্যার দিক দিয়ে আগ্রার জনসংখ্যা প্যারিসের (পাঁচ লাখ) থেকে বেশি ছিল। লাহোরকে এশিয়ার দ্বিতীয় বড় শহর বলে কয়েকজন বিদেশী পর্যটক সতের শতকের গোড়ায় বলেছেন। মানরিক ১৬৩১ সালে পাটনার জনসংখ্যা দুলাখের কাছাকাছি ধরেছেন।

সুতরাং বিভিন্ন ধরণের শহর মুঘল ভারতে দেখা যায়। শাসনতান্ত্রিক শহর, বাণিজ্যিক বা বাজার শহর বা ধর্মসংলগ্ন শহর প্রায় একই এলাকায় পাশাপাশি অবস্থান করে। কিন্তু সব থেকে বড় শহরকেও ঠিক 'মুর' বা 'মুসলমান' শহর বলে বলা যাবে না যেভাবে পণ্ডিতরা মধ্যপ্রাচ্যের শহরগুলিকে মুসলমানী শহর বলে অভিহিত করেছেন। অনেক শহরেই পাশাপাশি মন্দির, মসজিদ ও গির্জার সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও ঐসব শহরের স্থাপত্যে মিশ্রধারার প্রভাব খুব বেশি।

শহরের এই বিশাল জনসংখ্যা ইরফান হবিবের মতামতের কাছে যায়। ১৬০০ সাল নাগাদ উনি সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি দুই লাখের সমান ধরেছেন যার ১৫ শতাংশ শহরাঞ্চলে বাস করত। এই মত শিরিন মুসভির হিসাবের থেকে বেশি। ইংরাজ অর্থনীতিবিদ কিংসলে ডেভিড ১৬০০ সালে জনসংখ্যা সাড়ে বারো কোটির কাছে ধরেছেন। ফলে এটা বলা শক্ত যে, সমগ্র মুঘল যুগ ধরে জনসংখ্যার হার বাড়ছিল কিনা। ডেভিডের হিসাব অনুযায়ী মুঘল যুগে জনসংখ্যা বছরে গড়ে শতকরা ০.১৪ ভাগে বাড়ছিল। উনিশ শতকে এই হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা প্রতিবছর ০.৩৫ শতাংশ হারে বাড়ছিল।

মোরল্যাণ্ড প্রধানত আবুল ফজল প্রদত্ত চাষযোগ্য জমির পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে ষোল শতকের শেষে মুঘল যুগের জনসংখ্যা ধরার চেষ্টা করেছেন। উনি অবশ্য ধরে নিয়েছেন যে, ১৬০০ সালে মাথা পিছু জমি যা ছিল ১৯০০ সালেও ঐ একই ছিল। এর ভিত্তিতে উনি লিখছেন : মুলতান থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত জনসংখ্যা ছিল তিন কোটি থেকে চার কোটির মধ্যে। এর সঙ্গে দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যের আনুমানিক তিন কোটি জনসংখ্যা যোগ করে সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ কোটি।

মোটামুটিভাবে এই তথ্য গৃহীত হলেও মোরল্যাণ্ডের পদ্ধতির কিছু গোলমাল

লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যে মোরল্যাণ্ড সৈন্যসংখ্যার ওপর নির্ভর করে জনসংখ্যা ধরেছেন। কিন্তু উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি। অন্যান্যরা ঐ সময়ের উত্তর ভারতের জনসংখ্যা মোরল্যাণ্ড-এর অনুমানের থেকে বেশি ধরেছেন।

উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে মোরল্যাণ্ড *আরাজী* অর্থাৎ জরীপ করা চাষের জমির পরিমাণের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু আরাজীর মধ্যে পুকুর, চাষযোগ্য অনাবাদী জমি ইত্যাদি রয়েছে। আওরংজেবের সময়ের একটা হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ষোল শতকের শেষ থেকে আরাজী অনেক বেড়েছে। কিন্তু তখনও অনাবাদী জমি অনেক পড়ে আছে। এখন এটাই ধরে নেওয়া হয় যে, ১৯০০ সালের আগ্রা ও দিল্লী প্রদেশের তুলনায় ১৬০০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা এক চতুর্থ-পঞ্চমাংশ কম ছিল। অন্যান্য প্রদেশের হার কিছু বেশি বা কম। এই সব হিসাব থেকে বলা যায় যে, ১৬০০ সাল নাগাদ ষাট শতাংশ চাষ তুলনামূলকভাবে কম ছিল। চাষযোগ্য জমির পরিমাপ থেকে সমকালীন লোকসংখ্যা বের করা সহজ নয়। সে-সব সত্ত্বেও অনুমান করা যায় যে, ১৬০০ সাল নাগাদ মুঘল ভারতের জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক চোদ্দ কোটি দুই লক্ষ।

মধ্যযুগের জনসংখ্যা বের করার জন্য প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অশোক দেশাই একটি নতুন পদ্ধতি বের করেছেন। *আইন-ই আকবরী* র প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে উনি দেখাচ্ছেন যে, আকবরের সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ছয় কোটি থেকে সাড়ে আট কোটির মধ্যে। অধ্যাপিকা শিরিন মুসভি অবশ্য দেশাই-এর পদ্ধতির নানা গলদ বের করেছেন এবং জনসংখ্যা দশ কোটির কাছে ছিল বলেছেন।

বিভিন্ন পদ্ধতি ও মত আলোচনা করে ইরফান হবিব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আকবরের সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল দশ কোটি সত্তর লক্ষ থেকে সাড়ে এগার কোটির মধ্যে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও উনি ধরেছেন প্রতি বছরে গড়ে ০.১৪ শতাংশের মতো।

এর মধ্যে কতজন শহরে বাস করত তা বলা শক্ত। যেহেতু চাষিরা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রায় অর্ধেক শস্য রেখে বাকিটা বিক্রি করে দিত, সেক্ষেত্রে হয়ত একটা আলোচনা করা সম্ভব। জমিদাররা নিত শস্যের দশ থেকে পঁচিশভাগের মতো। এরা থাকত গ্রামাঞ্চলে এবং এদের আয় থেকে নিজেদের সৈন্য অন্যান্য লোকজনদের খরচ দিত। মোট প্রায় পয়ঁতাল্লিশ লক্ষ সৈন্য এদের ছিল। এর ফলে বলা যায় যে, মুঘল শাসক শ্রেণীর হাতে জমির খাজনার একটা বড় অংশ পৌঁছাত। এই অংশ শতকরা একুশ ভাগের কম নয় এবং এর সবটাই শহরে খরচ হতো। আয়ের এই বিভাজন থেকে বলা যায় যে, শহরের ও গ্রামের জনগণের সংখ্যা প্রায় সমান। কিন্তু বাস্তবে মনে হয়, শহরের জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা পনের ভাগের কাছাকাছি।

অন্য আর একটি দিক থেকে হিসাব করলেও আমরা শহরের ঐ ধরণের জনসংখ্যার হিসাব পাই। মুঘল যুগে গ্রামের সংখ্যা ইংরাজ যুগের থেকে বেশি ছিল। কিন্তু হবিব

দেখাচ্ছেন যে, মুঘল যুগে গ্রামের পরিধি ছোটো ছিল। আওরংজেবের সময়ে দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও হায়দ্রাবাদ প্রদেশের গ্রামের সংখ্যা পাই ৪৫৫,৬৯৮। সুতরাং আকবরের সময়ে নিজামুদ্দিন *তবাকৎ-ই আকবারী* তে লিখেছেন ১২০ টা বড় শহর। ৩২০০ কসবা এবং প্রত্যেকটার সঙ্গে ১০০ থেকে ১০০০ গ্রাম আছে—এর থেকে মনে হয় না যে, শহরের জনসংখ্যা আকবরের সময়ে এক কোটি ছয় বা সাত লক্ষের কাছে ছিল। নিজামুদ্দিনের হিসাবের সঙ্গে যোগ করলে প্রতি শহরে আমরা গড় পড়তা পাঁচ হাজার লোক পাচ্ছি। অর্থাৎ শহরসমৃদ্ধ ইওরোপের তুলনায় মুঘল ভারতের শহরে জনসংখ্যা খারাপ নয়।

৯

জীবনযাত্রার মান

মুঘল যুগের ইওরোপীয় পর্যটকরা অভিজাত শ্রেণীর একটি ছোটো গোষ্ঠী বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে একথা বারবার বলেছেন এবং আমাদের জনসাধারণ যে দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে সে-কথাও বলতে ভোলেন নি। ভারতীয় সমকালীন সূত্র থেকেও একই চিত্র পাওয়া যায় যদিও ঐ সূত্র থেকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান ধরা খুবই কঠিন। এই বৈপরীত্য যে শুধু মুঘল ভারতের বৈশিষ্ট্য তা নয়। কম বেশি সব জায়গায় এটা পাওয়া যায়।

সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক থেকে গড়পড়তা মান বের করা সম্ভব নয় কারণ বিভিন্ন ধরণের সংখ্যা পাওয়া শক্ত। যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান ও ছন্দ বিভিন্ন ধরনের ছিল অতএব আলাদাভাবে গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মান দেখাই সহজ।

কৃষক

মুঘল যুগের গ্রামের ওপর বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, জমি সমানভাবে সকলকে বিলি করা হয় নি এবং চাষযোগ্য অনাবাদী জমি প্রচুর পড়ে আছে। যদি মূলধন, শ্রম ও উৎসাহ থাকে তাহলে এখানে চাষ করা সম্ভব। বাংলায় ষোল শতকের শেষে কবি মুকুন্দরামের রচনায় ঐ ধরণের একজন বুলাই মণ্ডলের কথা পাওয়া যায়, যে চাষযোগ্য অনাবাদী জমিতে কৃষক ও কারিগর বসাচ্ছে। ঐ সময়েই পূর্ববঙ্গে বা ভাটিতে জমিদাররা লোক বসাচ্ছে, নতুন করে চাষ আবাদ হচ্ছে সেটা সমকালীন খ্রিস্টান পাদরীরা দেখেছিলেন।

গ্রামীণ সমাজ মুঘল যুগে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। *খুদকাস্থ*কে বলা হতো *মালিক-ই জমিন* সরকারি দলিলে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় অবশ্য এদের বিভিন্ন নামকরণ হয়েছিল। যেমন রাজস্থানে *গিরাটি*, মহারাষ্ট্রে *মিরাসী* ইত্যাদি। এরা দাবি করত, যে-জমিতে তারা চাষ করছে সে-জমির আদি মালিক তারাই। দ্বিতীয় শ্রেণীকে বলা হতো *পাহিকাস্থ* অথবা *উপরি*। এরা সাধারণত ভিন্ন গ্রামের কৃষক এই গ্রামে চাষ করার জন্য আসত। এরা ক্ষমতায় বা মর্যাদায় কখনই খুদকাস্থর সমান নয়। তৃতীয়ত ছিল *মুজারিয়ান* অথবা ভাগচাষী যারা খুদকাস্থ বা জমিদারের কাছ থেকে জমি ভাড়া করছে। এছাড়া ছোটো আর একটি শ্রেণী ছিল যারা প্রধানত ভূমিহীন কৃষক। এদের মর্যাদা ছিল গ্রামীণ কর্মচারীদের সমান— যেমন ধোপা, কুমোর ইত্যাদি। শেষের গোষ্ঠী বা শ্রেণীর কোনো জমি ছিল না। কিন্তু তারা কৃষকদের জন্য নানারকম কাজ করত বলে ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ পেত। কখনো কখনো তারা টুকরো

জমি পেত যার খাজনা তারা নির্ধারিত হারের থেকে কম দিত। ফসল তোলার সময় এরা সাময়িক সাহায্যকারী হিসাবে কাজও করত।

এটা বলা খুব শক্ত যে, খাজনা দেবার পর কোন্ ধরণের কৃষকের শস্যের ভাগ কতটা ছিল। মুঘল রাষ্ট্রের সাধারণ দাবি ছিল ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক। অন্যান্য কিছুর ওপর নির্ভর করত কতটা ভাগ থাকবে যার মধ্যে পরম্পরা ও জমিদারদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটা মুখ্য। জমির বৈশিষ্ট্যের ওপরও কিছুটা নির্ভর করত। যেমন রাজস্থানের কোনো কোনো জায়গায় তিনটি উচ্চশ্রেণী— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা রাজপুত ও বৈশ্য বা মহাজন খাজনা দিত সুবিধাজনক হারে। যেখানে কৃষকরা দিচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ আর সেখানে এরা দিত এক-তৃতীয়াংশ, এমন কি কোথাও কোথাও এক-চতুর্থাংশ। গ্রামের আমলাদের— যেমন চৌধুরী বা মুকদ্দম-এর কাছ থেকেও সুবিধাজনক হারে খাজনা নেওয়া হতো। এটা বলা সম্ভব নয় যে, সারা ভারতে এই ধরণের সুবিধা উচ্চশ্রেণী ভোগ করত কি-না।

সুতরাং গ্রামের মধ্যে উঁচু-নিচুর ভাগ দেখা যেত। কিন্তু সমকালীন সূত্র এই ধরণের অসমতার কথা কৃষকদের কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রায় উল্লেখই করে নি। বাবর বা অন্যান্যরা বলেছেন যে, কৃষক বা অন্য নিচু শ্রেণীর লোকেরা খালি পায়ে ঘুরত। পুরুষরা খুব স্বল্প বেশ পরত এবং মেয়েরা যে শাড়ি পরত এটাও তারা বলেছে। আবুল ফজল বলেছেন, বাংলার সাধারণ লোকেরা লুঙ্গি পরে বের হতো। সতের শতকের প্রথমদিকের একজন ইওরোপীয় পর্যটক লাহোর ও আগ্রার মধ্যেকার জায়গার লোকদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, তারা এত গরীব যে প্রায় কোনো কাপড় না পরেই বের হয়। ষোল শতকের পরিব্রাজক র‍্যালফ্ ফিচ বলছেন যে, শীতকালে লোকেরা তাঁতের কাপড় ও টুপি পরে।

কাপড়ের স্বল্পতা থেকে মুঘল ভারতে দারিদ্রের পরিমাপ করা শক্ত, কারণ এর মধ্যে গরম আবহাওয়া ও পরম্পরার প্রভাব ধরতে হবে। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যে ধরণের দুর্মূল্য আর বহুসংখ্যক জামাকাপড় পরত তা থেকে এই দুই শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান পাওয়া যায়। তাঁতের কাপড় সারা ভারতে উৎপাদন করা হলেও খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় তার দাম বেশি ছিল।

মোরল্যান্ড বলছেন যে, মেয়েরা জামা ছাড়াই শাড়ি পরত তাদের দরিদ্র অবস্থার কারণে। কিন্তু সমকালীন ভদ্রতার মাপকাঠিতে তাঁর এই বক্তব্য সর্বজনগ্রাহ্য নয়। যেমন মালাবারে কোনো শ্রেণীর মেয়েরাই কোমরের ওপরে কোনো কাপড় পরত না। পূর্ব ভারতে জামা পরার প্রচলন কিছুকাল আগে হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় সাধারণ মেয়েরা *চোলী* বা আঙ্গিয়া পরত এটা বলা যায়। আগ্রা-মথুরা এলাকার সমকালীন কবিরা চোলী-আঙ্গিয়ার কথা বলেছেন। পশ্চিম ও মধ্য ভারতের কিছু অংশে শাড়ির বদলে মেয়েরা চোলী বা আঙ্গিয়ার সঙ্গে লাবাঙ্গা পরত।

গরীব লোকেরা জুতো পরত না। মোরল্যান্ড বলছেন যে, বাংলা ছাড়া নর্মদার উত্তরে তিনি জুতোর কোনো উল্লেখ পান নি। তিনি ভেবেছেন, এর কারণ চামড়ার

দাম অনেক বেশি ছিল। সমকালীন কবি তুলসীদাস ও সুরদাস শহরের ও গ্রামের লোকদের *পানাহি* ও *উপানাহার* (দুই ধরণের জুতো) ব্যবহার করার কথা বলেছেন। এমন হয়ত হতে পারে যে, এরা উচ্চশ্রেণীর লোক বা গ্রামের অর্থবান লোক। কিন্তু গরীব ও বিত্তবান মেয়েরা প্রচুর গয়না পরত এর উল্লেখ আছে। ষোল শতকের শেষে জেসুইট পাদ্রীরা, পূর্ব বাংলার ছোটো ছোটো শহরের মেয়েরা হাতির দাঁতের কাজ করা সোনা ও রুপোর গয়না গলায়-হাতে ও পায়ে পরছে এটা বলেছেন। সতের শতকের শেষে ইংরাজ পর্যটক ফ্রায়ার লক্ষ্য করেছেন, পশ্চিম ভারতের মেয়েরা রুপো ও তামার গয়না পরছে।

গরীবদের বাসগৃহের অবশ্য কিছু পরিবর্তন হয় নি। অধিকাংশ কৃষকরাই যে খড়ে ছাওয়া মাটির দেওয়ালের এক ঘরে বাস করত এ-সম্বন্ধে সব পর্যটকই একমত। বাংলায় মাটির ভিতের ওপর দড়ি দিয়ে বাঁশ লাগানো হতো। আসামে গরীব ও বড়লোকেরা খড়, কাঠ ও বাঁশের বাড়ি বানাত। কাশ্মীরেও কাঠের বাড়ির রেওয়াজ ছিল। উত্তর ও মধ্য ভারতে মাটির দেওয়াল ছিল খড় দিয়ে ছাওয়া। গরীবদের বাসায় গরু, ছাগল ইত্যাদিও থাকত। ঘরে সাধারণত কোনো জানালা থাকত না। দরওজা দিয়ে যথেষ্ট আলো-বাতাস আসত। পর্যটক মানরিক অবশ্য বলছেন যে, ঘর খুব পরিষ্কার কারণ গোবর দিয়ে ভালো করে লেপা।

বলা বাহুল্য, কৃষকদের ঘরে কোনো আসবাব ছিল না শুধু খাটিয়া ও মাদুর ছাড়া। ওলন্দাজ পর্যটক লিনসখোটেন পশ্চিম উপকূল সম্পর্কে বলেছেন, লোকেদের আসবাব হচ্ছে মাদুর যার ওপর তারা বসে ও শোয়। ধাতুর পাত্র প্রায় ছিল না বলা চলে, কারণ ধাতুর মূল্য ছিল অনেক। তবে উনুনে লোহার ব্যবহার ছিল কারণ তার ওপর চাপাটি করা হতো। মাটির পাত্র অধিকাংশ জায়গায় রান্না করার জন্য ব্যবহার করা হতো, এটা সহজেই জানা যায়।

সাধারণ লোকের খাদ্য ছিল চাল, ডাল ও জোয়ার। বাংলা, উড়িষ্যা, সিন্ধু ও কাশ্মীরে চালই ছিল প্রধান খাদ্যসামগ্রী। রাজস্থান ও গুজরাটে ছিল জোয়ার ও বাজরা। ইরফান হবিব বলেছেন যে, কৃষকরা তাদের পরিবারের জন্য নিকৃষ্টমানের খাবার রাখত। দিল্লী-আগ্রার মতো গম উৎপাদনকারী অঞ্চলেও সাধারণ লোক গম খেত না বলে মনে হয়। মালব সম্বন্ধে ভ্রমণকারী এডওয়ার্ড টেরি বলছেন যে, সাধারণ লোকেরা গম খেত না। তারা একটা নিকৃষ্ট ধরণের ময়দা চাপাটি করে খেত। অবশ্য এর সঙ্গে কিছু শাকপাতা ও তরকারি ছিল। পর্যটক তাভারনিয়ার বলছেন যে, সব থেকে ছোটো গ্রামেও এই সব বিক্রি হতো। পূর্ব উপকূলে, এমনকি সিন্ধু অঞ্চলেও মাছ বেশ জনপ্রিয় ছিল। যারা নদী থেকে দূরে থাকত বা বেশি ভেতরে থাকত তারা বেশি বা ঘন ঘন মাছ খেত বলে মনে হয় না। পোষা জন্তুর মাংস, মুরগী, গরু বা শুয়োরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। দিল্লী আগ্রা শহরের মধ্যকার অঞ্চলে মাংসের স্বাদ সাধারণ লোকদের জানা ছিল না বলে একজন পর্যটক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সাধারণ লোকেরা খিচুড়ি অর্থাৎ চালের সঙ্গে ডাল মিলিয়ে

মাখন দিয়ে সন্ধ্যায় খেত। সারা দিন তারা হয় ভাজা ছোলা বা অন্য কোনো দানা খেত। একদম নিচুতলার লোকদের খাবার ছিল সেদ্ধ ভাত, নিচানি (ভাজা জোয়ার) এবং ঘাসপাতা বা শিকড়। বিহারে এরকম ছোটো দানা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এরকম খবরও অবশ্য পাওয়া যায়।

একটু বর্ধিষ্ণু গ্রামবাসীরা দিনে একবারের বেশি খেত। সুরদাসের মতে, প্রধান খাবার সময় ছিল মধ্যাহ্নে বা তার কিছু আগে। সূর্যাস্তের পর হাল্কা খাবার খাওয়া হতো। খাবার পর সরভর্তি দুধ (*ছাক*) বা মালাই খেত। উত্তর ভারত, বাংলা ও পশ্চিম ভারতে ঘি সর্বসাধারণের জন্য ছিল। মুকুন্দরাম ও বৈষ্ণব কবিদের রচনায় পাওয়া যায়, দৈ, দুধের সাধারণ মিষ্টি, গুড় ও তেলের খাবার সাধারণ লোক পূজাপার্বন ইত্যাদিতে খেত। সতের শতকের মাঝামাঝি তাভার্নিয়ার বলছেন যে, গ্রামেও চিনি দেওয়া মিষ্টি পাওয়া যায় যদিও গুড়ই প্রধানত ব্যাহার করা হতো।

লবণ ছিল সরকারের একচেটিয়া ব্যবসা। ষোল শতকে লবণ গমের দামের প্রায় দ্বিগুণ ছিল। সুতরাং সাধারণ লোকেরা লবণ কম খেত এটা সহজেই বলা যায়। বিভিন্ন ধরণের মশলা সহজলভ্য ছিল। কিন্তু লবঙ্গ, মরিচ ইত্যাদি সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। ক্যাপসিকাম অজানা ছিল। সময়কালে আম, তরমুজ ইত্যাদি ফল গরীবদের খাবার তালিকায় থাকত। মহুয়া থেকে উৎপন্ন মাদক-জাতীয় পানীয় সাধারণ ব্যাপার বলে পরিচিত ছিল। আরো উত্তেজক পানীয় গাছগাছড়া থেকে তৈরি করা হতো।

এর থেকে আধুনিক যুগের সঙ্গে মুঘল যুগের তুলনামূলক বিচার করা শক্ত। অনেকের মতে, মধ্যযুগের কৃষকরা ঘি সহজে পেত, যেটা বর্তমান যুগে তারা পায় না। কেউ কেউ এটাও বলেন যে, তখন জমি অঢেল থাকায় ও প্রতিজনের গড় জমির পরিমাণ বেশি থাকায়, মধ্যযুগের কৃষকের জীবনযাত্রার মান বর্তমান কালের থেকে উঁচুতে ছিল।

শহরে কি-রকম বা কত গরীব লোক ছিল সেটা বলা সহজ নয়। বাবরের মতে, অসংখ্য কারিগর ভারতে ছিল। শহরে কারিগর ছাড়াও সৈন্য থাকত প্রচুর। এছাড়া ছিল নানা ধরণের দাস, অনুচর, যারা উচ্চশ্রেণীর অভিজাতবর্গের সঙ্গে থাকত। নানা ধরণের পরগাছা শ্রেণীর লোকের মধ্যে ছিল প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষুক, যারা সাধারণত মন্দির বা মসজিদের সামনে থাকত। কোনো কোনো বিদেশী পর্যটক বলছেন যে, এরা অত্যন্ত উদ্ধত এবং ভিক্ষা না দিলে গালাগালি করত।

অভিজাতরা সংখ্যায় প্রচুর দাস ও অনুচর নিয়ে শহরের পথে বেরোতেন। এই অনুচরদের মধ্যে কেউ কেউ ভালো জামাকাপড় পরলেও অধিকাংশই পড়ত ছেঁড়া ও ময়লা জামাকাপড়। শহরের সংকীর্ণ পথে দু-দলের সংঘাতের ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

আবুল ফজল এই কারিগরদের দৈনিক মজুরির হিসাব দিয়েছেন, যার থেকে তাদের জীবন যাত্রার একটা ছবি পাওয়া সম্ভব। একজন সাধারণ শ্রমিক দিনে দুই *দাম* মজুরি পেত। দক্ষ শ্রমিক পেত দিনে তিন থেকে চার দাম। ছুতোররা পেত

দিনে তিন থেকে সাত দাম। পর্যটক পেলসার্ট বলছেন যে, আগ্রা শহরে সাধারণ ভৃত্য ও অনুচররা মাসে তিন থেকে চার টাকা পেত কিন্তু মাস কখনো কখনো চল্লিশ দিনে ধরা হয়। সুরাটে মাসে তিন টাকা ছিল সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে। দাসদের আলাদা মজুরি ছিল না কিন্তু তাদের খাইখরচ নির্বাহ করত তাদের মালিকরাই। মোরল্যাণ্ড ও অশোক দেশাই-এর মত আলোচনা করে অধ্যাপিকা শিরিন মুসভি ১৫৯৫ সালের আগ্রার মূল্য তালিকার সঙ্গে ১৮৮৬-৯১ সালের মূল্য তালিকার একটা তুলনা করেছেন। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে পূর্ণিয়ার নবাবের প্রাসাদের লোকজনদের মজুরির তালিকা পাওয়া যায়। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মজুরি সতের শতকের তুলনায় বেশি বাড়ে নি।

মুস্‌ভির তালিকা থেকে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের শেষভাগে টাকার ক্রয় ক্ষমতা গমের বেলায় কমেছে প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ। চালের বেলায় শতকরা ৬৪ ভাগ, ঘি প্রায় ২০ ভাগ, লবণ প্রায় ৫৭ ভাগ ইত্যাদি। এর থেকে সহজেই অনুমেয় যে, কারিগররা এখনকার তুলনায় মধ্যযুগে গম কিনতে পারত বেশি করে, যদিও আমরা দেখেছি যে, তাদের খাদ্য তালিকার মধ্যে গম ছিল না। দেশাই-এর মতে অবশ্য টাকার ক্রয়ক্ষমতা ১৫৯৬ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে বিশেষ বদলায় নি। এটাও ঠিক যে, আকবরের সময়ে দরিদ্র মজুর এখনকার তুলনায় ঘি, দুধ ও মাংস সস্তায় পেত। আজকালকার মজুর লবণ, শিল্পজাত পণ্য এবং কাপড়ের ব্যবহার বেশি করছে। বলা নিষ্প্রোয়জন যে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে শহরের এই শ্রেণীর লোকরাই সহজেই মারা যেত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

সতের শতকের ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার বলেছিলেন যে, মুঘল ভারতে কোনো মধ্যবর্তী শ্রেণী নেই। আছে উচ্চ শ্রেণী ও দরিদ্র সাধারণ লোক। ওর এই মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ ঐতিহাসিকরাও এই একই মন্তব্য করেছেন। সাম্প্রতিক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধে অধ্যাপক ইকতাদার আলম খান দেখিয়েছেন যে, এই ধারণা কতটা ভ্রান্ত।

এটা মানতে এখন কোনো বাধা নেই যে, মুঘলরা একটি উন্নত কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন। কি পরিমাণ তথ্য (পণ্যের দাম, কর, বাড়ির সংখ্যা, খাজনা যারা দিচ্ছে তাদের জাত, বিভিন্ন পণ্যের ওপর খাজনা ইত্যাদি) মুঘল সরকার রাখতেন সেটি *আইন-ই আকবরী* থেকে সহজেই বোঝা যায়। এগুলি রাখবার জন্য প্রয়োজন ছিল বহুসংখ্যক নিচুস্তরের আমলা (দেওয়ান, মুহুরি, কারকুণ, আমিল, কানুনগো ইত্যাদি।) এছাড়াও মনসবদারদের জায়গীরে এ-ধরণের আমলাদের নিয়োগ করা হতো। বদায়ূনী নিজে প্রথম জীবনে এরকম একজন জায়গীরদারের অধীনে আট বছর কাজ করেছেন।

ইওরোপীয় কোম্পানির বণিকদের লেখা কাগজ থেকে এটা খুব পরিষ্কার যে,

মুঘলরা একটা বাণিজ্যিক ও আর্থিক কাঠামো তৈরি করেছিল যার কথা ইরফান হবিব বলেছেন। সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে শ্রীমতী সুব্রহ্মনিয়ম অষ্টাদশ শতকের পশ্চিম ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এসবের থেকে এটা পরিষ্কার যে, বাণিজ্যিক জগতে কাজের বিভাজন ছিল বেশি। পাইকার, দোকানদার, শরফ, গোমস্তা, দালাল ইত্যাদিরা আলাদা আলাদা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। বাঞ্জারারা বিরাট বড় পণ্যের পসরা নিয়ে স্থানান্তরে যেত। বাজারের মধ্যে কোনো বিশেষ পণ্য পাবার জন্য বা বেশি লাভ করার জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তাভারনিয়ার লিখছেন যে, প্রায় প্রতিটি গ্রামেই টাকা বদলকারী মহাজন ছিল। মুকুন্দরামের গ্রামেও এই ধরণের একজন মহাজনের কথা তিনি লিখেছেন, যাকে তিনি বলেছেন পোদ্দার। আবুল ফজল যে চতুশ্রেণী বিভাজন করছেন, তাতে তিনি বণিক ও বড় কারিগরদের এক শ্রেণীতে রেখে অভিজাতদের স্থান দিয়েছেন নিচের দিকে। শিক্ষাবিদ ও ধর্মবিশারদদের স্থান আবার এদেরও নিচে।

পেশাগত শ্রেণীর মধ্যে বৈদ্য, হাকিম, পণ্ডিত, মোল্লা ও আইনজ্ঞদের ধরা যেতে পারে। ধর্ম-বিশারদ ব্রাহ্মণ ও মোল্লারা নানান আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন এবং নিষ্কর জমি ভোগ করতেন। অধ্যাপক, ইতিহাসবিদরাও এদের গোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সকাল-বিকাল ছাত্র পড়িয়ে ভালো রোজগার করতেন। আবুল ফজল ও বদায়ূনী প্রথম থেকেই মনসবদার হিসাবে জমি ভোগ করেছেন। একটা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, মুঘল রাজস্বের প্রায় এক শতাংশ এই ধরণের লোকের জন্য ব্যয় করা হতো।

ছোটো জমিদার ও বর্ধিষ্ণু কৃষকদেরও এই শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যেতে পারে। শহরাঞ্চলে ও গ্রামীণ সমাজে এদের প্রচুর প্রভাব ছিল। সাধারণ লোকদের থেকে এদের পৃথক করে দেখা হতো– আশরফ বা ভদ্রলোক বলে।

অন্যান্যদের তুলনায় ছোটো আমলাদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়। একজন কারকুণ, অর্থাৎ ছোটো কেরানি, লাহোরে ৭০০ টাকায় একটি বাড়ি কিনেছিলেন। আরেকজন ছোটো আমলা, উদয়চাঁদ, একটা দরগার সঙ্গে কূয়ো খুঁড়বার জন্য তিনহাজার টাকা খরচ করছিলেন। কয়েকজন আমিন এবং জায়গীরদার জমি কিনে ছোটো শহর বসিয়েছিলেন যার মধ্যে সরাই, হাম্মাম ইত্যাদি ছিল এবং যার থেকে ভালো আয় হতো। খাজনা সংক্রান্ত আমলারা ছিল অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ এবং বাণিয়া। অধ্যাপক আলম খান বলেছেন যে, এদের অনেকেই বিত্তবান ছিলেন। বাংলায় অনেক দেওয়ান বক্সী ও কানুনগো স্থানীয় রাজাদের আমলা ছিলেন এবং পরে জমিদার হয়ে যান। তাদের অর্থ তাদের মাহিনার ওপর নির্ভরশীল ছিল না। বরং অধিকাংশ অর্থই এসেছিল নানারকম খাজনা থেকে এবং জমি আত্মসাৎ করে, পরে যা বাংলায় প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষক ও লেখকদের এই ধরণের কোনো উন্নতি হয় নি। বাংলায় মুকুন্দরাম বর্ধিষ্ণু চাষী ছিলেন এবং দেশত্যাগের পর জমিদারের ছেলের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে

দিন চালাতেন। ফলে এই গোষ্ঠী প্রায় সবসময়ই পরনির্ভর ছিল বলা যায়। আবুল ফজল বা বীরবলের উন্নতি ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা যায়। বদায়ূনীর ঐ ধরণের উন্নতি নানা কারণে হয় নি এবং শেষজীবন পর্যন্ত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আকবরের আদেশে হিন্দুদের গ্রন্থ অনুবাদ করতে হয়েছিল, যেটি তিনি করতে চান নি। বৈদ্যদের অবস্থা এদের থেকে ভালো ছিল বলা যায় কারণ মনসবদাররা বা তাদের সৈন্যদের দেখভাল করার জন্য বৈদ্যদের নিয়োগ করতেন। ষোল শতকের প্রথমে বাংলার সুলতান হোসেন শাহর হিন্দু বৈদ্য ছিলেন যিনি পরবর্তী কালে নবদ্বীপে বাড়ি করেছিলেন। মানুচী কিছুদিন বৈদ্যের কাজ করেছিলেন এবং প্রচুর অর্থও পেয়েছিলেন। বড় বড় শহরে এ-ধরণের বৈদ্য বা হাকিম ছিলেন যাদের পশার বিশেষ কম ছিল না যদিও বদায়ূনী এরকম একজন হাকিম *আইন-উল মূলকে*র যোগ্যতা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। মুঘল সম্রাটরা যে বিদেশী বৈদ্য রাখতেন সে-তথ্য পাওয়া যায় এবং আঠের শতকের প্রথম দিকে এই সব বিদেশী বৈদ্যদের সাহায্যে বিদেশী কোম্পানিগুলি নানারকম বাণিজ্যের সুবিধাও পেয়েছিল।

ছোটো মনসবদারদের যে মাহিনা ঠিক করা হয়েছিল তাতে তাদের জীবনযাত্রা সুখকর ছিল। কিন্তু সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। ঘনঘন জায়গীর পরিবর্তন, জায়গীর পাওয়ার জন্য দীর্ঘসময় অপেক্ষা করা ইত্যাদির ফলে তাড়াতাড়ি অসৎ উপায়ে এবং জোর করে টাকা তৈরি করার প্রবণতা বেড়ে যায়। বার্নিয়ার বলছেন যে, আগ্রাতে মনসবদারদের বাড়ি ইঁট ও পাথরে তৈরি এবং ভেতরে আলো-বাতাস আছে। দেওয়ালগুলি অবশ্য চুন ও মাটির। ছাদ সাধারণত খড়ে ঢাকা। পাশে গরীবদের কুঁড়ে-ঘর থাকার ফলে এগুলি সহজেই আগুনে পুড়ে যেত।

বণিকরা সাধারণত থাকত তাদের দোকানঘরের পেছনে বা দোতলা বাড়ি হলে ওপরের তলায়। বার্নিয়ার এ-ধরণের বাড়ির প্রশংসা করেছেন। দিল্লীর অধিকাংশ বাড়ি ছিল ইঁটের, বাগান দেওয়া ছাদ সমেত। বারাণসীর অধিকাংশ বাড়ি ছিল ইঁট ও পাথরের। সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুরাট শহরে বণিকদের বাড়ির বর্ণনা পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়, দোতলা বা তেতলা বাড়ি পর্যন্ত আছে, যার ছাদে বাগান করা। হিন্দু বা জৈন বণিকদের বাড়ির মধ্যে বাগান, ছোটো পুকুর ও মন্দির ছিল। উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চল দিয়ে যেতে আঠের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিব্রাজক মোদাভ ছোটো ছোটো শহরে বণিকদের কাঠের দোতলা বাড়ি লক্ষ্য করেছেন। একতলায় দোকান ও দোতলায় বণিকরা বাস করত। সবই প্রধান পথের দুধারে। বাংলায় নবদ্বীপ ও সপ্তগ্রামে বণিকদের ইঁটের বাড়ি ছিল। অধিকাংশ বাড়িতে সিংহদরজা ছিল ও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সুরাটের বাড়ির জানালায় রঙিন কাচ বা কুমীরের চামড়া দেওয়া হতো রোদ ঠেকানোর জন্য।

জমিদারদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়। অধিকাংশ জমিদার দুর্গের মতো বাড়িতে বাস করত। তাদের নিয়মিত সৈন্য ছিল। যশোহরের

জমিদার প্রতাপাদিত্যের প্রাসাদ বলে বর্ণিত ধ্বংসাবশেষ উনিশ শতকের শেষে ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদরা বের করেছেন বলে দাবি জানান। জমিদাররা টাকা খরচ করত বেশি জমি পাওয়ার জন্য এবং নতুন পত্তনি বসিয়ে জমি চাষযোগ্য করার জন্য। সতের শতকের শেষ দিকে আওরংজেব হুগলির বংশবেড়িয়ার জমিদারকে রাজা উপাধি দেন নতুন পত্তনি করার জন্য। এর ফলে জমিদাররা অনেক সময় টাকা ধার দেবার কারবার করত। ষোল ও সতের শতকের বাংলায় এর নিদর্শন রয়েছে।

গ্রামের বিত্তবান লোকদের জীবনযাত্রায় বিলাসিতার ছবি সমকালীন হিন্দী কবি সুরদাস দিয়েছেন। মথুরার কাছে ব্রিজ পরগণার শিকদার নন্দর বাড়িতে উৎসবে কত রকমের রান্না হয়েছিল তার কথা বলেছেন। তা ছাড়া ঐ বাড়িতে নরম বিছানার চাদর ও নানা রকমের আসবাব ছিল। ঐ শ্রেণীর মেয়েরা নানা রঙের শাড়ি পরত এবং পুরুষরা শহরের লোকদের মতো জামা কাপড় ব্যবহার করত। বলাবাহুল্য স্থানীয়ভাবে ঐ সব পোশাক সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে-সব গ্রামে বড়লোকরা থাকত সেগুলি শহরের বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ষোল ও সতের শতকে বাংলার ছোটো ছোটো শহরেও উৎসবে খাওয়ার প্রচুর বর্ণনা পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়, বহু ধরণের ব্যঞ্জন, তরকারি, ঘি ও দুধের মিষ্টি। এটা অবশ্য নিম্নবর্ণের লোকেদের জন্য নয়, যাদের কথা আঠের শতকের মধ্যভাগে ভারতচন্দ্র লিখেছেন। দেবীর কাছে বর চেয়েছেন একজন, তার ছেলেরা যেন সারাজীবন "দুধে ভাতে" থাকে, তার। উৎসবে বৈষ্ণব বিত্তবানদের বাড়ি সাজানোর কথাও সমকালীন বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন।

উচ্চশ্রেণী

মুঘল যুগে এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে অভিজাতবর্গ, বড় রাজা ও জমিদার এবং শহরের ধনী বণিকেরা। সমকালীন পৃথিবীতে মুঘল অভিজাতরা সব থেকে বেশি মাহিনা পেতেন। মাহিনা ছাড়াও তাদের আরও বিভিন্ন সূত্রে আয় ছিল। যেমন তার সৈন্যদের মাহিনার একটা অংশ তারা পেতেন। কয়েকজন অভিজাত বাণিজ্যে টাকা লগ্নি করে লাভ করতেন যা করবার জন্য আবুল ফজল উপদেশ দিয়েছিলেন। কাফি খান নিজে ঐরকম একজন অভিজাতের প্রতিনিধি হয়ে দেশ বিদেশ ঘুরেছিলেন। সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি বণিক ফ্রাঁসোয়া মাঁর্তা সুরাটে অভিজাতদের বাণিজ্যে টাকা লগ্নি করতে দেখেছেন। গোলকুন্ডার মীরজুমলা বা বিজাপুরের শের খান লোদী এই ধরণের ব্যবসায় প্রচুর টাকা করেছিলেন। সুতরাং এটা বলা হয়ত ভুল হবে যে, মুঘলরা বাণিজ্য ও বণিকদের নিচু চোখে দেখতেন। কিন্তু এসত্ত্বে এটা বলা যায় যে, জমি থেকে আয়ই তাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল।

মোরল্যান্ড বলেছিলেন যে, এই সব অভিজাতদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে টাকা খরচ করা, জমানো নয়। আয়ের বড় অংশ চলে যেত প্রাসাদোপম বাড়ি ঠিক রাখতে। অধিকাংশরই বিরাট হারেম ছিল। মনসারেট বলেছেন যে, দিল্লী শহরের বাড়িগুলি সুন্দরভাবে তৈরি এবং এদের মধ্যে উঠোন, বাগান, গাছপালা, জলের

জায়গা ও বড় বড় ঘর (পাখা সমেত) রয়েছে। বাংলার অভিজাতদের বড় বড় বাড়ি ছিল। কোনো কোনোটা তেতলা এবং সবই ইঁটে গাঁথা। ধনী বণিকদেরও এই ধরণের বাড়ির কথা ছোটো শহর নবদ্বীপ বা শান্তিপুরে পাওয়া যায়। সতের শতকের প্রথমে বাংলার সুবাদার একটা কাঠের বাড়ি করিয়েছিলেন যার দাম পড়েছিল চার হাজার টাকা। দাক্ষিণাত্যে একটা বড় বাড়ির দাম পড়েছিল দেড় লক্ষ টাকা। আসবাবের মধ্যে ছিল খাট— পায়া সমেত, কাঁচের আয়না, চেয়ার ও টুল এবং প্রায় সবই কারুকাজ করা। চেয়ার ও টুল বাংলার উপকূলে মুসলমান বণিকরা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল এটা কোনো কোনো বিদেশী পর্যটক বলেছেন। গুজরাটে ছোটো ছোটো কাজ করা কাঠের বাক্স পাওয়া যেত। মাটিতে পাতার জন্য কার্পেট ও কুশন ছিল, কোনো কোনো জায়গায় ঘরের পুরো মেঝে ঘন মাদুরে ঢাকা থাকত। গরমকালে এর ওপরে ভালো কাপড় পাতা থাকত। কুশন ঢাকা থাকত রেশম বা সোনা-রুপো জরির কাজ বা নক্সা করা দামী কাপড়ে। ব্রোকেড, ভেলভেটের বা সাটিনের কাপড়ও থাকত।

অভিজাতরা খাবার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করতেন। আবুল ফজল, সাধারণভাবে একশটি রান্নার পদ দিয়ে খাওয়া হতো, এটা বলেছেন। মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্থান থেকে ভালো ভালো ফল কেনা হতো। সারা বছর ধরে অভিজাতরা বরফ ব্যবহার করতেন। মধ্য প্রাচ্য থেকে উৎকৃষ্ট মদ কিনে আনা হতো অভিজাতদের জন্য। বিভিন্ন ধরণের ফলের শরবৎ করা হতো। হারেমের মধ্যে মহিলারাও মদ পান করতেন। আরবদেশ থেকে বিশেষত ইয়েমেনী কফি আমদানি করা হতো। তামাক এসে যাবার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে তামাকের প্রচলন বেড়ে যায়। অভিজাত পরিবারের মহিলারাও গড়গড়ায় তামাক খেতেন। দামী চীনামাটির পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হতো। অনেক সময় সে পাত্রগুলি সোনা, রুপো বা দামী জেড পাথরের হতো। বাড়িতে ও রান্নাঘরে বহুসংখ্যক দাস-দাসী ছিল যারা স্বল্প মাইনেতে কাজ করত।

পোশাকের ব্যাপারে অভিজাতরা দরবারের রীতিনীতি অনুসরণ করতেন। সাধারণত তাঁতের কাপড় হলেও, তার মধ্যে নানাধরনের বৈচিত্র্য ছিল। রেশমের পোশাকও তাঁরা পরতেন। উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবর্তীশ্রেণীর পোশাক প্রায় একধরণের ছিল— কেবল দামের তফাৎ। শালওয়ার ও জামা তাঁতের বা রেশমের হতো। শীতকালে জামার ওপর কোট বা কাবা পরত । শাল বা পাটকা কোমর থেকে কাঁধের ওপর থাকত। মেয়েদের জামাও প্রায় একরকমই ছিল যদিও অভিজাত মহিলারা আরও সূক্ষ্ম কাপড় ব্যবহার করতেন। গরমের জন্য সাধারণত মোজা ব্যবহার করা হতো না কিন্তু দামী চামড়ার জুতো সোনা বা রুপোর জরি করা চলত। তাঁতের পুরো জামা ও শালওয়ারের দাম ছিল আকবরের মৃত্যুর সময় একশ পঞ্চাশ টাকা। উলের ঐ পোশাক পাওয়া যেত আড়াই-শ টাকায়। রেশমের দাম ছিল তিন-শ টাকার মতন। ভেলভেট বা ব্রোকেডের দাম ছিল সাড়ে সাত-শ থেকে পনের-শ টাকার মধ্যে।

পুরুষ ও মহিলারা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গয়না পরতেন যার মধ্যে দামী পাথর

বসানো থাকত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকে ছেলেরা কানফুটো করে দুল পরত।

আস্তাবলের পেছনে অভিজাতরা প্রচুর খরচ করত। প্রতিটি অভিজাতকেই হাতি, খচ্চর, উঠ ও গাড়ি রাখতে হতো। এগুলির জন্য সরকার থেকে আইন করে দিয়েছিল। তাঁবুর খরচ ছিল বেশ বেশি– রেশম বা ব্রোকেডের তাঁবুও হতো। এছাড়া নিজের ঘোড়া, দামী পালকি ইত্যাদির জন্য নানা ধরণের লোক রাখতে হতো। যেহেতু হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি রাখার সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল, সুতরাং অভিজাতরা প্রচুর খরচ করত। একটি হাতির দাম ছিল এক-শ টাকা থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত। ঘোড়ার দাম বেশি ছিল, কারণ ভালো ঘোড়া আসত প্রধানত মধ্য প্রাচ্য থেকে। দাম ছিল দু-শ টাকা থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকের পর্যটক ফ্রায়ার বলছেন যে, সুরাটের অভিজাতরা ঘোড়ার জিন ও রেকাবীতে সোনা ব্যবহার করত। এটি ছিল দরবারী অনুকরণ। ফরাসি বণিক ফ্রাঁসোয়া মাঁর্তা বলছেন যে, বিজাপুর যুদ্ধের সময় আওরংজেব তাঁর হাতি ও ঘোড়ার সোনা ও রূপার সরঞ্জাম গলিয়ে মুদ্রা তৈরি করে সৈন্যদের মাহিনা দিয়েছিলেন। আসলে অভিজাতদের খরচের কোনো সীমারেখা ছিল না।

এই ধরণের খরচের ফলে, বার্নিয়ার বলছেন যে, অধিকাংশ অভিজাতই ঋণের দায়ে ডুবেছিলেন। কিন্তু সমকালীন ইতিহাসে এরকম তথ্য পাওয়া যায় যে, বেশ কিছু অভিজাত বহু ধনদৌলত রেখে গিয়েছেন। ফরাসি বণিক ফ্রাসোঁয়া মাঁর্তা ১৬৮১ সালে মীরজুমলার ছেলে মহম্মদ আমিন খান মারা যাওয়ার পর যে বিশাল ধনরত্ন পাওয়া গিয়েছিল তার একটি তালিকা দিয়েছেন। প্রচলিত আইন অনুযায়ী সরকারি আমলারা রাষ্ট্রের কাছে কত টাকা দেয় সেটা বের করার জন্য এই ধরণের তালিকা তৈরি করেছিলেন। ১৬৭০ সালে ফৌজদার আবহুন নবীর মৃত্যু হলে তাঁর সম্পত্তি তালিকা করার পর বাজেয়াপ্ত হয়। তাতে দেখা যায় যে, তিনি বিশাল ধনদৌলত রেখে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আওরংজেব এই নিয়মের কিছু পরিবর্তন করলেও সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত ছিল তাঁরই হাতে।

উপকূলবর্তী শহরগুলিতে বহু ধনী বণিক ছিল। এদের জীবনযাত্রার মান অভিজাতদের সমান ছিল। বাংলা ও গুজরাটের কিছু বণিকের বিশাল ধন দৌলত ছিল। আশি লক্ষ টাকা সম্পত্তির ওপরে আছে এরকম অনেক বণিক ছিল। এরা সবসময়ে রাজকোষের ভয়ে থাকতেন। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এ-রকম কথা বার্নিয়ার বলেছেন। এর সবটা যে সত্যি নয় সেটা আমরা সুরাটে ১৬৮৪-৮৫ সালের ধনী বণিকদের জীবনযাত্রার মান দেখলে বুঝতে পারি। পর্যটক ফ্রায়ার সুরাটে মুসলমান বণিকদের সুন্দর বাড়ি, বাগান দেওয়া ছাদ ইত্যাদির কথা বলছেন। সতের শতকের শেষ দুই দশকে বোরা ভাইদের কথায় যে সুরাটের শাসনকর্তা চলতেন, সেটা ফরাসি কোম্পানির কাগজ থেকে পাওয়া যায়। এদের দশটা জাহাজ দশ বছরে সাগরে লুট হলেও বাণিজ্যে ভাঁটা পড়ে নি। বাংলায় বণিকদের বিভিন্ন ধরণের বাড়ি ছিল তার বর্ণনা বাংলার সমকালীন বৈষ্ণব কবিদের লেখা থেকে পাওয়া যায়। সপ্তগ্রাম বা

নবদ্বীপের বণিকদের বিশাল বড় বড় পাঁচিল দেওয়া ইঁটের বাড়ি ছিল যার বড় বড় দরজাও ছিল। এরা বিভিন্ন উৎসবে প্রচুর টাকা খরচ করতেন। সপ্তগ্রামের এক বণিকের বাবার শ্রাদ্ধে বিভিন্ন দেশ ও গ্রাম থেকে বণিকরা এসেছিল ও প্রচুর খাওয়া দাওয়া হয়েছিল— একথা ষোল শতকের শেষে বাঙালি কবি মুকুন্দরাম বলেছেন।

উচ্চবর্ণ ও উচ্চ অভিজাতদের বাণিজ্য এবং জীবনযাত্রা মুঘল যুগে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। যুবরাজ দারাশুকোর বিবাহে খরচ হয়েছিল ১২ লক্ষ টাকা। আওরংজেবের ব্যক্তিগত কঠোর জীবনযাত্রার প্রভাব অভিজাতদের ওপর পড়ে নি, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আঠের শতকে মুঘল সাম্রাজ্য ছোটো হয়ে গেলেও এদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় ভাটা পড়ে নি। কিন্তু এই ধরণের জীবনযাত্রা সমকালীন অর্থনীতির ওপর ছাপ ফেলে যায়। ক্রমাগত চাহিদার ফলে উৎপাদন বিলাসবহুল পণ্যের উৎপাদনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গুজরাট ও বাংলায় সূক্ষ্ম কাপড় ও অন্যান্য প্রদেশে বিলাসদ্রব্য তৈরি হতে থাকে। সারা সাম্রাজ্য জুড়ে কাপড়ের বাজার চলতে থাকে। মোরল্যাণ্ডের অভিযোগ, অভিজাতদের খেলনার চাহিদা বা বিদেশী জিনিসের চাহিদা দেশের উৎপাদনকে ক্ষুণ্ণ করেছিল— একথা মেনে নেওয়া যায় না। খেলনার চাহিদা কোনো বিশেষ জিনিসের চাহিদা নয়। এছাড়া মধ্য প্রাচ্যের দামী কাপড় বা মদ খুব অল্প পরিমাণেই আসত। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, দেশের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হতো। যার বদলে বিদেশ থেকে আসত সোনা, রূপা বা তামা।

বিভিন্ন শিল্পকলায় মুঘল অভিজাতদের এই উদ্যোগ মুঘল ভারতের শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পে মুঘল শিল্পকলার অবদান সমকালীন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল অধ্যায়। দেশী ও বিদেশী শৈলীর মিশ্রণ ঘটিয়ে অনবদ্য চিত্রশিল্প রেখে গিয়েছেন মুঘল চিত্রকররা যাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই পাওয়া যায়। অভিজাত ও উচ্চবর্ণের লোকদের জীবনযাত্রার মধ্যে এই মিশ্র সংস্কৃতির চেহারা বেশি মাত্রায় লক্ষণীয়।

১০

জায়গীর ব্যবস্থার সংকট

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আলোচনা বহু দিন ধরে চলে আসছে। যদুনাথ সরকার ও উইলিয়াম আরভিনের মতো ঐতিহাসিকদের মত ছিল, আওরংজেবের গোঁড়া মুসলমান নীতির প্রচলন ও অ-মুসলমানদের প্রতি অনুদারতার ফলে বিভিন্ন অ-মুসলমান রাজ্যগুলি মুঘল সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে যায়, যার ফলে পতন হয়। এস.আর. শর্মা এই মতের সমর্থক ছিলেন এবং এই অনুদার ধর্মনীতি নেওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে বলে মনে করতেন। এম. আয়ার আলি অবশ্য সাম্প্রতিক কালে অভিজাতদের সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে এটা ভুল প্রমাণ করেছেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে, ১৬৭০ সালের পর থেকে আওরংজেব গোঁড়া ধর্মনীতি ও রাজনীতি সমার্থক করে দেখেছিলেন প্রধানত রাজনৈতিক তাগিদে। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষদিকের কিছু ইংরাজ ঐতিহাসিক বিশ্বাস করতেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূলে রয়েছে পরবর্তী সম্রাট ও আভিজাতবর্গের চারিত্রিক দুর্বলতা। এছাড়াও আওরংজেবের দাক্ষিণাত্য জয়ের প্রচেষ্টার ফলে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে যার ফলে পতন হয়। ১৯৭০-এর দশক থেকে আথার আলি ও কিছু অন্যান্য ঐতিহাসিক মুঘল ও আরো কয়েকটি সমকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের যেমন পারস্য তুর্কি ইত্যাদি পতনের কোনো বড় ধরণের কারণ আছে কিনা, এনিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেন। এরা বলেন যে, মুঘল অভিজাতদের ও অন্যান্যদের মধ্যে নতুন কলাকৌশল গ্রহণ করার অনীহা দেখতে পাওয়া যায় যেখানে ইওরোপীয়রা নতুন কলাকৌশল গ্রহণ করছিল।

ইরফান হবিব সতীশ চন্দ্র ও নুরুল হাসান এই ধরণের মতবাদ থেকে একটু দূরে সরে এসে মুঘল সাম্রাজ্যের ভেতরের অবস্থার দিকে নজর দিয়েছেন। এদের মধ্যে আবার হবিব বলেছেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে শ্রেণী সংঘাত। ওপরের শ্রেণীর ক্রমাগত পাপের ফলে নিচু শ্রেণী এমন এক অবস্থায় পৌঁছাচ্ছে যেখান থেকে তারা বিদ্রোহ করতে বাধ্য। এই অবস্থার ফলে কৃষির কাঠামো ভেঙে পড়ছে যার ফলে একদিকে কৃষি উৎপাদনের শিথিলতা লক্ষ্য করি ও অন্যদিকে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা দেখতে পাই।

সতীশ চন্দ্র, নুরুল হাসান ও পরবর্তীকালে আথার আলি জোর দেন প্রধানত মনসবদারী জায়গীরদারী সংকটের ওপর। এর ফলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ইতিহাস থেকে সরে এসে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থাগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই মনসবদারী জায়গীর সংকট শুধুমাত্র সতের শতকের শেষে এসেছিল এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা দেখেছি, মনসবদারদের প্রধানত মাহিনা দেওয়া হতো সমমূল্যের জায়গীর দিয়ে। তার মধ্যে কয়েকটি সমস্যা ছিল। যদি মরসুমের মাঝখানে মনসবদারদার বদলি হতেন, তাহলে তার সমস্যা হতো। এছাড়া ঠিকমতো খাজনা সংগ্রহ করতে না পারলেও মনসবদারের অসুবিধা হতো এবং মনসবদারদের যত অশ্বারোহী সৈন্য রাখার কথা প্রায়শই তার থেকে কম থাকত।

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের একটি অধিবেশনে (পাতিয়ালা, ১৯৬৭), ইরফান হবিব সতের শতকের গোড়ায় এই ধরণের সংকটের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন যে, ১৬১৮ থেকে ১৬৩০ সালের মধ্যে *জাট* পদের মাহিনা প্রচুর কমে যায়, যদিও শাহাজাহানের সময়ে এটা হয়েছিল কিনা বলা যায় না। জাহাঙ্গীরের প্রথমদিকেই সওয়ার পদের মাহিনা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায় যদিও শুরু হয়েছিল আকবরের সময়ে। ১৬১৫-১৬ সাল নাগাদ এটাও কমে যায়। শাহজাহানের সময়ে তা আরো কমে যায়। হবিব মনে করছেন যে, এর সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য রাখাও কমিয়ে দেওয়া হয় এবং এটা শুরু হয় জাহাঙ্গীরের আমলের প্রথমদিকে। এরই সঙ্গে সঙ্গে ১৫৯৫-৯৬ সালের এক হাজার জাট পদের সংখ্যা ১৬০৫-১৬২১ সালের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। পরবর্তী ১৭ বছরে এটা বাড়ে এক-তৃতীয়াংশ। জাহাঙ্গীরের নিজের লেখা থেকেই জানা যায়, তিনি দরাজ হাতে মনসবদার তৈরি করেছেন। এর ফলে আর্থিক চাপ বেড়ে যায়, যার ফলে মাহিনা কমানো হয়।

অন্যদিকে কাগজে কলমে সাম্রাজ্যের জমাজমি বাড়িয়ে এই বাড়তি আর্থিক চাপ মেটানো সম্ভব। এর সঙ্গে সৈন্য রাখার সংখ্যা কমিয়ে দিলে এই চেষ্টা সহজ হয়ে আসে। দাক্ষিণাত্য বাদ দিয়ে ১৫৯৫-৯৬ সালের জমা ১০০ ধরলে, ১৬০৪ সালে দেখা যায় ১১০, ১৬২৭ এর আগে ১১৯, ১৬৩৬ সাল নাগাদ ১২৩। ১৬৪৭ সালে ১৪২। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাড়তি আর্থিক চাপের এক-পঞ্চমাংশ ১৬২৭ সাল নাগাদ মেটানো যাচ্ছে এবং এক-চতুর্থাংশ ১৬৪৭ সাল নাগাদ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই বাড়তি জমা-র কতটা সংগৃহীত হয়েছিল, সেটা বোঝা শক্ত এবং এর ফলে অনুমোদিত মাহিনা ও আসল মাহিনার মধ্যে একটা ফারাক থেকে যায়। এর মধ্যে এই সময়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল কিনা তাও একটা বড় প্রশ্ন হিসেবে থেকে যায়। ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড বলছেন যে, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে রুপোর বৃদ্ধি হয় নি। হবিব দেখাচ্ছেন যে, এটা ভুল ধারণা। অন্তত জাহাঙ্গীরের জমাজমির হার মূল্যবৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিল। তিনি অনুমান করছেন যে, ১৬৪৭-৪৮ সাল নাগাদ জমার হার মূল্যবৃদ্ধির হারের থেকে বেশি ছিল। জায়গীরদের আসল আয় শাহজাহানের সময়ের প্রথমদিকে কমতে থাকে যখন তাদের সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে ১২ মাসের পরিবর্তে মাত্র কয়েক মাস করে মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়।

এরমধ্যে যারা নিচু পদে ছিল, তাদের উন্নতি হয়েছে, যার ফলে মনসবদারদের

মাহিনা আগেকার থেকে বেশি হয়েছে। সওয়ার পদের মাহিনা কম হলেও, দুটি পদ মিলিয়ে মনসবদার ঐ সংকটের মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু এই সমাধান স্থায়ী হয় নি। আওরংজেব ব্যয় সংকোচ করে ও কৃষিকার্য সম্প্রসারণ করে প্রথমে এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছিলেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখলের পরে সমকালীন ইংরাজ ও ফরাসি বণিকরা ওখানকার কৃষিকার্য ধ্বংস হয়ে যাবার কথা বলেছেন। এই অবস্থায় দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের ফলে বহুসংখ্যক দক্ষিণী সামরিক নেতাকে মনসবদার করতে হয়। এর ফলে মনসবদারের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় যাদেরকে কোনো জায়গীর দেওয়া যাচ্ছে না। ঐতিহাসিক আথার আলি উল্লেখ করেছেন যে, আওরংজেবের সচিব বারবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে ও সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে থাকার ফলে উত্তর ভারতের শাসনব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে। জায়গীর থেকে যতটা খাজনা সংগ্রহ করার কথা মনসবদাররা ততটা করতে পারছিলেন না। আগ্রার আশেপাশে ক্রমাগত বিদ্রোহ রাজপুতানার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দুর্দশা এবং দক্ষিণ ভারত, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে কৃষির অবনতির ফলে সংকট ক্রমশ তীব্র হয়ে আসে। এর ফলে জায়গীরহীন মনসবদার সৃষ্টি হতে থাকে ফলে এই সমস্যার সমাধান হয় নি কারণ দাক্ষিণাত্য ছিল ঘাটতি এলাকা।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের জমা বাড়ে ২৩ শতাংশ। আওরংজেব এই দু-রাজ্যের উৎকৃষ্ট ও উর্বর জমিগুলিকে খালসা জমিতে পরিণত করলেন। এছাড়া কিছু জমির খাজনা দাক্ষিণাত্যের মনসবদারদের জায়গীর দেওয়া হলো। বাকি যে জমি রইল সেগুলি অনুর্বর। জে. এফ. রিচার্ডস প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, জায়গীর সমস্যা কৃত্রিম ও আওরংজেবের সৃষ্টি। সাম্প্রতিককালে শিরিন মুস্‌ভি এই মত খণ্ডন করেছেন। জায়গীর সমস্যা বা এর সংকট কোনো ব্যক্তিবিশেষের নীতির জন্য হয় নি বরং বহুদিন ধরেই ছিল, শুধু বিশেষ কারণে এই সংকট আঠার শতকের প্রথমদিকে তীব্র হয় আসে। সতীশ চন্দ্রের মতে, এই সংকটের মূল আরো গভীরে। সাম্রাজ্যের সম্পদ যা আছে তা মুঘল অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নতুন কারিগরি বিদ্যা ও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করে নতুন সম্পদ তৈরি করার মতো মানসিকতা মুঘল অভিজাত বা সম্রাটদের ছিল না। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদল না করে শুধু কৃষি সম্প্রসারণ করে এ-সমস্যার সমাধান হয় না। ফরাসি পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু যে-কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় হবে বলেছিলেন, সে কারণে হয় নি।

সম্রাট বাহাদুর শাহর মৃত্যুর (১৭১২) পর মুঘল সাম্রাজ্যের সঞ্চিত সম্পদ প্রায় শেষ হয়ে গেল। ছোটো মনসবদারদের পক্ষে ঘন ঘন পরিবর্তনের মধ্যে ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জায়গীরের আয় থেকে সৈন্যসংখ্যা বজায় রেখে চলা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। জায়গীর সম্পর্কে বাহাদুর শাহ-র উদারনীতির ফলে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল। সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ-র আমলে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক আরো

ছিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে খালিসা জমি জায়গীরে রূপান্তরিত করে ক্রমবর্ধমান মনসবদারদের খুশি করার চেষ্টা চলতে লাগল। নিজাম-উল মুল্‌ক মুখ্য ওয়াজির হয়ে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চেষ্টা করলে, অভিজাতদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়। এর ফলে তিনি চলে যেতে বাধ্য হন। মনসবদাররা তাদের সৈন্যদের দিকে মন দিত না। বর্তমানের ঐতিহাসিক জাহিরুদ্দিন মালিক দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যের অল্প কয়েকজন ছাড়া বাকিরা প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে সৈন্য রাখার প্রতি উদাসীন ছিলেন। এই অবস্থায় ভালো জায়গীরগুলি যেত প্রভাবশালী গোষ্ঠীদের হাতে যার জন্য রেষারেষি বেড়েই চলতে লাগল। দক্ষিণী মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাজপুত ও খানজাদা মনসবদারদের সংখ্যা কমে যেতে লাগল।

এই সময়কার অভিজাতদের দলাদলিকে কেউ কেউ বলেন যে, জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সতীশ চন্দ্র দেখাচ্ছেন যে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক ও স্বার্থবোধের ভিত্তিতে এই দলগুলি গড়ে ওঠে। যদিও কোনো কোনো সময় ধর্ম ও জাতির ধূয়ো তোলা হয়েছিল।

সম্রাট মহম্মদ শাহর রাজত্বের প্রথমদিকে সমকালীন ঐতিহাসিক কাফি খান চাষীদের ওপর অত্যাচারের কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়মাবলী শিথিল হয়ে যাবার ফলে ফৌজদার, জমিদার ও জায়গীরদের খাজনা তোলবার ক্ষমতা ও প্রবণতা বেড়ে যায়। জুলুম করে চাষীদের সবস্ব কেড়ে নেওয়ার ফলে চাষীরা গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু করে। বহু বর্ধিষ্ণু পরগণা জঙ্গলে পরিণত হয়। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক ফরাসি পর্যটক চাষীদের দুরবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন যে, তাদের উৎপাদনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কেড়ে নেওয়া হতো। সুতরাং একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় শাসনের দ্বন্দ্ব ও সংকট তীব্র হয়ে আসে, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের বুনিয়াদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জায়গীরদারী সংকট ও কৃষি সংকট দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিককালে একটা অপ্রকাশিত প্রবন্ধে শিরিন মুস্‌ভি দেখাচ্ছেন যে, চাষীদের প্রবল শোষণ করা হয়েছিল বলে হবিব যে মত দিয়েছেন (আথার আলি এ-মতের সঙ্গে একমত নন) তার সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, কারণ মুস্‌ভি সংখ্যাতত্ত্বর বিচার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন।

পরিশিষ্ট

১৯৮৩ সালে প্রকাশিত ও আরো দু-একটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে আমরা এখানে প্রাক-ধনতন্ত্রীয় রাজ্যর আলোচনা করতে পারি। ১৮৫৩ সালের পর থেকে মার্কস মনে করতে থাকেন— প্রধানত এঙ্গেলসের একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন অনুযায়ী— প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ভারতে বা এশিয়ায়, উৎপাদনের ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখছে রাষ্ট্র যার পিছনে আছে অর্থনৈতিক কারণ। এটি হলে যে কৃত্রিম জলসেচ পদ্ধতি, যেটা এত বিশাল আকারে ভারতের পক্ষে প্রয়োজন যে সেটি কার্যকর করতে গেলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণবিহীন শক্তির প্রয়োজন। যদিও এর যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু এর ওপর ভিত্তি করে নানারকম লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

মার্কসীয় চিন্তায় উৎপাদন প্রথার মধ্যে দুটি দিক রয়েছে— গ্রামীণ সম্প্রদায় ও প্রাচ্যের নিয়মবিহীন ক্ষমতা। এর মধ্যে ক্ষমতার প্রয়োজন এই কারণে যে, উদ্বৃত্ত উৎপাদন রাষ্ট্রের মাধ্যমে বিতরণ করা দরকার। গ্রামাঞ্চলে প্রাকৃতিক অর্থনীতি প্রচলিত থাকলেও দরকার বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন করা বিশেষত উদ্বৃত্তের অংশ নিয়ে। সুতরাং হবিব মনে করছেন যে, প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় সমাজে শ্রেণীগত পার্থক্য ছিল ও তিনি হবসবম-এর শ্রেণীহীন সমাজের বা আদি সমাজের মত মানেন না। এঙ্গেলস ঐ একই কথা ১৮৭৮ সালে লিখেছেন : শ্রেণীগুলি গঠনের সময় প্রাচ্যের নিয়মবিহীন রাজা ছিল। ১৮৬৭ সালের পর মার্কস নিজে এই এশিয়াটিক প্রথা (এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশন) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেন।

এঙ্গেলস মনে করতেন যে, উদ্বৃত্ত উৎপাদন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাস প্রথার আগমন হয়। সুতরাং এশিয়াটিক প্রথা দাস প্রথার আগে আসতে পারে না— শুধু বলা যেতে পারে যে, দাসভিত্তিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পাশাপাশি গড়ে উঠছে। সম্প্রদায়ভিত্তিক চাষের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছে ব্যক্তিনির্ভর ছোটো ছোটো উৎপাদন। যেগুলি প্রধান উৎপাদন প্রথা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। এর ফলে বলা যায় যে, এশিয়াটিক প্রথা একই জায়গায় অপরিবর্তিতভাবে দাঁড়িয়ে নেই।

মার্কস নিজেও এই ধরণের পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছিলেন। কোভালেস্কির বইয়ের সম্পর্কে টীকা তৈরি করতে গিয়ে, ভারতীয় গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে উঠছিল যার ফলে সমাজে একটা দ্বন্দ্ব আসছে, একথা তিনি লিখেছিলেন। এই টীকাতেই মার্কস লেখেন যে, ভারতীয় সম্প্রদায় ও সমাজ জার্মান-রোমান ফিউডালিজমের থেকে ভিন্নতর। মার্কসীয় চিন্তায় এই তফাতের কারণ হচ্ছে যে, ভারতে *সার্ফ* প্রথা নেই এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের বাইরে কেউ জমি পাবে না।

১৮৫৩ সালে মার্কস প্রশ্ন করছিলেন, ইসলামীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে রাজা কোনো সময় সম্পত্তির দাবি করতে পারেন কি-না। কোভালেস্কির সমালোচনার ফলে অবশ্য এ-তত্ত্বটি তিনি বাদ দেন।

এটা এখন প্রমাণিত যে, মার্কস পরবর্তীকালে প্রাক-উপনিবেশ ভারত সম্পর্কে তাঁর মতামত বদলেছিলেন। এশিয়াটিক সমাজ অচল ও অনড় এই ধারণা ক্রমশ বদলে যাচ্ছিল। এর ফলে অবশ্য এশিয়াটিক উৎপাদন প্রথার ধারণাও আর রাখা যায় না। পরবর্তী কালে মার্কস ভারতীয় সমাজকে ফিউডাল বলতে আপত্তি করেছেন। বরং ওঁর মত হলো যে, এই ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতির দুটি স্তম্ভ ছিল– একটি হস্তশিল্প ও কৃষির পারস্পরিক নৈকট্য ও অন্যটি শ্রমের চিরাচরিত বিভাজন। মার্কসীয় চিন্তাধারায় শহরের অর্থনীতিই অতিমাত্রায় পরগাছার মতো– গ্রাম থেকে ক্রমাগত শহরে সম্পদ যাচ্ছে। হবিবের মতে, এ প্রশ্নটির মধ্যে নিহিত আছে প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতে ধনতন্ত্র বিকাশের ব্যর্থতা। হবিব অন্য একটি প্রবন্ধে দেখাচ্ছেন যে, কেন বণিকের ধন-দৌলত প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে ধনতন্ত্রে পর্যবসিত হচ্ছে না। মুঘল ভারতে ধন রয়েছে কেবল মাত্র বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যার কোনো নিজস্ব ভিত্তি নেই। এই ধন মুঘল শাসক শ্রেণীর ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত ছিল। মুঘল শাসক শ্রেণীর অবক্ষয়ের সঙ্গে অভিজাতবর্গ যে বিশাল বাজারের চাহিদা সামনে রেখেছিল, সেটা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বণিকের ধন বৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে ধনতন্ত্রের বিকাশের কিছু কিছু চিহ্ন, যা সতের শতকে দেখা গিয়েছিল তা পিছনে চলে যায়।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

অপ্রকাশিত

আরকাইভস্ নাসিতনাল, প্যারিস, ফ্রান্স
কলোনি সি দুই ৬৪-৭০।
বারহামপুর কালেকটরেট মহাফেজখানা, বারহামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
মহারাষ্ট্র রেকর্ড অফিস, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, ভারত।
জাতীয় মহাফেজখানা, নতুন দিল্লী।

প্রকাশিত

সমকালীন বৃত্তান্ত

কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, *শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত,* কলকাতা, নবম সংস্করণ, ১৩৮৬
কুলীখান, দরগা, *Unrarka e Delhi,* (শেখর ও শেনয় অনূদিত), দিল্লী, ১৯৮৯।
খান, সাকি মুস্তাদ, *মাসিরী আলমাগিরি,* এশিয়াটিক সোসাইটি, (যদুনাথ সরকার অনূদিত), ১৯৪৭।
খান এনায়েত, *শাহজাহাননামা* (সম্পাদনা : বেগলে এবং দেশাই) দিল্লী ১৯৯০
খান, আলি মুহম্মদ, *Mirat-i-Ahmadi,* (সম্পাদনা লোখউওয়ালা) বরোদা।
চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডী,* এলাহাবাদ। ১৯২১
চূড়ামণিদাস, *গৌরাঙ্গ বিজয়,* এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৫৭।
জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল* এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১।
ডেলন, *A Voyage to the East Indies,* লণ্ডন, ১৮৯৮।
তাভারানিয়ার, জে.বি, *Travels in India,* নতুন দিল্লী, ১৯৭৭, খণ্ড ১ ও ২ (পুনরমুদ্রণ)।
দ্যালচ, জাঁ, (সম্পাদিত), *Voyage en Inde du Comte de Modave. 1773-1776,* প্যারিস, ১৯৭১।
নিজামুদ্দিন, খাজা, *তবকাত-ই আকবরী,* (এ.এফ.রহমান অনূদিত) ঢাকা, ১৯৭৮।
পেনজার, এন.এম, (সম্পাদিত), *Travell of Niccolai de Conti,* লণ্ডন, ১৯৩৭।
ফস্টার, উইলিয়ম, (সম্পাদিত) *The Embassy of Sir Thomas Roe in India 1115-19,* নতুন দিল্লী, পুনরমুদ্রণ ১৯২৬।

ফস্টার, উইলিয়ম (সম্পাদিত), *Early Travels in India, 1583-1619,* নতুন দিল্লী, পুনরমুদ্রণ ১৯৮৫।
ফসেট, চার্লস, (সম্পাদিত), *The Travels of Ahbé Camé,* নতুন দিল্লী, ১৯৯০ পুনরমুদ্রণ, খণ্ড ১, ২।
ফজল, আবুল, *Aīn-ī-Akbari,* (যদুনাথ সরকার এবং জ্যারেট সম্পাদিত), খণ্ড ১-৩, নতুন দিল্লী, ১৯৭৯
ফ্রায়ার, জন, *East India and Persia,* লণ্ডন, খণ্ড ১,২, ১৯৯২।
বদায়ূনি, আল, *Muntakhabul-Tawarikh,* (জি.এস র‍্যাঙ্কিং সম্পাদিত) পাটনা, পুনরমুদ্রণ ১৯৭৩।
বার্নিয়ার, ফ্রাঁসোয়া, *Travel in the Mughal Empire,* (কনেস্টবল সম্পাদিত) নতুন দিল্লী, পুনরমুদ্রণ ১৯৭২। (প্রথম প্রকাশ : ১৮৯১)।
কর্ণেল, এ.সি., (সম্পাদিত), *The Voyager of John Huyghen Linscholen to the East India.* নতুন দিল্লী, ১৯৮৮, খণ্ড ১ ও ২, (পুনরমুদ্রণ)
বিপ্রদাস, *মনসাবিজয়,* (সুকুমার সেন সম্পাদিত) এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা তারিখহীন।
বেগম গুলবদন, *হুমায়ুননামা* (এ.এস. বেভারিজ সম্পাদিত) নতুন দিল্লী, ১৯৮৩ (প্রথম প্রকাশ ১৯০২)।
বেভারিজ, হেনরি, (সম্পাদিত), *তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী,* নতুন দিল্লী, ১৯৭৮ (প্রথম প্রকাশ ১৯০৯-১৪)।
বেভারিজ, এ.এস., (সম্পাদিত), *বাবরনামা,* নতুন দিল্লী, খণ্ড ১ ও ২, ১৯৭৯ (প্রথম প্রকাশ ১৯২২)।
বোরা, এম.আই., (সম্পাদিত), *Baharistan-ī Ghayelri,* খণ্ড ১ ও ২, গুয়াহাটি, ১৯৩৬।
বৃন্দাবনদাস, *শ্রীচৈতন্যভাগবত,* গৌড়ীয় মঠ, চতুর্থ সংস্করণ।
—*ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী,* বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, তারিখহীন।
মানুছী, নিকোলাই, *Storia de Mogor,* (উইলিয়ম আরভিন সম্পাদিত) নতুন দিল্লী, খণ্ড ১,২ ও ৩, পুনরমুদ্রণ ১৯৮১ (প্রথম প্রকাশ ১৯০৭)।
মার্টিনো, আলফ্রেড, (সম্পাদিত), *Mémories de Francdis Martin,* প্যারিস, ১৯৩১-৩৪, খণ্ড ১,২ ও ৩।
মোরল্যাণ্ড এবং গেইল (সম্পাদিত), *Johangir's India.* নতুন দিল্লী, (পুনরমুদ্রণ ১৯২৫)।
রেনফোর্ট সুসন দা, *Historie des Indes Orientales.* লাইডেন, ১৬৮৮।
শেরওয়ানী, আব্বাস খান, *Tasikh-i Shew Sahi,* (বি.পি. অম্বষ্ঠ অনূদিত), পাটনা, ১৯৭৪।
সেন, সুরেন্দ্রনাথ, (সম্পাদিত) *Indian Travels of Thenenot and Caseri.*

নতুন দিল্লী, পুনরমুদ্রণ ১৯৪৯।
হয়ল্যাণ্ড ও বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদিত) *The Commentary of Father Monserrate*, নতুন দিল্লী, ১৯৯২ (পুনরমুদ্রণ)।

অন্যান্য গ্রন্থ

অরসরত্নম, এস, *Maritime India in the Sevententh Century*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪।
আলম, মুজঃফফর, *The Crisis of Empire*. অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৮৬।
আলি, এম. আথার *Mughal Nobility under Aurangzeb*, বোম্বাই, ১৯৬৬।
ওমপ্রকাশ, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal, 1630-1720*, প্রিন্সটন, ১৯৮৫।
গিলন, কে.আর, *Ahmedabad*, কালিফোর্নিয়া, ১৯৬৮।
গোপাল, সুরেন্দ্র, *Commerce and Crafts in Gujarat*, নতুন দিল্লী, ১৯৭৯।
চন্দ্র, সতীশ, Mediaval India, ম্যাকমিলান, ১৯৮২।
চিকারভ, এ.আই, *Indian Economic Development in the 16th-18th Centuries*, মস্কো, ১৯৭১।
চৌধুরী, সুনীল, *Trade and Commercial Organisation in Bengal, 1650-1720*, কলকাতা, ১৯৭১।
দাশগুপ্ত, অশীন, *Indian Merchant and the Duline of Surat. c. 1700-1750*, ওয়েজব্যাডেন, ১৯৭৯।
দাশগুপ্ত, অশীন এবং পিয়ার্সন, মাইকেল, (সম্পাদিত), *India and the Indian Ocean, 1500-1800*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭।
নাকভি, এইচ. কে., *Urbanisation and the urban Centers Under the Great Mughals*, সিমলা, ১৯৭২।
পিয়ার্সন, এম, *Merchants and Rulers in Gujarat*. ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৬০।
বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা*, কলকাতা, ১৯৮৩।
বেইলি, সি.এ. *Rulers. Townsmen and Bazars*, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩।
ব্লেক, স্টিফেন পি, *Shahjahanabad*. কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।
ভদ্র, গৌতম, *মুঘলযুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, কলকাতা, ১৯৮৩।
ভট্টাচার্য, সুকুমার, *The English East India Company and the Economy*

of Bengal. লণ্ডন, ১৯৫৪।
মুসভী, শিরিন, *The Economy of the Mughal Empire c. 1595.* অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৮৭।
মালোনী, রুবি, *European Merchant Capital and the Indian Economy.* নতুন দিল্লী, ১৯৯২।
মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল, *The Economic History of India 1600-1800.* এলাহাবাদ, ১৯৬৭ (পুনরমুদ্রণ)।
মেহতা, আর.এন., *Mediaval Archaeology* ।
মোরল্যাণ্ড, ডব্লু. এইচ., *India at the Death of Akbar,* লণ্ডন, ১৯২০।
মোরল্যাণ্ড, ডব্লু. এইচ., *From Akbar to Aurangzeb.* লণ্ডন, ১৯২৩।
রশিদ, এ., *Society and Culture in Mediaval India,* কলকাতা, ১৯৬৯।
রায়চৌধুরী, মাখনলাল, *The Din-ī Slabri.* কলকাতা, ১৯৫২।
রায়চৌধুরী, তপন এবং হবিব, ইরফান, (সম্পাদিত), *The Cambridge Economic History of India.* ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮২, খণ্ড ১ ও ২।
রিচার্ডস, জন এফ., *The Mughal Empire.* কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩।
রেনেল, জেমস, *Memoir of a Map of Hindoosthan or the Mughal Empire.* ভারতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৬।
ল্যাপিডাস, ইরা. এম., *Muslim Cities in the Later Middle Age.* কেমব্রিজ ইনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪।
সরকার, যদুনাথ, *Mughal Administration.* ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ, ১৯৭২।
সরকার, জগদীশনারায়ণ, *Mughal Economy.* কলকাতা, ১৯৮৭।
সরকার, জগদীশনারায়ণ, *Private Traders in Mediaval India.* কলকাতা, ১৯৯১।
সরন, পি., *Provincial Government of the Mughals 1526-1658.* বোম্বাই, ১৯৭৩।
সিং, ও.পি., *Surat and its Trade,* দিল্লী।
সিং, এম.পি., *Town, Market, Mint and Post in the Mughal Empire. 1556-1707,* নতুন দিল্লী, ১৯৮৫।
সৈয়দ, আনিস জাহান, *Aurangzeb in Mumtaab-ul-Lubab,* বোম্বাই, ১৯৭৭)।
হবিব, ইরফান, *Essays in Indian History,* নতুন দিল্লী, ১৯৯৫।
হবিব, ইরফান, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭),* (বাংলা অনুবাদ সংস্করণ, অনু-সম্পাদনা- রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য) কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোং., কলকাতা, ১৯৮৫।

হাউলি, জি, *Cities of Mughal India,* ১৯৬৮।
হাসান, এস. নুরুল, *Thoughts on Agrarian Relations in Mughal India.* নতুন দিল্লী, ১৯৭৩।
হুরানি, এ.এইচ. এবং স্টার্ন, এস.এম., (সম্পাদিত), *The Islamic City.* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭০।

প্রবন্ধ

অরসরত্নম, এস, "Indian Merchants and Their Trading Methods (c. 1700)." *IESHR.* মার্চ, ১৯৬৬, তিন (১)।
অরসরত্নম, এস, "Indian Commercial Groups and European Traders. 1600-1800". *South Asia.* সেপ্টেম্বর, নতুন সংখ্যা, ১ (২)।
কাইজার, আহসান জান, "The Role of Brokers in Mediaval India." *IHR.* সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, খণ্ড ১ (২)।
কাইজার, আহসান জান, "মুঘল সাম্রাজ্যে অভিজাতদের মধ্যে রাজস্ব সম্পদ বণ্টন", *মধ্যকালীন ভারত* সম্পাদনা ইরফান হবিব, ১ম খণ্ড, কলকাতা ১৯৯০।
খান, ইফতদার আলম, "The Middle Class in the Mughal Empire". *PIHC.* সভাপতির ভাষণ (মধ্য যুগ), ১৯৭৫।
গ্রোভার, বি. আর., "Nature of Land Rights in Mughal India", *IESHR.* ১৯৬৩, খণ্ড ১।
গ্রোভার, বি. আর., Nature of the Dehati Taluque" *IESHR.* ১৯৬১ দ্বিতীয় খণ্ড।
চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, "The Perception of a City in Mediaval Bengali Literature", *PIHC.* ১৯৯৩।
চৌধুরী, কে. এন., "The Structure of Indian Textile Industry in Seventeenth and Eighteenth Centuries" IESHR. জুন-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, ১১ (২, ৩)।
দাশগুপ্ত, অরুণ, "মুঘলযুগের ভারতীয় বণিক", *ঐতিহাসিক,* ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৮৬।
দাশগুপ্ত, অশীন, "The Maritime Merchant C.1500-1800" *PIHC.* সভাপতির ভাষণ (মধ্যযুগ), ১৯৭৪।
দেবরা, জি.এস.এল., "The Mughal State and Indian Business", *State and Business in India,* সম্পাদনা– দিজেন্দ্র ত্রিপাঠী, নতুন দিল্লী, ১৯৮৭।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, "Saptagram or Satgoan," *JASB.* ১৯০৯, জুলাই, ৫ম খণ্ড, সংখ্যা ৭।

মুসভী শিরিন, "Share of Nobility in Akbar's Revenue", *IESHR*, ১৯৮০ জুলাই-অগাস্ট।

মুসভী শিরিন, "Urban Population in Pre-Colonial India," (অপ্রকাশিত, পঠিত প্রসঙ্গ), Second International Congress of Historical Demography (প্যারিস, ১৯৮৭)

মুসভী শিরিন, "Magnitude of Land Revenue Demand and the Income of the Mughal Rulling Class under Akbar", *Mediaval India– A Miscellany*, ১৯৭৭, আলিগড়, চতুর্থ খণ্ড।

মুসভী শিরিন, "The Indian Economic Experience, 1600-1800: Advantatrial Study" (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, অধ্যাপিকা মুসভী এটি ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্যে তাঁর কাছে বর্তমান লেখক কৃতজ্ঞ)।

রাণা, আর.পি., "Agrarian Revolts in Northern India during the late 17th and early 18th century" *IESHER*, ১৯৭৮, জুলাই-ডিসেম্বর, খণ্ড ১৮, নং ৩ ও ৪।

রায় ইন্দ্রাণী, "The Multiple facts of the early 18th Century Indian Merchants" *OccationalPaper*, নং ২৯, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা।

রায় ইন্দ্রাণী, "ফরাসী কোম্পানী ও বাংলার বণিক (১৬৮০-১৭৩০)" *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি* সম্পা: অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯২।

রায়, অনিরুদ্ধ, "ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশে নগর বিন্যাস ও সামাজিক বিবর্তন", *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, সম্পা– অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ১৯৯২।

রায়, অনিরুদ্ধ, "Growth of the City of Surat, 1610-1671" *Journal of Asiatic Society of Bangladesh*, ১৯৭৯-৮১, খণ্ড ২৪-২৬।

রায়, অনিরুদ্ধ, Cambay and its Hinterland : Early 18th Century" *Ports and their Hinterlands*, সম্পা– ইন্দু বাঙ্গা, নতুন দিল্লী, ১৯৯২।

শর্মা, রমেশচন্দ্র, "Aspects of Business in Northern India in the Seventeenth Century," *Eassays in Mediaval Indian Economic History*, সম্পা– সতীশ চন্দ্র, নতুন দিল্লী, ১৯৮৭।

সরকার যদুনাথ, "State Industries in the Mughal Empier," *Modern Review*, ১৯২২, খণ্ড ৩২ নং ৫।

হবিব ইরফান, Potentialities of Capitalistic Development in the Economy of Mughal India," *Essays in Indian History*, (পুনরমুদ্রণ), নতুন দিল্লী, ১৯৯৫।

হবিব ইরফান, "Technology and Business to Social change in Mughal India", *IHR*. ১৯৭৮-৭৯, নং ১-২।

হবিব ইরফান, "Currency System of the Mughal Empire 1556-1707", *Mediaval India Quarterly*. ১৯৬১, চতুর্থ খণ্ড, নং ১ ও ২।

হবিব ইরফান, "The System of Bills of Exchange (Hundis) in the Banking in Mughal Empire", *PIHC*. ১৯৭২।

হবিব ইরফান, "Banking in Mughal India," *Contributions to Indian Economic History*. সম্পা–তপন রায়চৌধুরী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬০।

হবিব ইরফান, "Usury in Mughal India", *Comperative Studies in Society and History*. ১৯৬৪, জুলাই।

হস্টেন, রেভারেণ্ড, "Jesuit Letters from Bengal, Arakan & Burma, 1599-1600", *Bengal Past & Present*. ১৯২৫।

হাসান, সৈয়দ নুরুল, "Zamindars under the Mughals", *Land Control and Social Stucture in Indian History*. (সম্পা–আর. ই. ফ্রাইফেনবার্গ) উইসকনসিন, ১৯৬৯।

হাসান, সৈয়দ নুরুল, "The Monopoly of a Mediaval Indian City: A Case Study of Shahjahanabad", *The City in Indian History*. সম্পা– ইন্দু বাঙ্গা, নতুন দিল্লী, ১৯৯১।

List of Abbreviations

IESHR– Indian Economic & Social History Review.

PIHC– Proceedings of Indian History Congress.

IHR– Indian Historical Review.

JASB– Journal of Asiatic Society of Bengal.

মুঘল ভারতের অর্থনীতি বিষয়ে এযাবৎ যা কিছু লেখা হয়েছে তার সবই প্রায় ইংরিজিতে। আর বাংলায়, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে—কিংবা একেবারেই সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে কোনো বই প্রায় নেই-ই বলা যায়। প্রবীন অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় সেই দুঃসাধ্য কাজটিই সম্পাদন করেছেন। বহু তথ্য নথি তালাশ করে—বহু তথ্য সূত্রায়িত করেও শুধু তথ্য-ভারাক্রান্ত ইতিহাস নয় এই গ্রন্থ—বরং বলা যেতে পারে অত্যন্ত স্পষ্ট, সাবলীল ভঙ্গিমায় ও ভাষায় মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো এ শুধু রাজা-রাজড়ার অর্থনীতি সংক্রান্ত ইতিহাস নয়—সে সময়কার সাধারণ মানুষ বা বণিক সমাজ সম্পর্কেও এক অতি মূল্যবান আলোচনা এই গ্রন্থ।

অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছেন। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি শাখায় অধ্যাপনা করেন। তাঁর লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে 'The Rebel Nawab of Oudh : Revolt of Vizir Ali Khan (1799)' অন্যতম।

প্রচ্ছদ : তরুণ বসু

ISBN : 81-7074-178-5
দাম : ৭০ টাকা

কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী
২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২